আশ্বিন—১৩৪৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতা

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী

ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ডাক আসিয়াছে মনে হইতেছে। যাঁহার অমোঘ বিধানে জাতির উত্থানপতন নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি কোন্ মাপকাঠিতে, কেমন করিয়া ইউরোপের এই প্রবল সভ্যতার বিচার করিবেন তাহা তিনিই জানেন। তবে মনে হয়, বর্ত্তমান সভ্যতার লীলা-ভূমি ইউরোপকে একটা প্রকাণ্ড নর-মেধ-যজ্ঞের রক্ত-স্নানে (blood-bathএ) পবিত্র ও পরিমার্জ্জিত হইয়া সভ্যতা ও কৃষ্টির নূতন 'অভিষেক' গ্রহণ করিতে হইবে এবং নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নূতন আলোকে তাহার অভিব্যক্তির নূতন পথ খুঁজিতে হইবে। সে কথার আলোচনা এখন করিয়া কোন লাভ নাই; এখন ইউরোপের অতি প্রাচীন সভ্যতার কথা কিছু আলোচনা করিব।

ইউরোপে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের বহু পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি। তখনও যীশুখৃষ্ট জন্ম-গ্রহণ করেন নাই; তখনও গ্রীক ও রোমের বীরদর্পে মেদিনী কম্পিত হয় নাই; ক্রীট্যান্ বা মিশরীয় সভ্যতার ক্ষীণআলোকরশ্মি ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তে হয়তো বা তখন একটু একটু করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে; অন্ধকার যুগের ইউরোপের সেই প্রাগৈতিহাসিক অতি প্রাচীন যুগের কথা আমি বলিতেছি। সেই যুগে ইউরোপের অধিকাংশ স্থানে কেল্ট (Celt) নামে একটী জাতি ও কেল্টিক ধর্ম্ম এবং ঐ নামে একটী বিশিষ্ট সভ্যতা বর্ত্তমান ছিল।

গ্রীকেরা ও রোমানেরা নিজেদের ছাড়া আর সকল জাতিকেই অশিক্ষিত ও বর্ব্বর বলিত, টিউটনিকেরাও তাই। সুতরাং গ্রীক ও রোমানদের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী যুগে কেল্টিকেরা ইহাদের নিকট সম্মান পাইত না।

পশুশক্তি প্রবল হইয়া উঠিলে আধ্যাত্মিক শক্তি সঙ্কুচিত হইতে থাকে। উলঙ্গ শাণিত তরবারির যুক্তি যখন বড় হইয়া উঠে, তখন জ্ঞান, ভক্তি ও ধর্ম্মের শান্ত আলোক স্বভাবতই সাময়িকভাবে স্তিমিত হইয়া যায়। প্রবল শক্তিসম্পন্ন গ্রীক, রোমীয় ও টিউটনিক সভ্যতার চাপে পড়িয়া কেল্টিক ধর্ম্ম এবং আদর্শের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও সেই সভ্যতা, ধর্ম্ম ও আদর্শের তত্ত্ব-কাহিনী কোন কোন স্থানের জনপদের ভিতর আত্মগোপন করিয়া আছে। এখনও সেই প্রাচীন কেল্টদের উত্তরাধিকারী খুঁজিয়া বাহির করা যায় এবং কেল্টিকেরা একেবারে নির্ব্বংশ বা ধ্বংস হইয়া যায় নাই। ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন কেল্টিক সভ্যতার নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। এক সময়ে ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইটালীর উত্তরাংশ, জার্মানী, স্পেন, সুইট্‌জর্ল্যণ্ড, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি স্থানে কেল্টিক সভ্যতা ও ধর্ম্ম বিপুল গৌরবের সহিত তাহাদের উচ্চ আদর্শ ও বাণী প্রচার করিত। ইউরোপের পণ্ডিত ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন ইউরোপের পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া এই কেল্টিক (Celtic) সভ্যতার অনুসন্ধান করিতেছেন। ফ্রান্সের রেনে (Rennes) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Celtic ধর্ম্মমত ও দেবদেবীতত্ত্ব সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ বাহির হইতেছে। আয়র্লণ্ডে কেল্টিক জাগরণের বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

কেল্টিক সভ্যতার বিবরণ পড়িয়া মনে হয়, কেল্ট (Celt) ও হিন্দু সভ্যতার সহিত একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। প্রাচীন কেল্টের প্রকৃতি-পূজা, তাহার ভগবদ্ভক্তি, তাহার ধর্ম্ম-মত, দেবদেবীতত্ত্ব প্রভৃতির সহিত হিন্দু আদর্শের এত সাদৃশ্য যে, মনে হয় যেন এই দুই জাতির চিন্তার ধারা একই উৎস হইতে প্রবাহিত হইয়াছে।

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিদৃশ্যমান প্রত্যেকটী বস্তুতে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা, এই বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যেক বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া তাঁহার অপরূপ লীলার রসাস্বাদন করা—হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। তিনি সিংহাসনে বসিয়া শুধু বিচার করিতেই পারেন না, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তির প্রভাবে, তাঁহার বিচিত্র প্রসব-ধর্ম্মিণী মহামায়ার অনন্ত শক্তিবলে তিনি অনন্তরূপে ও বিরাজ করিতে পারেন। তাঁহার এই লীলা হিন্দু নানা রসে আস্বাদন ও উপভোগ করে। ইহাই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২

যিনি ভগবৎস্বরূপকে চেতন ও অচেতন সর্ব্বভূতে আছেন বলিয়া অনুভব করেন তিনিই ভক্ত। তিনি "পৃথ্বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ", সর্ব্ব ভূতাধিকরণে অভীষ্ট ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করেন এবং প্রত্যেকটী সৃষ্ট বস্তু তাঁহার ঐশ্বিতের অধিষ্ঠান-ভূমি স্বরূপ তিনি মনে করেন। তাহার ভিতর তিনি আকাশ বায়ু সলিল গাছ পাথর মাটী, বা স্থাবর জঙ্গমের কোন মূর্ত্তি দেখেন না; তিনি দেখেন ঐ স্থাবর জঙ্গমের ভিতর তাঁহার চির-আকাঙ্ক্ষিত দেবতা, চির-মধুর সুন্দর সত্তা এবং তাহাই তিনি স্বরূপত আস্বাদন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজগোপীগণও তাহাই বলিয়াছেন :—

বনলতাস্তরবঃ আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
নম্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্ত্ত লক্ষিত মনোভবভগ্নবেলাঃ। ১০।৩৫।১

এইজন্য উত্তম ভাগবতেরা ভগবদ্বিদ্বেষীজনকেও সম্মান করেন; ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভগবানের নিন্দাকারী নাস্তিককেও তাঁহারা পীড়া দেন না। এইজন্য পরম ভগবদ্ভক্ত উদ্ধব দুর্য্যোধনকে নমস্কার করিতেন। এই ভগবৎপ্রেম সাধনার এই বিশিষ্ট ভাবধারা, হিন্দুর ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে।

কেল্টদের সভ্যতার ভিতর দিয়াও এই রকম একটী ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কেল্টিক আন্দোলন আয়র্লণ্ডেই প্রবলভাবে আরম্ভ হইয়াছে। ডাব্‌লিন্ মিউজিয়মে কেল্টিক সভ্যতার নিদর্শন বিশেষ যত্নের সহিত সংগৃহীত ও রক্ষিত হইতেছে। কেল্টিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী আইরিস জাতি কেল্টিকদের লুপ্তপ্রায় প্রাচীন গৌরব-কাহিনীর উদ্ধার ও প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

একথা আমরা খুব কম লোকেই জানি যে, এক যুগে আয়র্লণ্ডই ইউরোপের শিক্ষাগুরু ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে

খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তৎপূর্ব্বে এবং তার পরেও নবম শতাব্দীতে দিনেমারদের আক্রমণ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ শত বৎসরাধিক কাল আয়র্লণ্ড ইউরোপের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল এবং এই স্থান হইতেই সভ্যতার আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইত। খৃঃ নবম শতাব্দী পর্য্যন্তও এই সভ্যতার প্রভাবে ইউরোপের বহু জনপদ নিয়ন্ত্রিত হইত।

কেল্টিকেরা অসীমের অনন্ত ব্রহ্মের উপাসক। এই বহির্জগতের ভোগবিলাসের উপকরণই যে একমাত্র চিন্তার বিষয় তাহা তাহারা মনে করিত না। তাহারা মনে করিত, ইহার পশ্চাতে একটা অন্তর্জগত আছে—যাহার রহস্য, যাহার অসীম সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার এবং সেই ভূমানন্দ লাভ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করাই মানব-জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আয়র্লণ্ডের কোন এক চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন—"কেল্টিক সাহিত্যের সহিত প্রাচীন কোন চিন্তারাশির তুলনা করিতে হইলে ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। Mysticism, ভাবুকতা, প্রকৃতিপূজা ও অধ্যাত্মবাদ এত মহাভাবে জগতের আর কোথাও প্রচলিত হয় নাই। কেল্ট ও হিন্দু বোধ হয় একই অধ্যাত্মশক্তির সন্তান।" *

এই কেল্ট সভ্যতা এবং কেল্ট জাতি গ্রীক রোমান ও টিউটনিক সভ্যতার প্রবল আক্রমণে সন্ত্রস্ত হইয়া ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ পাহাড় পর্ব্বত এবং বন জঙ্গল আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়। অনেক স্থানেই তাহাদের বিশিষ্টতা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের ব্রিটানী, ইংলণ্ডের ওয়েল্‌স্ ও কর্ণওয়াল, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রভৃতি স্থানে টিউটনিকদের প্রবল প্রভাব হইতে দূরে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিল বলিয়া কেল্টিক সভ্যতার চিহ্ন বা বিশিষ্টতা এখনও রক্ষিত হইয়া আছে এবং এই জন্যই এই সব স্থানে বর্ত্তমান কালে নব্য-কেল্টিক জাগরণ (Celtic Revival বা Celtic Renaissance) দেখা দিয়াছে। পশুবলদৃপ্ত নব-সংগঠিত জাতির নিকট পুরাতন সভ্য জাতির এই পরাভব জগতের ইতিহাসে অভিনব ব্যাপার নয়। ভারতবর্ষের হিন্দুদিগকেও এই অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে। বিজিত সভ্যজাতির সভ্যতার আদর্শ বা কৃষ্টি যে নিকৃষ্ট এবং বিজেতা জাতিদের কৃষ্টিই যে শ্রেষ্ঠতর, এই পরাভবে তাহা প্রমাণিত হয় না। বরং দেখা যায়, সুসভ্য প্রাচীন জাতির পশু-শক্তি ক্রমেই কমিতে থাকে। তাহাদের শিক্ষা, সভ্যতা, শান্ত এবং সংস্কৃত জীবনধারা তাহাদের ক্ষাত্রশক্তিকে ক্রমেই ক্ষীণ করিতে থাকে। পশুশক্তিই যদি সভ্যতা পরীক্ষার মাপকাঠি হয়, হীন জিঘাংসা চরিতার্থ করিবার কৌশল, ষড়যন্ত্র, নির্লজ্জতা ও সামর্থ্যই যদি কৃষ্টির বিচারের আদর্শ হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, গরিলা-বাহিনী সংগঠিত করিয়া মানব-সমাজকে যদি কেহ বিধ্বস্ত করিতে পারে, গরিলাদের আরণ্য কৃষ্টিই মানব সভ্যতা হইতে শ্রেষ্ঠতর, ঐ আদর্শ অনুযায়ী তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তেমনি আবার একথাও ঠিক যে, কোন জাতি যদি তাহার ক্ষাত্রশক্তি হারাইয়া ফেলে তাহা হইলে তাহার আদর্শ, ধর্ম্ম, সত্যপ্রচার করিবার ক্ষমতা সে সবই ধীরে ধীরে হারাইয়া ফেলে। The nation that loses its political right, also loses its right to be heard—এ কথা অতি সত্য। সত্ত্বগুণকে রক্ষা করিবার জন্য রজঃগুণের অনেক প্রয়োজন হয়; আশ্রমপীড়া হইতে তপোবনকে রক্ষা করিতে হইলে বিচিত্রবীর্য্য ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রশক্তি চাই। অহিংসা দ্বারা উদ্ধত পশু-শক্তি সংযত হয় না। অবশ্য সত্যের বিনাশ নাই; Thesis, Anti-thesis, Synthesis চলিতে থাকে কিন্তু যাহা সত্য তাহা ধ্বংস হয় না, সত্য ব্রহ্ম। ইউরোপের এই কেল্টিক জাগরণের আন্দোলন হয় তো ইউরোপের আর এক নবযুগেরই সূচনা করিতেছে।

অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয়ের সংগ্রহ হইতে অতি প্রাচীন একটী কেল্টিক (Celtic) স্তোত্র বা গাথা উদ্ধৃত করিতেছি :—

কেল্টিক স্তোত্র

I am the wind which breathes upon the sea,
I am the wave of the ocean,
I am the murmur of the billows,
I am the ox of the seven combats,
I am the vulture upon the rock,
I am a beam of the sun,
I am the fairest of plants,
I am a wild boar in valour,
I am a salmon in the water,
I am a lake in the plain,

* বর্ত্তমান জগৎ—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার।

I am a word of science,
I am the point of the lance of battle,
I am the God who creates in the head
(i.e., of man) the fire (i.e., the thought),
Who is it who throws light into the
meeting on the mountain ?
Who announces the ages of the moon
(if not I) ?
Who teaches the place where couches
the sea (if not I) ?

এই প্রাচীন কেল্টিক স্তোত্রটী পড়িয়া মনে হয় ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্তটী কতকটা যেন কেল্টিক ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

দেবীসূক্ত শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের প্রথমে পাঠ করার প্রথা আছে। এই ঋক্ মন্ত্রের দ্রষ্টা অম্ভৃণী ঋষির দুহিতা বাক্ নামে ব্রহ্মবিদুষী মহিলা। তুলনা করিয়া দেখার জন্য দেবী-সূক্তটী উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

দেবী-সূক্তম্

ওঁ অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরা-
ম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্য-
হমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥১

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥২

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভুরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥৩

* * *

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ ॥৬

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্
মম যোনিরপ্ স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥৭

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমানা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সংভূব ॥৮

দেবীসূক্তের বঙ্গানুবাদ

১। আমি রুদ্র, অষ্টবসু, আদিত্য ; আমিই সমস্ত দেবতাগণ ; আমিই ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় ; এই সমুদয়ের আত্মস্বরূপ আমি।

২। আহরণীয় সোম আমি ; আমিই ত্বষ্টা, পূষণ ও ভগদেব ; হবির্যুক্তকে, হবির্দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি-সাধনকারীকে, সোম-যজ্ঞানুষ্ঠানকারী যজমানকে আমিই যজ্ঞফল প্রদান করি।

৩। আমিই জগতের ঈশ্বরী ; উপাসকগণকে আমিই ফল প্রদান করি ; পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ নিজ আত্মা মধ্যেই আমারই কৃপায় হয় ; যজ্ঞে যাঁহাদিগকে আহ্বান করা হয় তন্মধ্যে আমিই প্রধান ; বহুভাবে আমিই জীবদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছি ; সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য আমি বহুদেশে যজমানগণ ইহাই বিধান করেন।

* * * *

৬। রুদ্রের ধনুতে আমি, ব্রহ্মবিদ্বেষীকে ধ্বংস করিতে আমি সজ্জন রক্ষার নিমিত্ত সংগ্রাম করিয়া থাকি, স্বর্গ মর্ত্তে আমিই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছি।

৭। ঐ উপরের আকাশকে আমিই প্রসব করিয়াছি, সমুদ্রের অনন্ত জলরাশির মধ্যে আমারই কারণ নিহিত; আমি সমুদয় ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছি ; ঐ দ্যুলোকে অবস্থিত স্বর্গলোক পর্য্যন্ত সমস্ত আমার দেহ দ্বারা অনুস্পৃষ্ট।

৮। সমস্ত বিশ্বকে কারণরূপে উৎপাদন করিয়া আমি একাকী স্বচ্ছন্দ-গতি বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হই ; পৃথিবীরও উপর আকাশেরও উপর পর্য্যন্ত আমি সকল বস্তুর সহিত মায়ারূপ মহিমা দ্বারা সম্ভূত হইয়া থাকি।

দুইটী স্তোত্রের চিন্তার প্রকৃতি একই রকম।

হিন্দু ও কেল্ট এই দুইটী চিন্তার ধারা কি একই উৎস হইতে প্রবাহিত হইয়াছে ? অথবা এই দুইটী সভ্যতার

আধ্যাত্মিক রূপ, বিভিন্ন আবেষ্টনের মধ্যেও একই বর্ণে, একই ছন্দে, স্বাধীন ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে ? ঐতিহাসিক, বিশেষত হিন্দু ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের এই দিক দিয়া একটা অনুসন্ধানের ক্ষেত্র রহিয়াছে।

প্রাচীনকালে ইউরোপের সহিত এসিয়ার তথা ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পারস্য দেশ ও কাস্পিয়ান সমুদ্র এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশের ভিতর দিয়া অনেকটা আধুনিক এরোপ্লেনের রাস্তায়, গান্ধার রাজ্যের ভিতর দিয়া খাইবার পথেও ভারতের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য চলিত। গান্ধার রাজ্য এখন তো ভারতের মধ্যেই। স্কন্দ-নাভ (Scandenavian) জাতিরা অনেকে এই ব্যবসা চালাইত। এই পথে ভাবের বাণিজ্যও নিশ্চয়ই চলিয়াছে। এই দীর্ঘ পথের ইতিহাস যদি পণ্ডিতেরা বাহির করিতে পারেন তাহা হইলে অনেক তথ্য বুঝা যাইবে।

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ মহেন-জো-দারো, হারাপ্পা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান খনন করিয়া অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছে। তাহাতে ইহাই অনুমিত হইতেছে যে, ভারতের এই প্রাচীন সভ্যতার সহিত Near Eastএর সুমেরিয়ান সভ্যতা (Sumerian civilization) ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্বদ্ধ---দুই সভ্যতার যোগ আছে। ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি ইউরোপের পূর্ব্বদিকের সীমান্ত প্রদেশগুলিকে ইউরোপীয়ানেরা Near East বলে। Sir Leonard Woolley কিছুদিন হইল এই সব প্রদেশে প্রাত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। তিনি উর (Ur)-এর খনন-কার্য্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি উত্তর-পশ্চিম সিরিয়াতে মেসোপটেমিয়ান ও ক্রীট্যান সভ্যতার সম্বন্ধের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন। ক্রীট্যান সভ্যতার সহিত সুমেরিয়ান এবং সুমেরিয়ানের সহিত ভারতীয় সভ্যতার যোগ আছে দেখা যাইতেছে। ওদিকে ক্রীট্যান সভ্যতার সহিত গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সম্বন্ধ আছে।

এই সব প্রাত্নতাত্ত্বিক তথ্যের আলোচনার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্ট Sir Leonard Woolleyকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি মহেন-জো-দারো, হারাপ্পা, চান্‌হোদারো, আম্‌রি, তক্ষশীলা, সারনাথ, নালন্দা, পাহাড়পুর এবং আরও অন্যান্য স্থান পরিদর্শনও করিয়াছেন।

ভারতীয় সভ্যতার বয়স এখনও ঠিক হয় নাই। এমন দিন ছিল যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতের যা কিছু—সবই খৃষ্ট জন্মের পরে লইয়া আসিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমে সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন মহেন-জো-দারো, হারাপ্পা প্রভৃতি স্থানের প্রাত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় সভ্যতার বয়স পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট যে এই সব তথ্য আলোচনার জন্য Sir Leonard Woolley-কে আমন্ত্রণ করিয়াছেন ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। অবশ্য এ আমন্ত্রণ মূল্যবিহীন নয়, এর জন্য অনেক টাকা আমাদিগকে দক্ষিণা দিতে হইবে। ইউরোপীয়ান বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিশেষ দক্ষিণা না পাইলে কোন কার্য্যে ব্রতী হন না। এ বিষয়ে তাঁহারা আমাদের প্রাচীন কুলীন ব্রাহ্মণদের অপেক্ষাও অনেক বেশী কুলীন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে ক্রমে ইহা দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইবে যে, জগতের সভ্যতার উৎস ক্ষেত্র এই ভারত ভূমি এবং এই ভারত-মাতাই সভ্যতার আদি-জননী।

আধুনিক ইউরোপীয় যন্ত্র-সভ্যতা ব্যর্থ হইয়াছে। সভ্যতার এই যে ব্যভিচার ঘটিয়াছে, এই যে জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস, দ্বেষ, হিংসা—দুর্ব্বল জাতির উপর প্রবল জাতির অত্যাচার, এক জাতির আর এক জাতিকে গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা—জিঘাংসা চরিতার্থ করিবার জন্য নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতা—ইহার জন্য দায়ী বর্ত্তমান ইউরোপীয় যন্ত্র-সভ্যতা। মনে হইতেছে যেন নরকের বিষ-বহ্নির একটা তপ্ত শ্বাস, পাশবিকতার একটা রক্ত-স্রোত সমস্ত পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। এই নারকীয় দানব-লীলার অবসান ঘটাইতে হইলে সভ্যতার আদি-জননী ভারতের সাধনার বাণী দিকে দিকে আবার প্রচার করিতে হইবে ; প্রচার করিতে হইবে যে, এই বিশ্ব-গ্রাসী দুরাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মত ইহা ক্রমে বাড়িয়াই চলিবে। সমস্ত মানব-জাতিকে ডাকিয়া বলিতে হইবে, তোমরা ভারতের নিকট আবার সভ্যতার, মহামানবতার দীক্ষা গ্রহণ কর। তোমাদের মনের মুক্তির সন্ধান ভারতের সাধনার মধ্যেই নিহিত আছে। মনের মুক্তি না হইলে জাতির মুক্তি হইবে না। সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের ইহাই একমাত্র পথ।

মোহ-মুক্তি

নাটক

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

"মোহ-মুক্তি" সামাজিক ঘটনামূলক নাটক। নাটকের ঘটনাস্থল—ভাগীরথী তীরবর্ত্তী অভিরামপুর জনপদ।—কথোপকথন সৌকার্য্যার্থে কোথাও কোথাও—"এ গ্রামে" বা "এ গাঁয়ে" ব্যবহৃত হয়েছে। সেটা 'স্থান' অর্থে-ই বসেছে।

নাটকখানিকে প্রথামত—অঙ্কে, গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করা হয়নি;—এখন কেবল "দৃশ্য" সংখ্যাই দেওয়া হ'ল।

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ, সময় বৈকাল। দিনের কর্ম্মান্তে—কেহ কর্ম্মস্থল হ'তে, কেহ বাজার কোরে ফিরছেন, কেহ বেড়াতে বেরিয়েছেন।

মিউনিসিপালিটির ওভারসিয়ার তারিণী তরফদার একতাড়া নোটিস্ হস্তে পথচারী ভদ্রলোকদের সেই নোটিস্ বিলি করতে করতে চলেছেন। কেহ তা দাঁড়িয়ে পড়ছেন, কেহ তাতে তামাকটা মুড়ে নিচ্ছেন, কেহ তা পথেই ফেলে যাচ্ছেন।

পশ্চাতে মিউনিসিপালিটির কুলি—ধম্মা। এক কাঁধে মই, এক হাতে দড়িতে ঝোলানো একহাঁড়ি লেই, আর তার মধ্যে একখানা লেই লাগাবার বাঁট্ওলা বুরুস্। বগলে একতাড়া 'পোষ্টার্'। সুবিধা মত স্থান পেলেই ধম্মা লোকের ছ্যাঁচে দোরে পোষ্টার্ আঁটছে। সামনে হারাণ-মুদীর মুদিখানার দোকান পেয়ে—

তারিণী। (ক্লান্ত ও বিরক্তভাবে) যতো ব্যাগারের কাজে ওভারসিয়ার চাই—না হলে যেন পত্থের মিল হয় না! হারাণ, ভাল কোরে একছিলিম তামাক খাওয়া বাবা। আর পারছি না, সেই ১২টায় দুটো অন্ন মুখে দিয়ে বেরিয়েছি। নোটিসের তাড়া যেন দ্রৌপদীর বস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে···

কয়েকজন প্রবীণকে আসতে দেখে

নাঃ তামাকে শনির দৃষ্টি পড়েই আছে, খেতে আর দেবে না,—থাক্ হারাণ—

দু' পা এগিয়ে

নিন দুর্গাদাসবাবু—গোপালবাবু যাবেন না।

উভয়কে নোটিস্ প্রদান

দুর্গাদাস। কি বলোদিকি—কিসের নোটিস্ তারিণী?

তারিণী। দয়া কোরে পোড়ে দেখুন না—তাই না আমি ভদ্রলোকদের বিলি করছি—

গোপালবাবু। টেক্সো বাড়ছে না তো, তা হলেই হোলো। বুড়ো হয়েছি, সভাসমিতি কি প্রাইজ্ বিতরণ দেখবার সখও নেই সামর্থ্যও গিয়েছে। চশমাও সঙ্গে নেই—

হরলাল বাগচী, শেখর চৌধুরী, পরাশর গোঁসাই, গঙ্গা দর্শনে যাচ্ছিলেন—দাঁড়িয়ে গেলেন

পরাশর। কি হে দুর্গাদাস—ব্যাপার কি? এ যে মিউনিসিপালিটির ঢোল্ দেখছি। স্বয়ং তারিণীর গলা? না? সমন্ নাকি!

দেখতে দেখতে আরো কয়েকজন উপস্থিত হলেন
সকলের মুখেই—"ব্যাপার কি!"

তারিণী। আপনারা কর্ত্তাস্থানীয়—মাপ্ করবেন; নোটিস্খানা একবার পড়েই দেখুন না। এই যে শিবনাথ পণ্ডিতমশাই—নিন্তো (নোটিস প্রদান), দয়া কোরে একটু চেঁচিয়ে পড়ুনতো।

গোপালবাবু। বলেছি তো—টেক্স্ বাড়ার নোটিস্ যখন নয়, তখন নাই-বা দেখলুম তারিণী—

পরাশর গোঁসাই। হ্যাঁ, তবে যদি ধর্ম্মসভাদির নোটিস্ হয়—যেমন কোনো সিদ্ধ সাধু বা প্রসিদ্ধ ভাগবত ব্যাখ্যাকার কিছু শোনাবেন—সে স্থলে আপত্তি নেই। কি বলো শেখর?

শেখর চৌধুরী। হাঁ, যে বয়সের যা—

তারিণী। এই তো আপনাদের যোগ্য কথা। তা হলে আমিই নোটিস্খানি একবার পড়ি—আপনারা দয়া কোরে শুনুন।

শেখর। আচ্ছা, পড়ো পড়ো—

তারিণী নোটিস্খানি মাথায় ঠেকিয়ে—পড়তে আরম্ভ করলে

নিবেদন-পত্র

এতদ্বারা ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত সাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে—এতাবৎ যাঁকে আমরা চিনিতে পারি নাই—যিনি আত্মগোপন করতঃ সাধারণের মত সংসারে বিচরণ করিতেন অথচ 'তুরীয়' অবস্থায় থাকিতেন,—যিনি কেবল লোকহিতার্থে আজিও সংসার ত্যাগ করিতে পারেন নাই, বিবেকের তাড়নায় ইতস্ততঃ করিতেছিলেন—সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে যে তাঁহাকে আর সংসারে আবদ্ধ রাখা কঠিন! সেই চিন্তাকুল অশান্ত অবস্থায় আমাদের কলিকাতার কুটীরে একরাত্র অবস্থান কালে সহসা তাঁহার সেই অজ্ঞাতপূর্ব্ব অলৌকিক ভাব উপস্থিত হয়। আমরা ভীত ও বিচলিত হইয়া—ডাক্তার বৈদ্য ডাকি। শেষ তাঁহাদেরি উপদেশ মত—সিদ্ধ, মন্ত্রজ্ঞ কেশাম্বরী বাবার শরণাপন্ন হই। অবস্থা শুনিয়া, সিদ্ধাসন ছাড়িয়া তাঁহাকে আসিতে হয়। দর্শনান্তে বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়া বলেন—"শাস্ত্রেই এ-সব লক্ষণ পড়া ছিল, মহাভাগ্যে কলিতে সমাধি এই প্রথম চাক্ষুষ কোরে ধন্য হ'লাম! অতি উচ্চ অবস্থা, ইনি কে?" শুনিয়া বাবা বলেন—"সাবধান, ওঁকে এই অবস্থার কথা—বিস্তারিত জানাবেন না।—পরমৈশ্বর্য্য লোভে, কোন্ দিন নির্ব্বিকল্পে এ দেহ ত্যাগ হয়ে যেতে পারে।" ইত্যাদি।

রাত্র দ্বিতীয় প্রহর গতে তিনি পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসেন। অনেকেই তখন তাঁহাকে—সাংসারিক প্রশ্নে অশান্ত করে। সে কারণ—আমাদের অজ্ঞাতেই কখন তিনি চলিয়া যান।

ইনিই আপনাদের পুণ্য অভিরামপুর নিবাসী লোকহিতপ্রাণ মহাজন শ্রীযুক্ত রমণচন্দ্র মিত্র মহাশয়—যিনি আমাদের মত ঘোর নাস্তিক ও অবিশ্বাসীকে মুহূর্ত্তে পদানত করিয়াছেন।

মহাপুরুষকে প্রণাম করা ছাড়া তাঁর যোগ্য পূজা ও সম্মান দেওয়া আমাদের সাধ্য নয়। তথাপি আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি মত, তাঁহাকে স্মরণ ও বরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য, নচেৎ জ্ঞানকৃত প্রত্যবায় আছে। সে-কারণ তাঁরি পুণ্য মন্দিরে আমরা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সমবেত হইয়া—'সমাধি' উৎসবে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি,—ও কর্ত্তব্যবোধে ধর্ম্মপ্রাণ জনগণকে উক্ত উৎসব সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদনে নিজেরা ধন্য হইতে ও জন্ম সার্থক করিতে সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি। আশা করি হিন্দু আপন গৌরব-কথা ও কর্ত্তব্য ভুলিবে না।

স্থান—অভিরামপুর, রমণ-নিবাস (ভক্তিভূষণাশ্রম) সাধন-সভা।
সময়—১২ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা।

বিনীত নিবেদক—
শ্রী টি রায়—ব্যারিষ্টার্
শ্রী ডি সেন—এড্ভোকেট্
কলিকাতা

নোটিস্ পাঠান্তে তারিণী তরফদার সেখানি ভক্তিভরে মাথায় ঠেকালেন।
সকলে এতক্ষণ একাগ্র ও উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন, তাঁরাও
মহাপুরুষের উদ্দেশে শূন্যে হাত তুলে নমস্কার
করিলেন। পরে প্রত্যেকেই—

"ওহে তারিণী—আমাকে একখানা—আমাকে একখানা—"

বলতে বলতে এগিয়ে হাত বাড়ালেন এবং তা হাতে
পেয়ে—মাথায় ঠেকালেন

তারিণী। (কুলি ধম্মার প্রতি) বসলে চ'লবে না বাবা, এখনো অনেক রয়েছে। পোষ্টারগুলো রাস্তার ধারে প্রকাশ্য স্থানে সেঁটে দিয়ে ফ্যালো বাবা। এও ধর্ম্মকর্ম্ম—

ধম্মা—মই, কাগজ আর আটার হাঁড়ি নিয়ে ছুটলো

গোপালবাবু। কোথায় কোথায় বিলি করলে? দেখো তারিণী, এত বড় সৌভাগ্য হতে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়—

তারিণী। আজ্ঞে সেই ইষ্টেসন্ থেকে আরম্ভ কোরে—পোষ্টাপিস্, কাছারি, বাজার, দোকান, ক্লাব, লাইবেরী, স্কুল, দেবালয়, কিছু বাকি রাখছি না কর্ত্তা—মেয়েদেরও বাদ দিচ্ছি না—

শেখর চৌধুরী। এ দু'টি বড় কাজ করেছ—তোমার ভুল হবে না জানি—

তারিণী। আজ্ঞে তাঁদেরি তো নিজ্জলা ভক্তি।

দুর্গাদাস। না তারিণী—তা বোলো না। গ্রামের মাতব্বরেরা সকলেই তাঁর ভক্ত—

তারিণী। তরুণদের তেমন আগ্রহ দেখলুম না—

বাগচীমশাই। তারা এখন আধ্যাত্মিক কথার কি বুঝবে? ও-বয়সে আমরাই কি বুঝতুম! ওরা এখন সব কথা তো শোনেনি—রমণ মিত্তির সাহেবের চাকরি করে, এইটুকুই তারা জানে। জানে না যে বাইরে তাঁর কি প্রতিপত্তি। এই সেদিন নবদ্বীপ থেকে কেশব ন্যায়রত্ন প্রমুখ ১০৮ জন বড় বড় পণ্ডিতের স্বাক্ষরযুক্ত, তাঁর "ভক্তিভূষণ" উপাধি এসে পড়েছে! গ্রাম ধন্য হয়েছে। হ্যাঁ—একবার গঙ্গাতীরে নোটিস্ বিতরণে যেতে যেন ভুল না—রাজ্যের ভক্তের দর্শন পাবে। ঐ সাধন-চক্রে তাঁরাই

তো নিত্য নিয়মিত যান—সংকীর্ত্তনে আত্মহারা হয়ে' পড়েন।

তারিণী। যে আজ্ঞে। এই গয়লাপাড়াটা সেরে নিশ্চয়ই যাবো—

গোবিন্দ রায়। কেমন বাগচী, সে কত পূর্ব্বের কথা! মিত্র মহাশয়ের মহাভাবের সূচনার কথা তোমাকে বলতুম না। এখন দেখে নাও।

পরাশর গোঁসাই। কঠোর সাধন ভিন্ন কি এতটা সম্ভব হয়েছে!—আমাদের জীবনটা—(দীর্ঘনিশ্বাস)

গোবিন্দ রায়। আমি ওঁর কঠোর সাধন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি। শুনলে আপনারা স্তম্ভিত হবেন। ইচ্ছা করেন তো···

গদাধর গাঙ্গুলী। খুব ইচ্ছা করি, অমৃত পানে কার অনিচ্ছা!

গোপালবাবু। বেশ কথা—চলো আজ, সাধুপ্রসঙ্গই শোনা যাবে—

দুর্গাদাস। সেই ভালো—

সকলে গমনোন্মুখ। চন্দ্র চৌধুরী ও হারু পুরোহিতের প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। কি ব্যাপার, হাতে ওসব কি?

গোপালবাবু। (নমস্কারান্তে) বড় সুখবর দাদা! আমাদের গর্ব্বের বস্তু ভক্তিভূষণের সমাধি উৎসব এই বৃহস্পতিবার। এ তারই নোটিস্—

চন্দ্রবাবু। তাই নাকি? আশ্চর্য্য ব্যাপার গোপাল,—আগুন আর কতদিন ছাই চাপা থাকবে। গত রাত্রে তাঁর এমন অবস্থা হয়েছিল—আমি আর বাড়ী ফিরতে পারি না!—এখন ঘন ঘন মুচ্ছে হয় কি-না—(তারিণীর প্রতি) এই যে তারিণী, আর বাকি কতো? স্ত্রী পুরুষ কেউ যেন না বাদ পড়েন।

তারিণী। এ মহাপুরুষের কাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন;—তিনিই করিয়ে নেবেন—

হারু। এই তো কথা। শাস্ত্রও বলছে—"যতই করিবে দান—"

চন্দ্র চৌধুরী। (সহাস্যে তারিণীর প্রতি) দ্বাদশ মন্দিরকেও বাদ দাওনি দেখলুম—

তারিণী। যা তিনি করাচ্ছেন—সাধ্যমত কোরে চলেছি—

চন্দ্রবাবু। বেশ বেশ, এই বিশ্বাসই চাই—

তারিণী। (এদিক ওদিক দেখে নিয়ে) পর পর তিনটে হোলো, তিনটেই গেলো—আবার এসেছে! কৃপা না হোলে এবার ঢাকি সুদ্ধ,ই—

চন্দ্রবাবু। ওকথা মুখে এনো না তারিণী। সুযোগ পেলেই ওঁর মুখ থেকে কইয়ে নেবো—

তারিণী পায়ের ধুলো নিলে। চন্দ্রবাবু চলে গেলেন; পূর্ব্বেই এক এক কোরে সব এগিয়ে ছিলেন

তারিণী। হারাণ, শিগ্‌গির্ দে বাবা। আবার কোন্ মহাশয় দেখা দেবেন।

হারাণ। নিন্—তয়েরিই আছে—

হুঁকাটি তারিণীকে প্রদান। সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথ ঘোষালের প্রবেশ

তারিণী। চুলোয় যাক্—রেখে দাও হারাণ।

হারাণের হস্তে প্রদান

রঘুনাথবাবু। খুব কাজ কোরচো তারিণী! রাস্তা, ঘাট, হাট কোথাও বাকি রাখনি! আবার বটগাছটার গায়েও পোষ্টার্ দেখলুম!

তারিণী। আজ্ঞে মহাপুরুষের কাজ—

রঘুনাথ। গাঁয়ের হাওয়া কি রকম বুঝচো?

তারিণী। আজ্ঞে প্রবীণেরা, মহিলারা—সকলেরি তো আস্থা আর আগ্রহ দেখ্‌ছি। দশ বিশ জন ভিন্ন-গোত্রের যে নেই তা নয়।

রঘুনাথ। (ঈষৎ চাপা হাসি টেনে) ভয় কি, একটু বুদ্ধি খেলিয়ে এদেশে যা চালাবে তাই চলে' যাবে—ধর্ম্মের সুগন্ধ থাকলেই হোলো! বেশ বেশ—

বলতে বলতে চলে' গেলেন

তারিণী। না না হারাণ—আর না! তামাকে আজ অভদ্রা পড়েছে। এখনি আর এক মহাত্মার আবির্ভাব হবে,—থাক্। প্রফেসর মানুষ কি-না, একটু লেক্‌চার ঝেড়ে গেলেন। একপাল্ ছেলেমেয়ে আর পরিবারের সূতিকা না হোলে ধর্ম্মের সুগন্ধ কেই বা পেতো!—আচ্ছা, চললুম হারাণ—

হারাণ। সাজা তামাকটা,···আপনি কিন্তু লাক্ কথার এক কথা শুনিয়ে গেলেন। (নমস্কার)

তরফদার কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গঙ্গাতীরে একটি ছোট বাগান-বাড়ী। সময়—প্রভাত, উপস্থিত—বৃদ্ধ যাদব শিরোমণি

নামাবলী গায়ে, খড়ম পায়ে, সাজি হস্তে পুষ্প চয়ন করতে করতে—রমণ মিত্রের প্রবেশ। মুখে—হরের্নামৈব কেবলম্

শিরোমণি। এসো এসো—রমণ ভাই এসো—অনেক দিন দেখিনি! নিজের সামর্থ্য গিয়েছে, এলে—তাই দেখতে পেলুম। দেহ আর থাকতে চাইছে না ভাই, তা'রো তো অপরাধ নেই—বহুদিন বহন করেছে। কেমন আছ? পরিবারবর্গ কেমন?—কাছে এসো, কাছে এসো,—বোসো।

রমণ। (দাঁড়িয়ে থেকেই) স্নান করেছি—এখন আর···

শিরোমণি। (সহাস্যে) তুমি যে ক্রমেই কঠোরতা আরম্ভ করলে দেখছি! স্নানান্তে কি পথে পথেই থাকো!

রমণ। হরি-মার্গে বটে। যাক্—সে বুঝতে তোমার বিলম্ব আছে যাদব।

শিরোমণি। বুঝতে তো আপত্তি ছিল না ভায়া—দেহ যদি অপেক্ষা কোরতো; সময় কই!

রমণ। ওটা সাধারণ কথা হে। তাঁর কৃপা হ'লে—মুহূর্ত্তের কথা যাদব—কৃপাই মূল। তা না তো স্ত্রীলোক—তায় বিধবা, তাকে এত বড় বুকের পাটা কে দিলে! আমি তো আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছি যাদব···

শিরোমণি। কার্ কথা বোল্‌চো?

রমণ। শোন নি! আমাদের ব্রজ লাহিড়ীর স্ত্রী হে। কী ভাগ্য! পুণ্যবতী ওই অতো টাকার বাগানবাড়ী—রাধারাণীর নামে লিখে-পোড়ে একদম্ উৎসর্গ কোরে দিচ্ছে! একে বলে ভগবৎ কৃপা! এক মুহূর্ত্তে দিন কিনে নিলে··

শিরোমণি। বলো কি! হ্যাঁ—ত্যাগ বটে! বাঃ···

রমণ। (বাধা দিয়ে) শুধু বাহবা দিয়ে আর কি হবে? নিজের নিজের কর্ত্তব্যের কথাও ভাবতে হয়।

শিরোমণি। কর্ত্তব্য তো অনেক আছে ভাই, ছিলও অনেক! কিন্তু কর্ত্তব্য থাকা, আর কর্ত্তব্য পালনের ক্ষমতা থাকা যে এক জিনিস্ নয় রমণ! তুমি ঠিকই বলেছ—তাঁর কৃপাই মূল···

রমণ। আবার তাঁর কৃপার মজা এই—যাকে যতটুকু দিয়েছেন তার সেই অনুপাতে ত্যাগই, অন্যের বড় বড় ত্যাগের চেয়ে তাঁর বেশী আদর পায়। লোক বুদ্ধির দোষে নিজেকে ছোট আর অক্ষম ভাবে! যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি কি তোমাকে লক্ষ টাকার পরীক্ষায় ফেল্‌বেন? তুমি কি চুরি করতে যাবে? বিদুর কি আর ভগবানকে সোনার খুদ খাইয়েছিলেন?

শিরোমণি। (অন্যমনস্কে—নিশ্বাস ফেলে, আপন মনে) অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ—

রমণ। ওসব তোমাদের পুঁথি-মুখস্ত উপসর্গ ছাড়ো। এখন কাজের সময় এসেছে যাদব—বলছিলে না—দেহ আর থাকে না···

শিরোমণি। তাতে সন্দেহ নেই ভাই। ছেলে উপায়ক্ষম নয়, তার আবার কতকগুলি ছেলে-মেয়ে; তাদের চিন্তা যে এড়াতে পারি না···

রমণ। (বিরক্তভাবে) পুঁথি-ঘাঁটা বিদ্যের ওর বেশি আর কি হবে! কার কি হবে ভাবতে গেলে—নিজের পরকালে শূন্য পড়ে! এখন নিজের কি হবে ভাবো। রত্নাকরের অবস্থাটাও কি ভুলে গিয়েছ?

শিরোমণি। (উদাসভাবে) না ভুললেও, ভেবেও তো কূল পাই না রমণ—

রমণ। সিদ্ধগুরু না পেলে, অনেক পণ্ডিতেরই ঐ দশা দাঁড়ায়। জোর কোরে যে একটা কিছু পুণ্যকর্ম্ম কোরে যেতে পারে, সে-ই বেঁচে যায়। অন্তে সেটা সাহায্য করে। "আটকে" বেঁধে নিশ্চিন্ত হ'তে হয়। পঙ্গুম্ লঙ্ঘয়তে গিরিম্—জানো তো—

শিরোমণি। তা তো জানি···

রমণ। জানো ছাই আর পাঁশ্—ছেলে আর নাতী! তারা তোমায় স্বর্গের সিংহাসনে বসাবে!

শিরোমণি। সিংহাসন তো লোভের আসন নয় রমণ,—আমি একটু শান্তি চাচ্ছি ভাই—

রমণ। শুধু চাইলেই তো পাওয়া যায় না যাদব—মূল্য দিতে হয়।

শিরোমণি। ব্রাহ্মণের ভিক্ষাই যে ভরসা—

রমণ। তার পাওনাও তেমনি! দেওয়া নেওয়াই নিয়ম···

শিরোমণি। (উচ্ছ্বসিতভাবে) বাঃ কথাটা লাখ টাকা দামের—বাঃ!

রমণ। তোমার যে ভাব লেগে গেলো। সমাজে থাকতে গেলে পরস্পরের একটা কর্ত্তব্য আছে, স্বীকার করো তো?

শিরোমণি। খুব করি—তা না তো সে···

রমণ। "তা না তো"টা এখন থাক্। তোমার শরীরের অবস্থা যা দেখছি তাতে কর্ত্তব্যবোধে বলতেই হয়—বছরে একটা বই দুটো "অক্ষয়-তৃতীয়া" আসে না—(এই পর্য্যন্ত বলেই কেঁপে চম্‌কে উঠলেন) আমি চললুম···

শিরোমণি। কি হোলো! হঠাৎ অমন কোরে উঠলে যে?

রমণ। (হাত জোড় কোরে ঊর্দ্ধে নমস্কার) দয়াময় আমাকে লাগাম লাগিয়ে রেখেছেন—অন্যমনস্ক হ'লেই টান্ পড়ে, সচেতন ক'রে দেন! পাঁচ জনের মোট্ মাথায় নিতে গেলেই ডুবতে হয়···

চিন্তাকুল নিম্নদৃষ্টিতে

বেলা কতো হোলো?

শিরোমণি। বেলা কোথা! এখনো সাতটা হয় নি, প্রায় বটে—

রমণ। ওঃ তাই। নিয়মভঙ্গ তিনি সইতে পারেন না। আসন শূন্য রাখা···

শিরোমণি। বুঝলুম না ভাই!

রমণ। পারবে না তা জানি! যাদের নিত্য নিয়মিত লক্ষ জপের শরীর, তাদের নিয়মভঙ্গটা যে কত বড় পীড়া, তা তুমি বুঝবে কি কোরে! যেখানে শাস্ত্র নেই—শ্লোকের অভাব—সেইখানেই তোমাদের অন্ধকার। ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য যে গুরুমুখী—আধ্যাত্মিক। সে সারা শাস্ত্র চষে ফেললেও মিলবে না। সদ্‌গুরু চাই···

শিরোমণি। তার আর দিন কই—পাই বা কোথায়। ভগবৎ কৃপা ভিন্ন তো মেলে না।

রমণ। (সহাস্যে) আবার দোরে এলেও তো চিনতে পারে না। যাক্ তোমার মত সাধারণের পথ খুব সোজা।

শিরোমণি। তা হ'লে তো বেঁচে যাই—সেই সোজাটাই বলো ভাই···

রমণ। নাম আর দান্—পারবে? এই দুটি দয়াময় আমাদের জন্যে ব্যবস্থা কোরে দিয়েছেন। দানের মধ্যেই সব রয়েছে। তাতে আনন্দ লাভ ও পরলোক পরিষ্কার। অক্ষয় তৃতীয়া সামনে। দানের অমন প্রশস্ত দিন আর নেই। বিশেষ, নিদাঘে জল দান। এই অক্ষয় তৃতীয়াটিই তোমার ভরসা!

শিরোমণি। তুমি বন্ধুর কাজই করলে ভায়া। ও কাজটি বরাবরই কোরে এসেছি, এখন দেহের অবস্থা দেখে ইতস্তত আসছিল—তুমি সচেতন কোরে দিলে ভাই—

রমণ। (আশ্চর্য্যভাবে) তুমি বুঝি কলসী উৎসর্গের কথা বুঝলে! ও-তো তুলে-মালীতেও কোরে থাকে হে। যদি শ্রদ্ধা থাকে—ভগবানের উদ্দেশে জলাধার উৎসর্গ করো। তোমার আছে বলেই বলছি। মেয়ে পুত্রাদির মুখ চেয়ে ওটা রেখে তোমার লাভটা কি! সাধারণে উপকৃত হবে—ভগবান তাদের ভিতর দিয়েই গ্রহণ করেন। তোমার সেটা আবশ্যক, মলিন-আত্মা শান্তি—তাও পাবে। তোমার জন্যে এর চেয়ে সহজ আর কিছু তো দেখছি না যাদব—

শিরোমণি। কথা ঠিক্ ভাই, একটা পুষ্করিণী আছেও সত্য। কিন্তু ওটি যে পূর্ব্বপুরুষদের শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা করা। সকলেই জল ব্যবহার করেন—কারো কোনো বাধা তো নাই। পিতামহের উৎসর্গ করা জিনিস্, দ্বিতীয়বার আমি কি কোরে···না ভাই, আমার দ্বারা সে কাজ সম্ভব নয়—শাস্ত্রসম্মতও নয়। পুণ্যকর্ম্ম সুকৃতিসাপেক্ষ, আমার সে ভাগ্য নয়। না···জ্ঞানকৃত অপরাধের ক্ষমা নেই। ও-তো ভাই সকলের জন্যেই রয়েছে—ব্যবহারে কারো তো মানা নাই—তবে আবার···

রমণ। (মুখখানা কদাকার হ'য়ে উঠলো—ক্রুর হাসি টেনে) তোমার বিপরীত বুদ্ধি এসেছে কি-না, সেইটে দেখবার উদ্দেশ্যেই ভাল কথা কোয়ে দেখলুম। শেষ সময়ই বটে, ওটা শেষ সময়েই এসে থাকে—ঠিকই এসেছে!

তোমার এখন যা কর্ত্তব্য ও উচিত—তাই সেই প্রস্তাবই করে' ছিলুম। ভাগ্য কেউ কারুকে দিতে পারে না—

শিরোমণি। খুব ঠিক্ কথা ভাই—

উক্ত কথাগুলি বলেই, মিত্র মশাই আহত সর্পের মত গর্জ্জনসহ সাজি হাতে (বাগান থেকে তোলা ফুলগুলি) মুটো মুটো কোরে অপবিত্র রোষে ঘৃণা ভরে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন!

রমণ মিত্রের ভাব্, কথা ও কাজ দেখে শিরোমণি স্তম্ভিতভাবে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—তিনকড়ির বহির্ব্বাটী (রোয়াক)। সময়—বেলা আটটা, উপস্থিত—তিনকড়ি, বিমল, অনাথ, হিমাংশু প্রভৃতি বন্ধুগণ। আগমন—সুকেশ, শিরোমণি-পুত্র কালাচাঁদ, নিতি গয়লানী

সুকেশ। এই তোমাদের গাঁয়ে জন্মে আর তোমাদের বদ্ হাওয়ায় থেকে ফ্লরিশ্ করতে পারলুম না—দরকোচা মেরে গেলুম; কেউ চিন্‌লে না বুঝলে না। হোতো আজ জার্ম্মণি—মাথার মণি কোরে রাখ্‌তো—

তিনকড়ি। আর পত্নী, ভনী স্যাভরোজিনী হ'তে পারতেন! গাঁয়ের কি অপরাধটা হোলো শুনি? গাঁয়ের বদ্‌নামটা দিও না বাবা! সকলেই স্বীকার করে—তাদের পরকালটার গোড়ায়—তোমার ইহকালটা প্রচুর কাজ করেছে।

সুকেশ। ওটা আমার স্বভাব ভাই—পরের জন্যেই খেটে মরি। যাক্—আত্ম-প্রশংসা শুনতে চাই না, তোমরা কৃতজ্ঞ থাকলেই হোলো! শুনলুম My Lord এসে গেছেন এবং ফতে কোরেও! কেয়াবাৎ ব্রেন্—

তিনকড়ি। হেঁয়ালী ছাড়ো, খুলে বলো—

সুকেশ। আমাদের poor ব্রজ লাহিড়ীর বাগান বাড়ির disposal হে। মনে আছে শর্ম্মার ভবিষ্যৎ বাণীটা—"ভূতের জেম্মায় গেলো"!

বিমল। কুকল্পনা তোমার মাথায় খুব আসে—তা জানি!

সুকেশ। (চম্‌কে) Who হে-বিমল! নাম লিখিয়েছ নাকি? Beg your pardon Savant!

তিনকড়ি। সুকেশের কথাটা শুনতেই দাও বিমল—

বিমল। বাজে কথা আর কি শুনবে? পরের ভার মাথায় কোরে, এক সপ্তাহে সাতদেশ ঘুরে তিনি ফিরেছেন। এর মধ্যেই সুকেশ, না শুনেই সব অনুমান কোরে নিয়েছে! তার অনুমানের মূল্য কতটুকু?

সুকেশ। (গম্ভীরভাবে) যত্র প্রতিভার সমঝদার আর আদর নেই, তত্র মৌনম্‌হি সম্মতম্!—এইবার তোমাদের মূল্যবান কথাই চলুক্—শোনা যাক্—

হিমাংশু। সাত দেশ ঘোরা মানে যদি—দর্জ্জিপাড়া, হাতীবাগান, হেদো হয়, তাহলে বিমল ঠিকই বলেছে! তাতে কিন্তু টেক্সট্ বুক কমিটিকে ফ্যাসাদে পড়তে হয়—দেশের ডেফিনিসন্ বদ্‌লাতে হয়!—আমি কিন্তু মিত্র মশাইকে নিত্যই কলকেতার রাস্তায় দেখেছি—

বিমল। তাতে—হাওড়া, শিবপুর, বালিগঞ্জ ঘোরা আটকায় না। ঐ সব স্থানেই বাগানবাড়ী কেনবার মতো লোক্ থাকেন—

অনাথ। বিমলের কথায় প্রতিবাদ চলে না। তবে আমাদের আপিসের গায়েই মিত্র মশায়ের আপিস কি-না—আপিসেও তাঁকে নিত্য দেখেছি ভাই—

সুকেশ। আহা—বলে' যাও বন্ধু—অমৃত সমান ঠেক্‌ছে।

বিমল। মনটা একটু পরিষ্কার করো সুকেশ। জানো—তাঁর অবস্থাটা কি?

সুকেশ। (বেশ সহজভাবে) একদম্ বৃহস্পতির—

বিমল। তার মানে?

সুকেশ। যাতে হাত লাগান তাই সোনা হয় এবং যা করেন তাই শোভা পায়—

বিমল। কেনো শোভা পায়?

সুকেশ। সেটা এ গাঁয়ের বুদ্ধির সার্টিফিকেট্!

বিমল। পরশ্রীকাতরতা আমাদের মজ্জাগত—

তিনকড়ি। (বিমলের প্রতি) তুমিও কি পাগল হ'লে? বুঝচো না ও তোমাকে তাতাচ্ছে!

বিমল। ওর সঙ্গে বৃথা তর্ক করতে চাই না—সময়ে নিজেই ওঁকে বুঝবে। আমার বেলা হ'ল—চললুম্—

সুকেশ। আমিও ওই কথাই বলি বিমল—সময় হ'লে নিজেই বুঝবে।

মুখখানা গম্ভীর কোরে বিমল চলে গেল

তিনকড়ি। সুকেশ—তুমি বড় ছেলেমানুষ! তুমি জান না বিমলের বাবা চক্রসভার সম্পত্তিরূপে ছ-ছটা ফলন্ত নারকোল গাছ মিত্তির মশাইকে লিখেপোড়ে দিয়েছেন! মিত্র মশাই এখন গাঁয়ের গুরুস্থানীয়, সকলেই ভক্তি করে··

সুকেশ। আমি ভাই সত্যিই জানতুম না যে আমাদের মধ্যে ভি, আই, ডি, অর্থাৎ ভণ্ড ঢুকেছে! বয়সে দু-তিন বছরের বড় হলেও ব্রজলাহিড়ী ছিল আমাদের পার্টির লোক। বেচারা হাড়ভাঙা খেটে, সতেরো হাজার টাকায় ওই সখের বাগানবাড়ী বানালে—ভোগ করতে পেলে না—মরে' গেল। পরিবার বেচারী সেই বাড়ী বিক্রি কোরে দেবার জন্যে মাতব্বর ধরেছেন—ওই রাঘব-বোয়ালকে! (চারদিকে চেয়ে নিয়ে) - আর কেউ আছো নাকি!—ব্রজর মক্কেল-মারা পয়সার এইবার সদ্ব্যবহার হবে—

হিমাংশু। তোমার এইসব অনুমানের জন্যেই তো বিমল চটেছিল—

সুকেশ। কি কোরবো—প্রতিভা যে ঠেল্ মারতে থাকে, রুখ্‌তে পারি না—

অনাথ। তা বউঠাকরুণ যে বড় ওঁকেই ধরলেন? চন্দ্রবাবু তো ছিলেন।

সুকেশ। চন্দোর বাবুর আর সেদিন নেই—জমিদারী লাট খাচ্ছে! তিনিও দৈবের দোর ধরেছেন—মিত্তিরের শরণাগত! তাঁরই সুপরামর্শে এটা হয়েছে। ব্রজর লাইফ্ বীমার টাকা বার কোরে দিতে মিত্তির খরচ টেনেছেন—সাসাত! বুঝলে।

তিনকড়ি। থাক্—ওসব কথায় কাজ নেই। বেলাও হোলো—বেরুতে হবে—

কালাচাঁদকে আসতে দেখে

এই যে কালাচাঁদ—এসো ভাই।

কালাচাঁদ। কি করি বলো দিকি—একটা পরামর্শ দাও। কিছু না করলে আর নয়। যে অবস্থায় পড়েছি—কিছুই ঠিক্ করতে পারছি না। বাবার শরীর ভগ্ন—কয়দিনই বা আছেন। শিষ্যের গঙ্গাতীরের বাড়িতে গিয়ে রয়েছেন। সংসারের কথা তাঁকে শোনাই না। জানই তো—বাবার সঙ্গে মিত্তির কাকার মৌখিক আলাপ থাকলেও অন্তরের মিল্ নেই—হারু-দা আমাদের বাড়িতেই থাকতেন, বাবার কাছে কিছু কিছু ক্রিয়াকর্ম্ম শিখতেন। ইদানিং বাবার যজমানদের কাজ করাতেন। সাত বছর থাকবার পর কি হোলো বুঝলাম না—মিত্তির কাকা তাঁকে টেনে নিয়েছেন—আশ্রয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে যজমান-গুলিও তাঁর হাতে গিয়েছে। তাঁরও তো দরকার। তবে বাঁচতে হ'লে, এক মুঠো যে পেটেও দিতে হয়—তার উপায় দেখতে যে পাচ্ছি না ভাই—

তিনকড়ি। হারু ভট্‌চাজ, সাত বছর শিরোমণি মশায়ের অন্ন খেয়ে—পুত্রবৎ পালিত হয়ে, সব জেনে শুনে নিয়ে শেষ এতবড় বেইমানীটা করলে!

সুকেশ। প্রভুর খপ্পরে পোড়ে গেছে, বেচারা আরো কি করে। তার ভালোর জন্যে তো প্রভু টানেন নি! সমাজে গরীব আর মূর্খের যে বড় দরকার! তারাই যে বুদ্ধিমানদের অস্ত্র। কালাচাঁদ—আর যেন ঐ তোমার হারু দাদাটিকে বাড়িতে ঢুক্‌তে দিও না, কাগজপত্র সাবধান! প্রভুর ইচ্ছার গতি কোন্ দিকে তা বলা যায় না। আমাদের জমিদারীর একটু গন্ধ আছে—মনও তাই সন্দেহমুক্ত নয়।

কালাচাঁদ। আচ্ছা, এখন চললুম ভাই—আমার জন্যে একটু ভেবো—

হিমাংশু। তোমার জন্যে কে না ভাববে ভাই—

তিনকড়ি। একটি নিষ্পাপ নিরীহ লোকের উপর কি অত্যাচার! ওঁদের পুকুরটা প্রভুর চাই!—যাক্ ও পাপ কথা। সকলে কিন্তু কালাচাঁদের জন্যে উপায় দেখো ভাই—

কালাচাঁদ উদাসভাবে চলে' গেল। নিতি গয়লানীর প্রবেশ

নিতি। যেও না যেও না বাবুরা, আমায় নির্ব্বংশটা কোরে যাও—আমি যে গেলুম। সারা বছর ধোরে সতেরো গণ্ডা টাকার দুধ খেয়ে পয়সা দেবার নাম করে না। বলে এতো তাড়া কেনো! আমার এখন মাথার ঠিক্ নেই—সভার উচ্ছোব আসছে—বিশ মোণ দুধ চাই, তেরো মোণ দই! বলেন "সব টাকা—একসঙ্গে চুকিয়ে নিয়ে যাস, কাজে লাগবে। নিলেই খরচ্ করে ফেলবি।" শুনলে কথা? ইদিকে ঘরে আমার ছেলে শুযছে, ডাক্তার দেখাতে পারি না। বলে খরচ করে ফেলবি! ও টাকা কি আমার ছাদ্দে লাগবে?

সুকেশ। নেত্য, কার কাছে পাবে? সতেরো গণ্ডা টাকা ফেলে রাখতে যে সদরালারা পারে না! গৌরী সেন মরে জন্মেছে দেখছি—

নেত্য। আমি মরি, আর তোমার কেবল তামাসা সেজোবাবু।

সুকেশ। ভাবনা কি—ছাদ্দোর টাকা তো রয়েছে। কার কাছে শুনি?

নেত্য। তা ভালো লোকের কাছেই আছে—তা বলছি না। কিন্তু না পেলে আমার চলে কি কোরে?

সুকেশ। এক বছর চল্‌লো কি ক'রে নেত্য?

নেত্য। তোমার যেমন কথা! দশ মাস পেটে ধরেচে বোলে ছেলেটাকে আরো পাঁচ মাস পেটে রাখতে 'বাড়িতে' বলে দেবে না—কেমন পারে!

সুকেশ। ও—তোমার সেই অবস্থা! তা সাধুপুরুষ বললে থাকে নেত্য থাকে। তোমার মঙ্গলের জন্যেই জমাচ্ছেন। কই বললে না কে?

নেত্য। ওই তো নাম করলে! তাই তো জোর ক'রে চাইতে পারি না।

সুকেশ। বাপরে, খবরদার—ওঁরা সব পারেন। তুষ্ট থাকলে তোমার এঁড়েই কেঁড়ে কেঁড়ে দুধ দেবে—

নেত্য। দেখুন না আপনারা? এলুম দুঃখু্ জানাতে, আমি মরছি আর সেজবাবুর তামাসা দেখা! সেখানে চাইতে পেলুম—দেবতা বললে—হরিকে খাওয়াচ্ছিস, তোর বাপের ভাগ্যি তা জানিস? ও টাকা মুখ ফুটে কি চাইতে আছে? সে আমি তোকে গোপনে ডেকে দেবো; —বুঝলি? ও চাইতে নেই। হ্যাঁ রে, গয়লার মেয়ে হ'য়ে গরুর দেবতাকে চিনলিনি? ওরা কার বাঁশী শুনে হুড়্ হুড়্ করে দুধ দিতো? সেই দুধে দুধে বৃন্দাবনের মাটি ভিজে হোড় হয়ে গোপি চন্দন দাঁড়িয়ে গেল। সেই দেবতাকে একটু দুধ খাইয়েচিস্ তারি তাগাদা করিস? এমন কাজ আর করিসনি। সে আমি অন্য নাম করে দিয়ে দেব'খন। আগে তাঁর উৎসবটা মিটিয়ে দে। দুধ, দই, ছানা, ননী, মাখন যা তোর প্রাণে চায় আনিস। ওই সবই তাঁর প্রিয় আহার। যা এখন যা—

সুকেশ। কথাটি কওনি তো?

নেত্য। কথা কইবো? লজ্জায় মরে গেলুম। কিছু তো কেউ শেখায়নি—

সুকেশ। (গম্ভীর) ঠিক্, ঠিক্, করেছ। তবে আবার কি? এইবার সব শিখবে। এঁড়ে আছে কটা?

নেত্য। যাও যাও! (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) ওগো আমার সতেরো গণ্ডা টাকা যে গো!···

অনাথ। কেঁদ না গয়লা-বউ। তোমরা হ'লে গোপিকার জাত—তুমি কেনো গিয়েছিলে? বিধুকে পাঠাওনি কেন?

নেত্য। আ আমার পোড়া কপাল। সে মিন্সেও যে কণ্ঠি পোরে মরেছে গো! সে পোড়ারমুকোও যে 'মেম্বর' গো—(কান্না) আমি দুঃখের কথা জানাতে তোমাদের কাছে এলুম, আর সেজোবাবু কি-না এঁড়ের খোঁজ নেন—আমি আর কোথায় যাবো গো?

সুকেশ। কাঁদিসনি—কাঁদিসনি। তোর টাকা মারে কে। যা—বেলা হয়েছে, আমাদেরও তাড়া আছে। যখন শুনলুম, যা হয় কোরব'খন—

নেত্য। যা হয় করো সেজবাবু, আমি মরে যাব—তোমার দুটি পায় পড়ি—

সুকেশ। চ' এখন।

সকলের প্রস্থান

(ক্রমশঃ)

কালিদাসের কবিত্ব-গৌরব ও পুরাণকার

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার এম্-এ

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় গত বৎসর ভাদ্র-সংখ্যার "ভারতবর্ষ"-এ মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের সৌন্দর্য্য ও দার্শনিক-তত্ত্বের বিচার করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কবির কাব্যকথায় প্রকৃতি-পুরুষ মিলনের যে সূক্ষ্ম আদর্শ নিহিত রহিয়াছে বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহারও আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কবির এই সৌন্দর্য্যানুভূতির মূল উৎস অনুসন্ধান করিতে গেলে যে স্বতই পুরাণকাব্যের কথা মনে পড়ে সেই সম্বন্ধে দু-চার কথা বলিব বলিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা। পুরাণকার যে দক্ষশিল্পী ও রূপকার এবং মহাকবির সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও রসানুভূতি যে পুরাণাবগাহী এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলে পুরাণকে আমরা নূতন চক্ষে দেখিতে শিখিব। এই প্রবন্ধে আমি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অসমাপ্ত কথাগুলি শুনাইয়া দিব।

রস মানবজীবনের শাশ্বত অবলম্বন। রসই মানবের উপজীব্য ও আনন্দস্বরূপ। এই রসানুভূতি যাহার নাই সে চেতনাবিশিষ্ট জীব হইয়াও জড় ও মুক অথবা প্রাকৃত জীবনের বীভৎস পঙ্কিলতায় পরিতৃপ্ত। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-ময়ী বিশ্বপ্রকৃতি ভাবের রসায়ন। রসাস্বাদনে মানবের চিত্তে যেখানে শাশ্বত ভাবের সমাবেশ হয় না সেখানে রসসৃষ্টি নাই; তাই রস অপ্রাকৃত এবং এই অপ্রাকৃত রস সমাবেশেই আদর্শবাদের সৃষ্টি। যে রসসৃষ্টি মানবচিত্তকে কদর্য্যতার গ্লানিতে অভিভূত করে তাহাই বাস্তবতা। মানুষের আদিম বর্ব্বর মনই কেবল এই বাস্তবতার অনুভূতিতে বিকল। সৃষ্টির আদিকাল হইতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া এই দুই অনুভূতি মানব-মনকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে, পরস্পরে অনুস্যূত হইয়া কবির সৃষ্টিকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া নির্দ্বন্দ্বের আভাস দিতেছে। যার ভিতর এই অনুপ্রেরণা নাই, এই দ্যোতনা নাই, এই আভাস নাই সে রসসৃষ্টি ব্যর্থ। এই দুয়ের আনাগোনাতেই কবিত্বের জন্ম,—এই দুয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণেই রসের সৃষ্টি। রামায়ণের ট্রাজেডি মানব-মনকে ক্ষত, বিক্ষত, রুধিরাক্ত করিলেও মানবচিত্ত শুধু এই দ্যোতনায় অমৃতনিস্যন্দিনী ধারায় অভিষিক্ত হয়।

সমাধিকুঞ্জে অকস্মাৎ বসন্তের আবির্ভাব। বিস্ময়-বিমুগ্ধ শঙ্কর বসন্তের এই আকালিকী প্রবৃত্তি দেখিয়া বিক্ষিপ্ত মনকে ধ্যানপ্রবণ করিতে চেষ্টা করিলেন। দেবপ্রয়োজনে রতিপতি মদন দেবদেব মহাদেবের বামপার্শ্বে আসীন,—মহেশ্বরকে কামবাণে ব্যথিত করিতে প্রয়াসী। এই মানসিক বিপর্য্যয়-সঙ্কটে সখীসমন্বিতা পুষ্পাভরণা পার্ব্বতীর আবির্ভাব। হৃদয়,—ভক্তিবিনম্র, হস্তে,—পুষ্পসম্ভার। আর তাঁর রূপ? পুরাণকার সে রূপ বর্ণনা করিতে অক্ষম।

পৃথিব্যাং যাদৃশং লোকে সৌন্দর্য্যং বিবিধং মহৎ।
তৎ সর্ব্বঞ্চৈকতস্তস্যাং পার্ব্বত্যাস্তু বিনিশ্চিতং॥
আর্ত্তবাণি চ পুষ্পাণি ধৃতানি চ তয়া তদা।
তৎ সৌন্দর্য্যং কথং বর্ণ্যমপি বর্ষ শতৈরপি॥

—পার্ব্বতীর শিবপূজা সমাপ্তা। পঞ্চশরের ত্রিভুবনবিজয়ী শরও জ্যামুক্ত। অর্দ্ধনারীশ্বর নিজের মায়ায় নিজেই মুগ্ধ। ইহাই তাঁহার সৃষ্টি-বিলাস। চিরসুন্দরের তপস্বী ঐশ্বর্য্যময়ী প্রকৃতির রূপচ্ছটাকে উপেক্ষা করিলেন না। জগৎপিতা জগন্মাতার ত্রিলোকবিজয়ী সৌন্দর্য্যগানে ছন্দোমুখর হইলেন;—

কিং মুখং কিং শশাঙ্কশ্চ কিং নেত্রে চোৎপলে মতে।
ভ্রূকুট্যৌ ধনুষী চৈব কন্দর্পস্য মহাত্মনঃ॥
অধরঃ কিঞ্চ বিম্বঞ্চ কিং নাসা শুকচঞ্চুকা।
কিং স্বরঃ কোকিলালাপঃ কিং মধ্যঞ্চৈব বেদিকা॥
কিং গতি বর্ণ্যতে হস্ত্যাঃ কিং রূপং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
পুষ্পাণি বর্ণ্যতে কিঞ্চ বস্ত্রাণি চ পুনঃ পুনঃ
লালিত্যঞ্চৈব যৎ সৃষ্টৌ তদেকত্র বিনির্ম্মিতম্॥

বিচলিত শঙ্কর,

"ইত্যেবং বর্ণয়িত্বাতু তপসো বিররামহ।
হস্তং বস্ত্রাঞ্চলে যাবৎ তাবচ্চ দূরতো গতা।"

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়া হাস্যোদ্ভিন্ন অধরে মায়াজিৎ শঙ্করের এই বিমুগ্ধভাব সন্দর্শনে নারীসুলভ সহজভাব পরিত্যাগ করিলেন না।

স্ত্রী স্বভাবাৎ তদা সা চ লজ্জিতা সুন্দরী স্বয়ম্।
বিবৃণ্বতী তথাঙ্গানি পশ্যন্তী চ মুহুর্মুহুঃ॥

পুরাণকারের এই সৃষ্টি সুষ্ঠু, সুসামঞ্জস, স্বচ্ছ, সাবলীল ও সহজ। জগৎপিতাকে সহজ মানুষের পর্য্যায়ে আনিয়া সহজ চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাই বাস্তবের চিত্র। বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টি হয়,—হাসি, কান্না, শোক, দুঃখ, হর্ষ, বিবাদ, প্রেম, অনুকম্পা, স্নেহ ও ভালবাসা। এই দ্বন্দ্বময় বাস্তবকে মন্থন করিয়া যে অমৃতের পরিবেষণ তাহাই আদর্শবাদ, তাহাই রস। এই রসবর্জ্জিত কাব্য, কাব্য নয়, এই রসবর্জ্জিত মনের কবিত্বগৌরব বৃথা।

মানুষ-ভাবাশ্রিত শঙ্কর স্ব-রূপের চ্যুতি আশঙ্কা করিয়া আত্মস্থ হইলেন।—

এবং চেষ্টাং তদা দৃষ্ট্বা শম্ভুর্মোহমুপাগমৎ॥
যদ্যালিঙ্গন মেতস্যাঃ করোমি কিং পুনঃ সুখম্।
ক্ষণমাত্রং বিচার্য্যৈবং কিমহং মোহমাগতঃ॥
ঈশ্বরোহহং যদীচ্ছেয়ং পরাঙ্গ স্পর্শনং মুদা।
তর্হি কোহন্যতমঃ ক্ষুদ্রঃ কিং কিং নৈব করিষ্যতি
এবং বিবেক মাসাদ্য পর্য্যঙ্ক বন্ধনং দৃঢ়ম্।
রচয়ামাস সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরঃ কিং পতেদিহ!

মহাকবি কালিদাসের সৃষ্টির প্রথম চিত্র,—নিশ্চল, নির্ব্বিকল্প, সমাধিবান যোগী মানুষ-ভাববর্জ্জিত হইয়া আত্মারাম। এ সৃষ্টি মহিময়, গৌরবোজ্জ্বল। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুরাশির মতই গম্ভীর, উদার, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপক। এ সৃষ্টির সম্মুখীন হইলে পাঠকের চিত্ত স্বতই অনন্তত্বে লীন হইয়া যায়, সবিকল্প মন নির্ব্বিকল্পত্বে লয় প্রাপ্ত হয়। নির্গুণ, নির্দ্বন্দ্ব, নিরাকার ব্রহ্ম!

অবৃষ্টি সংরম্ভমিবাম্বু বাহমপামি বাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নির্বাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥
কপাল নেত্রান্তর লব্ধ মার্গৈর্জ্যোতিঃ প্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ
মৃণাল সূত্রাধিক—সৌকুমার্য্যং বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ
মনো নবদ্বার-নিষিদ্ধ-বৃত্তি-হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তমাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্॥

—ত্রিলোচন শরীর মধ্যবর্ত্তী বায়ুগণকে রোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, একারণ তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, তিনি যেন বৃষ্টির আড়ম্বর নাই এতাদৃশ একখানি জলসম্বৃত গম্ভীরাকৃতি মেঘ, অথবা তরঙ্গসংঘাতবিহীন প্রশান্ত জলনিধি, কিংবা বায়ুপ্রচার রহিত স্থানবর্ত্তী, সুতরাং নিশ্চল শিখাধারী একটি প্রদীপ। কন্দর্প দেখিলেন, সেই সমাধিমগ্ন ত্রিলোচনের ললাটনেত্রের বিবর দিয়া একটা কেমন জ্যোতির শিখা,—আলোর ধারা বাহির হইতেছে। সেই যোগমগ্ন ত্রিপুরারি যোগবলে, দেহের নবদ্বার হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্বীয় মনকে হৃদয়রূপ অধিষ্ঠানে অবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষগণ যাঁহাকে অবিনাশি ও সনাতন বলিয়া জানেন, সেই স্বকীয় আত্মাকে স্বকীয় আত্মার মধ্যে সাক্ষাৎ করিতেছেন।

মহাকবি এই ত্রিগুণাতীত "আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্" মহেশ্বরে মানসিক বিকার কল্পনা করিয়াছেন! নবদ্বার-নিষিদ্ধ-বৃত্তি সমাধিমগ্ন তাপস অদ্বৈতোপলব্ধিরত হইয়াও পঞ্চশরের তীক্ষ্ণ বাণে ব্যথিত ও চঞ্চল! কালিদাস অতি সন্তর্পণে শ্রদ্ধাবিগলিত অন্তরে জগৎপিতার এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্ম-লীন, ব্রহ্মস্বরূপ মদনান্তক শূলপাণির মদনের নিকট এই শোচনীয় পরাজয় তাঁহার জগৎপিতৃত্বে ও ঈশ্বরত্বে মানব-মনকে স্বতই কি সন্দেহাকুল করিয়া তোলে না? বস্তুত মহাকবি তাঁহার কাব্যের প্রথম ঝঙ্কার এমন চড়াসুরে বাঁধিয়াছেন যে, কবির কাব্যগানে গমকে গমকে সে ঝঙ্কার মূর্চ্ছনাহারা,—সহসা ছিন্ন বীণার তারে কাব্যজননীর বুকফাটা আর্ত্তনাদ! সন্তানের মুখে জনকজননীর শৃঙ্গারলীলা কীর্ত্তন! হরগৌরীর বিহার,—সে যে বিংশশতাব্দীর নায়ক-নায়িকার নগ্ন কামলীলা!

কাব্য-সুষমা যেখানে মানব-মনকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুরভিত করিবে, ভাষার ললিত ঝঙ্কার, কাব্যের ছন্দো-মাধুর্য্য ও উপমা-গৌরবের অন্তরালে সেখানে রহিয়াছে শুধু নারীর আসঙ্গলিপ্সার অনুপ্রেরণা! রসজ্ঞ কবি লেখনীমুখে স্বাদুজলধারা প্রবাহিত করিতে করিতে কাব্যের চরম বিকাশের সন্ধিক্ষণে যে পঙ্কিল স্রোতাবর্ত্ত রচনা করিয়াছেন, অরসজ্ঞ পাঠক সেই সন্ধিক্ষণে কবিত্বের চরম সমাধি রচনা করিবে। মানবচিত্তে যাবতীয় রসের স্ফুরণ করা কবিত্বের চরম গৌরব সন্দেহ নাই, মহাকাব্যের সেও এক বিশিষ্ট

লক্ষণ বটে, কিন্তু সন্তানের মুখে যদি জনকজননীর অনুপম ও অনবদ্য চরিত্র আদি রসাত্মক কদর্য্যগ্লানিতে ভরিয়া ওঠে এবং কুমার জন্মকথায় যদি তাহা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে তবে বাংলার বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ সে দৃষ্টিতে অধিকতর নিপুণ শিল্পী। শিশুর অভাবনীয় প্রশ্নে,—

খোকা মাকে শুধায় ডেকে, "এলেম আমি কোথা থেকে
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে"।

সপ্রতিভা জননীর হাস্যোজ্জ্বল অধর,—মুখে তার চন্দ্রালোক-শুভ্র ধরণীর মায়া। শিশুর কচিমুখে কাব্য-কল্প-লোকের ছায়াপাত করিয়া জননী উত্তর করিলেন,—

মা শুনে কয় হেসে কেঁদে, খোকারে তার বুকে বেঁধে,
ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে।
ছিলি আমার পুতুল খেলায়
প্রভাতে শিব পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙ্গেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি॥
আমার চিরকালের আশায়, আমার সকল ভালবাসায়
আমার মায়ের, দিদিমায়ের পরাণে
পুরানো এই মোদের ঘরে, গৃহদেবীর কোলের 'পরে
কতকাল যে লুকিয়েছিলি কে জানে॥
যৌবনেতে যখন হিয়া, উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে॥
নির্নিমেষে তোমায় হেরে, তোর রহস্য বুঝিনে রে
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে।
ওই দেহে এই দেহ চুমি মায়ের খোকা হ'য়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে॥

হর-নেত্র-বহ্নি-জ্বালায় মদন ভস্মীভূত। ব্যর্থকামা পার্ব্বতী বিক্ষুব্ধা হইলেন। ঐশ্বর্য্যময়ী প্রকৃতির পরাজয় ঘটিল। মহামায়া তাঁর প্রাকৃতশক্তির অভাবনীয় ও শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া নিজেকে ধিক্‌কৃতা মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহেশের নাম মুহূর্ত্ত মাত্র বিস্মৃতা হইলেন না।

নিনিন্দ চ স্বকং রূপং হা হতোস্মি তদাব্রবীৎ
স্বপন্তী চ পিবন্তী চ হ্যশন্তী গচ্ছতী তদা।
তিষ্ঠন্তী চ সখী মধ্যে দিগ্‌রূপঞ্চ মদীয়কম্॥
ইতি সা দুঃখিতা তত্র স্মরন্তী হরচেষ্টিতম্।
সুখং ন লেভে কিঞ্চিদ্বৈ শিব শিবেতি সাব্রবীৎ॥

নারদ কহিলেন, "তপঃ সাধ্যোঽয়ঃ স্বয়ম্। নান্যথা লভ্যতে দেবি দেবৈর্ব্রহ্মাদি কৈরপি"। নারদের নিকট মহাদেবী তপস্যায় দীক্ষিতা হইলেন।

তপস্যায় জগৎ সৃষ্টি। যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা, নর,—সবই তপস্যার উদ্ভূত। ভূলোকে, দ্যুলোকে শুধু তপস্যার মহিমাই বিঘোষিত।

সঙ্কল্পাদ্ দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্ব্বেষামভবন্ প্রজাঃ
তপোবিশেষৈঃ সিদ্ধানাং তদাত্যন্ত তপস্বিনাম্॥

—পূর্ব্বে সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা এবং অত্যন্ত তপস্বী সিদ্ধগণের তপোবিশেষ দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হইত।

যদা পুনঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ন ব্যবর্জ্জন্ত বেধসঃ
তদা মৈথুনজাং সৃষ্টিং ব্রহ্মা কর্ত্তুমমন্যত
ন নির্গতং পুরা যস্মান্নারীণাং কুলমীশ্বরাৎ
তেন মৈথুনজাং সৃষ্টিং ন শশাক পিতামহঃ॥
এবং সঞ্চিন্ত্য বিশ্বাত্মা তপঃ কর্ত্তুং প্রচক্রমে
তদাদ্যা পরমা শক্তিরনন্তা লোকভাবিনী।
তয়া পরময়া শক্ত্যা ভগবন্তম্ ত্রিয়ম্বকম্।
সঞ্চিন্ত্য হৃদয়ে ব্রহ্মা ততাপ পরমং তপঃ॥
তীব্রেণ তপসা তস্য যুক্তস্য পরমেষ্ঠিনঃ।
ততঃ কেন চিদং শেন মূর্ত্তিমাবিশ্যকামপি
অর্দ্ধনারীশ্বরো ভূত্বা যযৌ দেবঃ স্বয়ং হরঃ॥

—যখন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মন হইতে সৃষ্ট প্রজাগণের আর বৃদ্ধি হইল না তখন তিনি মৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। যেহেতু প্রথমে ঈশ্বর হইতে নারীকুল নির্গত হয় নাই; এই নিমিত্ত ব্রহ্মা প্রথমে মৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মা তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আদ্যা পরমাশক্তি লোককর্ত্রী ব্রহ্মার মনে উদিত হইলেন। ব্রহ্মা সেই পরমা-শক্তির সহিত হৃদয়ে ভগবান ত্র্যম্বকের ধ্যান করতঃ উৎকট তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই যোগযুক্ত ব্রহ্মার তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব আপনার এক অংশে কোন এক মূর্ত্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন।

সৃষ্টিকাম ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি ব্যর্থ। সে শক্তি ফিরিয়া পাইলেন কঠোর তপস্যায়। তপস্যাই শক্তি। তপস্যায়

অনুভূতা শক্তিই—আদ্যাশক্তি—নারী, জগৎপ্রসবিনী রূপে, জগৎরক্ষয়িত্রী রূপে। তপস্যায় আবির্ভূতা নারী—শক্তিপ্রতীক। দ্বিধাকৃত সেই শক্তিপ্রতীকই—অর্দ্ধনারীশ্বর।

আত্মবিস্মৃতা হিমালয়-রাজদুহিতা উমা আজ এই তপস্যায় উদ্‌বুদ্ধা। মহাতাপসের কঠোর প্রত্যাখ্যানে বিক্ষুব্ধা হইলেও বুঝিলেন কে আজ তাঁহার চেতনার দুয়ারে করাঘাত করিতেছে। বুঝিলেন, সৃষ্টি দেহবিলাস নয়—দেহাতীত সত্তার বিষয় উদ্বোধনই সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির মূল তপস্যা। দেহরূপে চিদাভাসই সৃষ্টি; চিদাভাস তপস্যা সাপেক্ষ। দেহ ও দেহাভিমান লইয়া নর—নর, নারী—নারী। শুধু রূপ ও দেহ-গৌরবে কুল সার্থক হয় না, ইষ্ট-কামও লাভ হইবার নয়। ক্ষোভ, দুঃখ, নৈরাশ্য, পার্ব্বতীর হৃদয় মথিত করিতে লাগিল। অবসন্ন হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন, "প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা,"—সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়-সংকল্পা নারী অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন,—"তপসারাধনীয়োঽসৌ নান্যথা বশ্যতাং ব্রজেৎ"। অবিচলিত-চিত্তা পার্ব্বতী তপস্যাভিমুখী মন লইয়া মাতার নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিতে পারিলেন না। শুধু নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,—শ্রদ্ধা, বিনয় ও লজ্জায় সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া উমা মায়ের নিকট নতমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পুরাণকার তপস্বিনী উমার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। জগতের সাহিত্যভাণ্ডারে সে নারী-চিত্র বিরল। রাজকুমারী যৌবনে যোগিনী সাজিলেন। মাতাপিতার পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও উমার মন টলিল না। "সুখং নৈবাত্র সম্পেদেহ্হানারাধ্য শিবংতদা।" কবি কালিদাসের ভাষায় "পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।"

বিজ্ঞানের দুর্দ্ধর্ষ অভিযানকে ব্যর্থ করিয়া যে অপরাজেয় মহিমায় গৌরীশিখর স্তব্ধোন্নতশিরে আজও দণ্ডায়মান, সেই গৌরীশৃঙ্গে উমা তপস্যায় চলিলেন। মানবের দম্ভপদবিক্ষেপে যে হিমালয় শৃঙ্গ আজও অনতিক্রান্ত, পুরাণ-কবির লেখনী-মুখে সেই সতী-চরিত্র মহিমা তেম্‌নি অনতিক্রান্তা। পার্ব্বতীর এই তাপসী মূর্ত্তি, সূর্য্যকিরণ সম্পাতে তুষার-কিরীট হিমাচল শৃঙ্গের ন্যায়, ভারতের নরনারীকে চিরকাল বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়া আসিয়াছে।

বল্কলঞ্চ তদা ধৃত্বা মৌঞ্জীং বদ্ধা সুশোভনাম্।
হিত্বা হারং তদা চর্ম্ম মৃগস্য পরমং শুভম্॥
ভূমিশুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা বিধায় বেদিকাং শুভাম্।
তয়া তপঃ সমারব্ধং মুণীনামপি দুষ্করম্॥
চাঞ্চল্যঞ্চ তদা স্থাপ্য শরীরস্য বিশেষতঃ।
সূর্য্যে দৃষ্টিং সমাক্ষিপ্য চকার পরমং তপঃ॥
দীপ্তানাঞ্চ তথাগ্নীনাং মধ্যে স্থিত্বা তু ঘর্ম্মকে।
বর্ষাসু স্থণ্ডিলে স্থিত্বা, শীতে জল সমীপগা॥
এবং তপঃ প্রকুর্ব্বাণা বৃক্ষাণারোপয়ৎ তদা।
সিঞ্চন্তী প্রত্যহং তত্র হ্যাতিথ্যঞ্চাপ্যকল্পয়ৎ॥
বাতশ্চৈব তথা শীতো বৃষ্টিশ্চ বিবিধা তদা।
দুঃখঞ্চ বিবিধং তত্র গণিতং ন তয়া তথা॥

পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যার কথা বয়োবৃদ্ধ ঋষিদের কর্ণে পৌঁছিল।

শ্রুত্বা তু ঋষয়স্তত্র বিস্ময়ং পরমং গতাঃ
দর্শনার্থং সমাজগ্মুঃ কীদৃক্ তপ্তং তপোঽনয়া।

বিস্ময়-বিমূঢ় ঋষিগণ ভাবিতে লাগিলেন—

মহতাং ধর্ম্মবৃদ্ধেষু গমনং শ্রেয় উচ্যতে
প্রমাণং বয়সো নাস্তি মান্যো ধর্ম্মঃ সদা বুধৈঃ
শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তপস্তস্যাঃ কিমন্যৈঃ ক্রিয়তে তপঃ॥

ইতর জীবজন্তুগণও উমার তপস্যায়—"বিরোধিসত্ত্বোজ্ঝিত পূর্ব্বমৎসরম্"—

তদাশ্রমগতা যে চ বিরোধ রহিত স্তদা॥
সিংহা গাব স্তথান্যে চ রাগাদি দোষ সংযুতাঃ।
তন্মহিম্নৈব তে তত্র নাবাধন্ত পরস্পরম্॥

পার্ব্বতীর এই 'লোকশোষণী' তপস্যার কথা নারদ-প্রমুখাৎ মহাদেব অবগত হইয়া বলিলেন, "তয়া পর্ব্বতরাজস্য সুতয়া তপসা হ্যহম্ ক্রীতোঽস্মি।" বৃদ্ধ জটিল ব্রাহ্মণের বেশে মহেশ্বর চলিলেন গৌরীশিখরে অপর্ণার দর্শনমানসে। কি আশ্চর্য্য! শঙ্কর আজ উপেক্ষিতা তাপসীর দর্শনাকাঙ্ক্ষী! কোন্ যাদুমন্ত্রবলে সর্ব্বত্যাগী উমানাথ আজ প্রত্যাখ্যাতা উমার আশ্রমতীর্থে অতিথি?

লোকমুখে শুনি পরমযোগী আজ স্বামীত্বের দাবী লইয়া মহেশ্বরীকে যাচাই করিয়া লইতে আসিয়াছেন। বুঝি বা নারীকে যাচাই করিয়া লইবার এই প্রবৃত্তি পুরুষের পক্ষে চিরন্তন, সনাতন পুরুষত্বাভিমানী আমরা, আমরাও বুঝি সেই লোকোত্তর চরিত্রে এই প্রবৃত্তির ছায়াপাত করিতে কখনও ভুলি না। কবির মুখেও সেই কথারই প্রতিধ্বনি—

কিয়চ্চিরং শ্রাম্যসি গৌরি বিদ্মতে, মমাপি পূর্ব্বাশ্রম সঞ্চিতং তপঃ।
তদর্দ্ধভাগেন লভস্ব কাঙ্ক্ষিতং, বরং তমিচ্ছামি চ সাধু বেদিতুম্॥

বিদ্যারত্ন মহাশয় কবির কাব্যলক্ষণায় কি ধ্বনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন জানি না। আমরা কিন্তু যে ধ্বনি খুঁজিয়া পাইয়াছি, সে ধ্বনি—"আমার তপস্যার অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থা হও।" কবি কালিদাসের সৃষ্টি—প্রেমিক শঙ্কর! কিন্তু যে নারীর 'লোকশোষণী' তপস্যায় ঋষিকুল সন্ত্রস্ত, শ্রদ্ধাবনত, বনের পশুও পশুভাববিরহিত, সেও আজ পুরুষের নিকটে প্রসাদভিখারিণী! পুরাণকার কিন্তু তপস্বিনীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

ত্বয্যেব তপসো দেবি ফলং সর্ব্বং প্রদৃশ্যতে
বরার্থে চ তপশ্চেদৈ তিষ্ঠতু তপ এব তৎ।
রত্নস্তু গ্রহীতারং বৈ ন পৃচ্ছতি গ্রহীষ্যতি॥

—সকল তপস্যার ফল তোমার আয়ত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি মনোমত পতির কামনায় এইরূপ তপঃ-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তবে এক্ষণে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও। কেন না, রত্ন কখনও গ্রহীতার কামনা করে না, গ্রহীতা নিজেই রত্নকে খুঁজিয়া লয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেহ-বিলাসে নারী—নারী। দেহাতীত সত্তার চিন্ময় ভাববিলাস স্ফুরণে নারী মহাশক্তিময়ী, আদ্যাশক্তির প্রতীক। তপস্যা সেই শক্তির জননী। মায়াময়ী প্রকৃতির প্রাকৃত লীলাবিলাসে রাজকুমারী প্রত্যাখাতা, উপেক্ষিতা। তপস্বিনী উমা অকামলীলা-বিলাসে চিন্ময় ভাববিগ্রহস্বরূপিনী। মায়াধর শিব তাপসী উমার সংযোগে অর্দ্ধনারীশ্বর। মহাতাপসের আজ এই যে তপস্বিনী নগদুহিতার পুণ্যাশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ—সে শুধু তপস্যার মর্য্যাদা দান, হৃদয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন, শক্তিহীন শিবের শক্তিগ্রহণ। নারী এখানে পুরুষের প্রসাদ-ভিখারিণী নয়!

কবির সূক্ষ্ম রসবিচারে শিবশক্তির এই লীলাবিলাস—নর-নারীর মিলন-যজ্ঞের আর এক রহস্যময় ইঙ্গিত। সে নিগূঢ় সঙ্কেত কবির বীণার ঝঙ্কারে মুক্তি লাভ করিয়া হিন্দু নর-নারীর দাম্পত্যজীবনের রহস্যজাল ছিন্ন করিয়াছে।

অনেন ধর্ম্মঃ সবিশেষমদ্য মে, ত্রিবর্গ সারঃ প্রতিভাতি ভাবিনি
ত্বয়া মনোনির্বিষয়ার্থ কাময়া, যদেক এব প্রতিগৃহ্য সেব্যতে॥

ত্রিবর্গের সার ধর্ম্ম হে ভাবিনি! আজি মর্ম্ম
তোমার তপস্যা হেরে মোর মনে ধরেছে,
যেহেতু ত্যজেছ তুমি অর্থ কাম ভোগভূমি
মন তব একমাত্র ধর্ম্মাশ্রয় লয়েছে॥

—পদ্যানুবাদ—'ভারতবর্ষ', পৃ—৩৮১)

পুরাণকার যেখানে শুধু এক সূক্ষ্মতত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়া নীরব হইয়াছেন কবি কালিদাস সেই ইঙ্গিতের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিয়াছেন স্পষ্ট ভাষায়। তপস্যার মর্ম্ম কথা কি? কামার্থবিষয়ী ভোগভূমিকে ধর্ম্মসাধনায় লীলায়িত করিবার নামই তপস্যা। এই তপস্যাই জীবন। নর-নারীর জীবনে এই দিব্যচেতনার অভিব্যক্তি বা অবতরণ জীবন-সাধনার চরম কথা। তপস্যায় উমার জীবনে এই দিব্যচেতনা জাগ্রত—"হে ভাবিনী, ধর্ম্মই ত্রিবর্গসার, সেই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া জীবনের সাধনা তোমার সার্থক!" "অহাতীত সত্তার চিন্ময় উদ্বোধনই তপস্যা"—পূর্ব্বে কথিত এই উক্তির যদি কোথাও হেঁয়ালী থাকে, তবে কবি কালিদাসের এই সরস নিভীক উক্তি—"ত্বয়া মনোনির্বিষয়ার্থ কাময়া যদেক এব প্রতিগৃহ্য সেব্যতে"—তাহা দিনের আলোকের মতই স্পষ্ট করিয়াছে।

তপস্যা-মুগ্ধ শঙ্করের "আলাপে প্রলাপে হাসি উচ্ছ্বাসে" গৌরীশিখরের তপোবন মুখর হইয়া উঠিয়াছে। দয়িতার দগ্ধ মনকে লইয়া ছিনিমিনি খেলা প্রণয়-মুগ্ধ নায়কের চিরকালই স্বভাব। আশা, নিরাশা, হর্ষ, পুলক ও বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতে কবি এই অসাধারণ নর-নারীর মিলনের যে পটভূমিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা যেমনই রস-নিবিড়, তেমনি ভাব-গম্ভীর। কবির এই মনোজ্ঞ সৃষ্টি উপভোগ্য, উপাদেয়। কিন্তু কবি এখানেও ভক্ত-শিষ্যের ন্যায় পুরাণকারের অনুগামী।

পার্ব্বতীর আতিথ্যে পরিতুষ্ট হইয়া মহেশ্বর বলিলেন, "রহস্যং বদ মে শুভে" (হে শুভে, রহস্যটা কি আমাকে খুলিয়া বল।)—কেন? "পূজাবিধিস্ত্বয়া দেবি কৃতো বৈ সর্ব্বথাত্মনা। তস্মান্মৈত্রী চ সঞ্জাতা" (হে দেবী, তুমি যখন সর্ব্বান্তঃকরণে আমার পূজা করিয়াছ তখন তোমার সহিত আমার মৈত্রী উৎপন্ন হইয়াছে।)। কিন্তু কেন এসব ব্যাপার? "ঈদৃশঞ্চৈব সৌন্দর্য্যং সর্ব্বং ব্যর্থীকৃতং ত্বয়া" (তোমার এ অলৌকিক সৌন্দর্য্য সব ব্যর্থ) "তৎ সর্ব্বং

কারণং ব্রূহি দৃষ্ট্বা হর্ষমুপাগমে"। পার্ব্বতীর মুখে আবার সেই লজ্জারুণ রাগ! বিংশ শতাব্দীর প্রগল্‌ভা যুবতী নহে। সখীকে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি পার্ব্বতীর মর্ম্ম কথা ব্যক্ত করিলেন।

ত্রিদেন্দ্র প্রমুখান্ দেবানৈশ্বর্য্য সংযুতানপি।
পরিত্যজ্য পিণাকপাণিং বৈ প্রাপ্তুমিচ্ছতি সাম্প্রতম্॥
ইতি সখী মদীয়া বৈ বৃক্ষানারোপয়ৎ পুরা।
তেষু বৃক্ষেষু সঞ্জাতং ফলং পশ্য পুরঃ প্রভো॥
মনোরথাঙ্কুরস্তস্যাঃ পশ্যামি ন কথঞ্চন।
রূপমাত্র্যং শিবং দেব মদনস্যামুহারিণম্॥
তস্মাচ্চ নারদাদেশাৎ তপস্তপ্যতি দারুণম্।

পরিহাস-রসিক শঙ্কর উমার স্বমুখোচ্চারিত স্বীকৃতি না পাওয়া পর্য্যন্ত তৃপ্ত নন। "সখ্যেদং কথিতং সত্যং পরিহাস ইতাপি বা" (সখী যাহা বলিল—এ কি সত্য না পরিহাস?)। পার্ব্বতীর মহা সঙ্কট—কথা না বলিলে নয়, এ যে জীবন-মরণ সমস্যা। নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। বলিলেন

মনসা বচসা সাক্ষাদ্‌বৃতো বৈ শঙ্করো ময়া।
জানামি দুর্লভং বস্তু কথং প্রাপ্যং ময়া ভবেৎ॥
তদপি মনসোৎসুক্যং তপ্যতে চ ময়াধুনা।

বক্তব্য শেষ করিয়া পার্ব্বতী দারুণ উৎকণ্ঠায় লক্ষ্য করিলেন ভণ্ড তাপসের মুখে—তীব্র শ্লেষ, নয়নে চটুল পরিহাস। মহেশ্বরকে গমনোদ্যত দেখিয়া পার্ব্বতী বলিলেন, "কিং গমিষ্যসি"?" কঠোর বিদ্রূপবাণে উত্তর আসিল

এতাবৎ কাল পর্য্যন্তং মমেচ্ছা মহতী হ্যভূৎ।
কিং বস্তু কাম্যতে দেবী দৃষ্ট্বা যামিস্তবন্ ব্রতম্।
অবগতং ময়া সম্যক্ ত্বন্মুখাৎ সুন্দরি শ্রুতম্॥
ইতশ্চ প্রথমং ত্বং মে মান্যা পূজ্যা সদা শুভা
ইদানীং তদ্বিপরীতং জাতং মে নাত্র সংশয়ঃ।

জটিল ব্রাহ্মণ যতখানি শ্রদ্ধা লইয়া পার্ব্বতীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বুঝি বা তাঁহার উপর ততোধিক অশ্রদ্ধা লইয়া স্থানত্যাগে উদ্যত হইলেন। তপস্বিনী উমার মুখে গভীর বেদনার ছায়া, নয়নে নৈরাশ্যের ম্লান দীপ্তি। রুদ্ধশ্বাসে তাহার পর যাহা শুনিলেন, পার্ব্বতীর কর্ণে তাহা যেন বিষ ঢালিয়া দিল।

দত্ত্বা সুবর্ণ মুদ্রাঞ্চ কাচং গ্রহীতু মিচ্ছসি।
হিত্বা চ চন্দনং শুভ্রং কর্দ্দমং লেপ্তু মীহসে॥
নাগঞ্চ বাহনং হিত্বা বলীবর্দ্দং ত্বমিচ্ছসি।
গাঙ্গং জলম্পরিত্যজ্য কূপোদকং সমীহসে॥
সূর্য্যতেজঃ পরিত্যজ্য খদ্যোত দ্যুতিমিচ্ছসি।
চীনাংশুকং বিহায়ৈব চর্ম্মাম্বর মুপাসসে।
গৃহে রাসশ্চ বৈ দিবি ত্যক্ত্বা বনং সমীহসে॥
করোষি ত্বঞ্চ দেবেশ ন যুক্তং কর্ত্তু মুদ্যতা॥
তথা ত্বং সর্ব্বদেবানাং হিত্বা চ সন্নিধিং পুনঃ।
ইচ্ছসি ত্বসুরাণাঞ্চ ন যুক্তং ক্রিয়তে ত্বয়া॥
ইন্দ্রাদি লোকপালাংশ্চ হিত্বা শিবমনুব্রতা
নৈতদ্ যুক্তং হি লোকেষু বিরুদ্ধং দৃশ্যতেঽধুনা॥
ক ত্বং কমলপত্রাক্ষি ক চাসৌ চ ত্রিলোচনঃ।
শশাঙ্কবদনা ত্বঞ্চ পঞ্চবক্ত্রঃ শিবঃ স্মৃতঃ॥
কবর্য্যাশ্চৈব তে রূপং বর্ণিতুং নৈবশক্যতে।
জটাজুটং শিবস্যৈব প্রসিদ্ধং পরিচক্ষতে॥
চন্দনঞ্চ ত্বদীয়েঽঙ্গে চিতাভস্ম শিবস্য চ।
ক দুকূলং ত্বদীয়ং বৈ গজাজিন মথাশুভম্॥
কাঞ্চনাদীনি দিব্যানি ক্বঃ সর্পাঃ শঙ্করস্য চ।
ক চ বা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ ক চ ভূতা বলিঃ প্রিয়ে॥
ক্বাসৌ মৃদঙ্গনাদো বৈ ক্ব চাপি ডমরুস্তদা।
ক চ ভেরী কলাপশ্চ ক্ব চ শৃঙ্গীরবোঽশুভঃ॥
ক চ ঢক্কাবয়ঃ শব্দো গণ্ডনাদঃ ক্ব চাপি হি।
ভবত্যাশ্চ শিবস্যৈব ন যুক্তং রূপমুত্তমম্॥
বপুশ্চৈব বিরূপাক্ষং জন্ম ন জ্ঞায়তে কদা।
যদি ধনং তস্য ভবেৎ কথং দিগম্বরো ভবেৎ॥
বরেষু যে গুণাঃ প্রোক্তা একোঽপি ন শিবেষ্মৃতঃ।
বাহনঞ্চ বলীবর্দ্দো বসনং চর্ম্ম এব চ॥
যদি গ্রাহী ভবেৎ সো হি কথঞ্চ মদনং দহেৎ।
মহায়াস্তু পিশাচাশ্চ বিষং কণ্ঠে বিরাজতে॥
অনাদর স্তথা দৃষ্টো হিত্বাবনমুপাগতঃ।
জাতি র্ন লভ্যতে তস্য বিদ্যাজ্ঞানং ন দৃশ্যতে॥
একাকী চ সদা নিত্যং বিরাগী চ বিশেষতঃ।
তস্মাৎ ত্বন্তু শিবে নৈব মনোযোক্তু মিহার্হসি॥
ক চ হারস্তদীয়ো বৈ ক্ব চ বৈ রুদ্রমালিকা।
সর্ব্বং বিরোধী রূপঞ্চ তব চৈব শিবস্য চ
মহ্যং ন রোচতে দেবি যদিচ্ছসি তথা কুরু॥

ছদ্মতাপসের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া পার্ব্বতীর আর ক্রোধের সীমা রহিল না। দক্ষাত্মজা সতী পিতৃমুখে পতি-নিন্দা শুনিয়া যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই

দক্ষনন্দিনী এখন তপস্যায় রূপান্তরিতা হিমালয় দুহিতা উমারূপে। তপস্যায় পাইয়াছেন তিনি অসীম ধৈর্য্য, অমিত তেজ।

পুরাণকার ও কবির লেখনীমুখে আমরা পার্ব্বতীকে দেখিয়াছি শ্রদ্ধা-বিনম্রা ভক্ত-শিষ্যা—ইষ্টের চরণে হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ্য ঢালিয়া দিতে দণ্ডায়মানা, কখনও বা প্রণয়-পীড়িতা নারী—ভীতা, চকিতা, প্রিয়তমের আসন্ন মিলনে বেপথুমতী, কখনও বা প্রত্যাখ্যাতা, বিরহ-বিদগ্ধা অভিমানিনী, কখনও বা তপস্যায় আত্মনিগ্রহকারিণী। কবির সৃষ্টিকে সার্থক করিয়া তুলিতে নতমুখী তপস্বিনী আজ দৃপ্তা সিংহীর তেজে তেজস্বিনী, অবাঙ্‌মুখী নারী পতিনিন্দায় ধৈর্য্যহারা, বাঙ্‌ময়ী। ব্রাহ্মণের প্রত্যুত্তরে প্রগল্‌ভা যুবতী বেদনা-বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে শিবমহিমা গান করিতে লাগিলেন।

বস্তুতো নির্গুণঃ সাক্ষাৎ সগুণঃ কারণে ন চ
কুতো জাতির্ভবেৎ তস্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥
উচ্ছ্বাসরূপিণো বেদা দত্তাস্ত বিষ্ণবে পুরা
কিং তস্য বিদ্যয়া কার্য্যং পূর্ণস্য পরমাত্মনঃ।
তস্যৈব পক্ষপাতেন দেবা দেবত্বমাগতাঃ।
দর্শনার্থং শিবস্যৈব যদা গচ্ছতি দেবরাট্‌॥
সপ্তজন্ম দরিদ্রঃ স্যাৎ সেবতে যদি শঙ্করন্‌।
তস্যৈব দুর্লভা লোকে লক্ষ্মীঃতস্যানপায়িনী॥
যদগ্রে সিদ্ধয়োঽষ্টৌ চ নৃত্যন্তি প্রতিবাসরম্‌।
অবাঙ্‌মুখাঃ সদা তত্র কুতো বিত্তং সুদুর্লভম্‌॥
যদ্যপ্যমঙ্গলানীহ সেবতে শঙ্করঃ সদা
তথাপি মঙ্গলং তস্য স্মরণাদেব জায়তে॥
শিবেতি মঙ্গলং নাম মুখে যস্য নিরন্তরম্‌।
তস্যৈব দর্শনাদন্যে পবিত্রাঃ সন্তি নিত্যশঃ॥
যদ্যপূতং ভবেদ্ভস্ম চিতায়াশ্চ ত্বয়োদিতম্‌।
নৃত্যস্যাপগমে দেবৈঃ শিরোভি ধার্য্যতে কথম্‌॥
অগম্য ব্রহ্মণো রূপং শিবস্য পরমাত্মনঃ।
কথং তত্ত্বং বিজানন্তি ত্বাদৃশা হি বহির্ম্মুখাঃ॥

ভাষার মাদকতা, উপমার সৌন্দর্য্য ও ছন্দের মুখরতায় কবি যে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত নন্দনকানন সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সৃষ্টি-মহিমার কল্পলোক পুরাণকারের সুনিপুণ শিল্প-বৈচিত্র্যে, অনুপম রস-বিশ্লেষণে ভাবের মূর্চ্ছনায় পূর্ব্বেই সুরঞ্জিত। দিগন্ত-বিস্তৃত নীল আকাশের বুকে শুভ্র মেঘখণ্ড!

শিবনিন্দামুখর জটিল ব্রাহ্মণের সম্ভাষণে কবির কাব্যঝঙ্কার!—

অবস্তু নির্ব্বন্ধ পরে কথং নু তে, করোয়েমামুক্ত বিবাহ কৌতুকং।
করেন শম্ভোর্বলয়ীকৃতাহিনা, সহিষ্যতে তৎ প্রথমাবলম্বনম্‌॥
ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং, কদাচিদেতে যদি যোগমর্হতঃ।
বধূ দুকূলং কলহংস লক্ষণং, গজাজিনং শোণিত বিন্দুবর্ষি চ॥
চতুষ্ক পুষ্পপ্রকরাবকীর্ণয়োঃ, পরোঽপি কো নাম তবানুমন্যতে।
অলক্ত কাঙ্কাণিপদানি পাদয়ো বিকীর্ণ কেশাসু পরেত ভূমিষু॥
অযুক্ত রূপং কিমতঃ পরং বদ, ত্রিনেত্র বক্ষঃ সুলভং তবাপি যং।
স্তনদ্বয়েঽস্মিন্‌ হরিচন্দনাস্পদে, কথং চিতাভস্মঃ রজঃ করিষ্যতি॥
ইয়ং চ তেঽন্যা পুরতো বিড়ম্বনা, যদূঢ়য়া বারণরাজহার্য্যয়া।
বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং ত্বয়া, মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি॥
দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং, সমাগম প্রার্থনয়া পিনাকিনঃ।
কলা চ সা কান্তিমতী কলাবতস্তমস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী॥
বপুর্ব্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা, দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।
বরেষু যদ্‌ বাল মৃগাক্ষি মৃগ্যতে, তদস্তি কিং ব্যস্তমপি ত্রিলোচনে॥
নিবর্ত্তয়াস্মাদসঙ্গীপ্সিতাস্মনঃ ক্বতদ্‌ বিধস্তং ক্ব চ পুণ্যলক্ষণা।
অপেক্ষ্যতে সাধুজনেন বৈদিকী শ্মশানশূলস্য ন য পমৎক্রিয়া॥

শিবতত্ত্ব নিষ্ণাতা পার্ব্বতী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেন। মহেশ্বর প্রীত হইলেন।

কুত্র যাস্যসি মাং হিত্বা ন ত্বং ত্যাজ্যা ময়াপুনঃ।
প্রসন্নোঽসি বরং ব্রূহি নাদেয়ং বিদ্যতে তব॥
অদ্য প্রভৃতি তে দাসস্তপোভিঃ প্রেমনির্ভরৈঃ।
ক্রীতোঽস্মি তব সৌন্দর্য্যং ক্ষণমেকং যুগায়তে॥
ত্যজ্যতাম্‌ ত্বয়া লজ্জা এহি ধামো গৃহং মম।

সংশিতব্রতা উমা তপস্বিনীর মতই উত্তর করিলেন,

পিতুর্গৃহে ময়া সম্যগ্‌গম্যতে তদনুজ্ঞয়া
প্রসিদ্ধৈঃ ক্রিয়তে যদ্বদ্বিবাহঃ পরমঃ শুভঃ॥
তথা চৈব ত্বয়া কার্য্যং লোকেষু খ্যাপয়ন্‌ যশঃ।
পিতুর্মে সফলং সর্ব্বং কুরুষ্বেহ গৃহাশ্রমম্‌॥
বিবাহস্য যথা রীতিঃ কর্ত্তব্যং তৎ তথা ধ্রুবম্‌।
জানাতি হিমবান্‌ সম্যক্‌ কৃতং পুত্র্যা শুভং মম॥

—যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, যদি কৃপা করিবার মানস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার উপর কৃপা করিয়া আপনিই এইরূপ করুন—আমি এক্ষণে আপনার অনুজ্ঞা-ক্রমে পিতৃগৃহে গমন করিতেছি। প্রসিদ্ধ পুরুষেরা যে রীতিতে শুভবিবাহ করিয়া থাকেন, আপনিও লোকে সুকীর্ত্তি ঘোষিত করিয়া সেইরূপ রীতিতে বিবাহ করিবেন। তাহাতে আমার পিতার গৃহ ও আশ্রমাদি সফল হইবে। বিবাহের যেরূপ রীতি আছে তদনুসারে আপনার কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে হিমবান্‌ নিজ পুত্রী আমার শুভকরী হইয়াছে বলিয়া জানিবেন।

কবি কালিদাসের কুমারসম্ভব দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের জন্মকথা। এই জন্মকথার অন্তরালে কোন সূক্ষ্ম দর্শনতত্ত্ব নিহিত আছে কি-না, সে কথা দার্শনিকের বিচার্য্য। অমর কবি বিরচিত মধুচক্র রসপিপাসু মনকে যুগ যুগ ধরিয়া তৃপ্তিদান করিতেছে। সে মধুপান করিতে করিতে মানব-মন এই অপূর্ব্ব কাব্যরসের ভিতর আর কোন তত্ত্বের সন্ধান করিয়াছে কি-না জানি না, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যে মহাতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া এই বিরাট কবিত্ব-সৌধ রচিত হইয়াছে, সে তত্ত্ব—নর-নারীর মহামিলন তত্ত্ব। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা বিশ্ব-প্রকৃতির অদৃশ্য শক্তিসমূহের নিকট ধন, মান, যশ ও অর্থ ভিক্ষা করিবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। কালের দুর্নিবার গতিতে সেই যাজ্ঞিক প্রথা আর নাই। কিন্তু সৃষ্টির ঊষাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নর-নারীর এই মিলনযজ্ঞ তেমনই অব্যাহত। এই যজ্ঞের স্বাভাবিক পরিণাম—সৃষ্টি। এই সৃষ্টি তপস্যাসম্বলিত। আমার প্রবন্ধের মধ্যভাগে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

হরগৌরীর লীলাবিলাসে আদর্শ মিলনতত্ত্ব নিহিত। এ মিলন শুধু দেবতার লীলা নয়। এ মিলনের পরিণামে, অমিতবিক্রম কার্ত্তিকেয়ের জন্ম। উদ্দেশ্য—অসীমশৌর্য্য-সম্পন্ন তারকাসুরের নিধন। পুরুষ-প্রকৃতির এ সংযোগ অপ্রাকৃত মনে করিয়া, মানুষ যদি তার প্রাকৃত জীবন হইতে ইহাকে দূরে রাখিয়া শুধু মাত্র সশ্রদ্ধ প্রণাম জানায়, তবে "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়", "লোকস্তদনুবর্ত্ততে"—এই আপ্তবাক্যাবলীর সার্থকতা কোথায়? দেব ষড়ানন জগৎপিতার মানসসৃষ্টি নয়। অত্যাচারী অসুরের হাত হইতে সমাজকে অব্যাহতি দিবার জন্য পুরুষ-প্রকৃতির এই সংযোগ।

ইহা ব্যতীত ব্যক্তজগৎ যদি অব্যক্তের সত্তায় সত্তাবান্‌ হয় তবে পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবও সেই একের অস্তিত্বে অস্তিত্ববান্‌। আবার সেই এক সত্তারই দ্বৈতবিকাশ—পুরুষ-প্রকৃতি, নর-নারী। এই পুরুষ-প্রকৃতির, নর-নারীর মৈথুনজক্রিয়ায় জগৎসৃষ্টি।

স্ত্রীপুংস প্রভবং বিশ্বং স্ত্রীপুংসাত্মকমেব চ।
স্ত্রীপুংসয়োর্বিভূতিশ্চ স্ত্রীপুংসাভ্যামধিষ্ঠিতম্‌॥
শঙ্করঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বামহেশ্বরী।
সর্ব্বে স্ত্রীপুরুষাস্তস্মাৎ তয়োরেব বিভূতয়ঃ॥

ঐ অসাধারণ দাম্পত্যলীলা নামিয়া আসে মানুষের জীবনে—নর-নারীর যৌনজীবনে, শুধু তপস্যার হোমানল-শিখায়। তপস্যার অগ্নিময় পথ গ্রহণ করিয়াই নর-নারীর জীবন হয় লীলায়িত হরগৌরী লীলায়। দেহ-গৌরবে নর—নর; নারী—রমণী, কামিনী। তপস্যায় সেই নর—শিব; নারী—শক্তি, মহেশ্বরী। শিব মহেশ্বর এই দেহ গরবিনী নারী পার্ব্বতীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তপঃ পরিশুদ্ধমত্তা উমাকে গ্রহণ করিয়া মহাতাপস নীলকণ্ঠ অর্দ্ধনারীশ্বর হইলেন। এই অর্দ্ধনারীশ্বর আখ্যায় জগতের নর-নারী মাত্রেরই জন্মগত অধিকার।

হরগৌরীর এই আদর্শ মিলনে যে সৃষ্টিসম্ভব হইয়াছিল সে সৃষ্টি সার্থক করিয়াছিল দেব-সমাজকে, মানব-সমাজকে। এই অসাধারণ দম্পতীর মিলনলীলায় সাধারণ নর-নারীর মিলন-সমস্যার যে ইঙ্গিত পুরাণকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সমস্যার সমাধানও তাহাতে পরিস্ফুট। হিন্দুর জীবনছন্দ যে বিচিত্র, বহুমুখী ধারায় ছন্দায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সে ছন্দের মূল উৎস ঐ মিলনকেন্দ্র। জাতিকে গতিশীল করিতে, সমাজকে সংহত ও সঞ্জীবিত করিতে, মানুষকে বীর্য্যবান্‌ করিতে, হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গী নিহিত ছিল এই শিবশক্তির মিলনতত্ত্বে।

আজ হিন্দুসমাজ যেমন এক দিকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বৈরাচারে ঘোরতর আচ্ছন্ন, অন্যদিকে তার সমষ্টি জীবন তেম্‌নই শিথিল ও ধ্বংসমুখী। ব্যক্তির ভোগমুখী প্রচেষ্টায় সমাজ পরিণত আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভোগক্ষেত্রে। শ্রীমণ্ডিত ব্যক্তির সকল সাধনায় ফুটিয়া উঠিবে সমাজের বুকে কল্যাণশ্রী। ব্যক্তি ও সমাজ—এক ও বহু। একের ভাব, রস ও সাধনা তরঙ্গ তুলিবে বহুর বুকে—স্তরে স্তরে, ছন্দে ছন্দে। একের সাধনায় সমাজ হইবে পুণ্যময় কর্ম্মক্ষেত্র, মহাসাধকের সাধনপীঠ। এই বহুর ভিতর একক মিলাইতে হইলে এবং একের ভিতর বহুকে প্রকট করিতে হইলে, চাই কঠোর তপস্যা, চাই ভাবোন্মুখী সাধনা। পরমযোগী মহেশ্বরের এই বহুরই কল্যাণ কামনায় 'শক্তিগ্রহণ। *

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি শিবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও কালিদাসের গ্রন্থাবলী হইতে গৃহীত।

যবনিকার অন্তরালে

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

শহরের সৌখীন সম্প্রদায়ের সখের অভিনয়!

তরুণ কবি শশাঙ্কশেখরের নাটক, ভূমিকায় কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের নরনারী অভিনয় করবেন। সারা প্রেক্ষাগৃহ কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে। কৌতূহলী দর্শকদের মুখে অজস্র প্রশ্ন! বিশিষ্ট নাগরিকবর্গ, পেশাদার সমালোচকবৃন্দ, সাধারণ দর্শক—সকলের সে এক বিচিত্র সমাবেশ। ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী সবাই এসেছেন—আমন্ত্রণে কোন ত্রুটি হয় নি।

প্রেক্ষাগৃহের সাড়ম্বর সাজসজ্জা—বিলাসের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র মহানগরীর বুকে এক অনুপম শোভার সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতির বুকে প্রকৃতির সন্তানের স্বহস্ত রচনার সুন্দরতম অভিব্যক্তি যেন একটি অপরূপ আকর্ষণের মত অভিনব। তার মাঝে সংখ্যাহীন উদ্‌গ্রীব জনতার আশ্চর্য্য কৌতূহল দেখে মনে হয়—পাষাণে প্রাণসঞ্চারের এ এক সার্থক প্রয়াস!

সহসা আলোর ঝলমলানি নিভে গিয়ে প্রেক্ষাগৃহে অন্ধকার নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য জনতার মুখর রসনা মূক হয়ে গেল। কৌতূহল জেগে রইল মাত্র কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে সমগ্র চেতনাকে একত্রীভূত ক'রে। পাথরের বাড়ী আবার পাথর!

কিন্তু সে একমুহূর্ত্ত মাত্র! তার পরেই অভিনয় আরম্ভ হ'ল।

যবনিকার অন্তরালে উইংসের একধারে একখানি চেয়ারে বসে তরুণ কবি শশাঙ্কশেখর। প্রথম নাটক, তার প্রথম অভিনয়। শঙ্কাকম্পিত দুরু দুরু বুকে, প্ল্যাটিনামের চশমার ভিতর দুই চক্ষুর দৃষ্টিকে প্রদীপ্ত ক'রে সে তাকিয়ে। এই বই, এই বইয়ের অভিনয়ের ওপর নির্ভর করছে তার যশ ও অর্থলিপ্সা; একমাত্র এই বইয়ের জোরে একরাত্রেই সে শহরের সৌখীন সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যেতে পারে; তার নাম উচ্চারিত হ'তে পারে কলেজফেরতা তরুণ-তরুণীদের মুখে মুখে! সংবাদপত্রের সমালোচকদের অনাকাঙ্খিত মন্তব্য তার ভবিষ্যতের একটা মস্ত ভরসা! কি বলবে ওরা, কি জানি কি কাল লিখবে; হয়ত অভিনয় ভাল হ'বে না, ওরা লিখে দেবে তার জন্য দায়ী নাট্যকার! নাটকের মধ্যে নাটকত্ব নেই কিছুই, আছে শুধু অর্থহীন সংলাপের ছড়াছড়ি! বস্তাপচা কথাবার্ত্তা আর অস্বাভাবিক চরিত্রের সমাবেশে এই নাটকের হয়েছে সৃষ্টি!—এই সব সাত-পাঁচ ভেবে গতরাত্রে সে ভাল ঘুমোতে পারে নি। নাম-করা লেখক সে নয়, খ্যাতি তার নেই, খ্যাতির দুর্গম পথে এই নাটকই হবে তার প্রথম পরিচয়-পত্র; এই তার একান্ত কামনা।

প্রথম দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছিল। আলোর ঝলায় মঞ্চটাকে যেন মায়ালোক ব'লে মনে হচ্ছে। সেই মায়ালোকের মধ্যে দণ্ডায়মানা নায়িকার ভূমিকায় শশাঙ্কের নাম-করা মেয়ে নমিতা সেন। নমিতার বিচিত্রবরণ বেশ-বাসে যেন তাকে প্রাচীন গ্রীসীয় দেবীমূর্ত্তির মত পবিত্র ব'লে মনে হচ্ছে। শশাঙ্কশেখর সেইদিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে। তার নাটক আর সেই নাট্যের নায়িকা—না, এর চেয়ে সুন্দর আর কিছুই হ'তে পারে না!

তার জাগ্রত কৌতূহল আর উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে নাটকের প্রথম অঙ্কের অভিনয় শেষ হ'ল। সে আত্মহারা হয়ে দেখছিল। তার লেখা নাটক, আর সেই নাটকের অভিনয় এত অপূর্ব্ব হ'বে একথা সে কেন ঈশ্বরও কোন-দিন ভেবেছেন কি-না সন্দেহ! এ পর্য্যন্ত তার ত খুব ভালই লেগেছে। এত ভাল—যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু···! প্রেক্ষাগৃহের কোলাহলে সে সচকিত হয়ে উঠল। তার মনে পড়ল—তার ভাল লাগাই প্রথম এবং শেষ কথা নয়। আছেন অজস্র দর্শক, সমালোচক আর বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ—মন্তব্য প্রকাশ করবেন তাঁরা। সেখানে একটা কথা বলার অধিকারও তার নেই। সেথা সে একজন নেপথ্য-পথিক মাত্র। সে লিখেছে, লিখেই তার কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেছে। এখন সে লেখার ফল কি, কি তার প্রাপ্য—স্তুতি না নিন্দা, সে বিচার করার ভার অন্তত তার ওপর নেই।

—চমৎকার লিখতে পারেন আপনি!

শশাঙ্ক একটু চমকে উঠল। নমিতা সেন তার সঙ্গে কথা কইছে।

প্রথম পরিচয়, নমিতার মত নাম-করা মেয়ের সঙ্গে। সে একটু বিব্রত হয়ে উঠল। মুস্কিল, সেখানে আর একখানা চেয়ার পর্য্যন্ত নেই। সে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললে—চমৎকার বই কি, লোকে যে এখনও দেখছে এই ঢের!

বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করলে নমিতা। বললে—বসুন বসুন, আপনি উঠছেন কেন? আমার কি এখন বসার সময় আছে?

শশাঙ্ক হতবুদ্ধির মত বসে পড়ে নমিতার দিকে চেয়ে দেখলে। দেখলে—তার অপরূপ রূপের প্রকাশ! রাফায়েলের আঁকা ছবির মত বিচিত্র এই তরুণীর রূপ! সমগ্র দেহশ্রী ভরে একটি মনোহর তন্ময়তা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। সে মৃদু হেসে বললে—মাফ্ করবেন, আমার লেখার চেয়ে চমৎকার আরও একটা জিনিষ চোখে পড়ল। সে হচ্ছে আপনার অভিনয়! হ'তে পারে চরিত্র আমার সৃষ্টি, কিন্তু তাতে প্রাণসঞ্চার করলেন আপনি! কৃতিত্ব আমার নয়, আপনার!

উচ্ছ্বসিত হ'য়ে নমিতা হেসে উঠল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের তরে! তার পরে সহসা গম্ভীর হয়ে বললে—ওহো, আর যে সময় নেই! আমায় যে আবার কাপড় বদ্‌লাতে হ'বে।

তার গতিশীল গমনভঙ্গীর দিকে চেয়ে শশাঙ্কশেখর একথা না ভেবে পারলে না—বিদ্যুতের মত এর যাওয়া আর আসা, বিদ্যুতের মতই এর রূপ!

অসংখ্য দর্শকের সপ্রশ্ন, মূক দৃষ্টির সম্মুখে দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হ'ল। শশাঙ্ক একবার তার চশমাটা মুছে নিলে। নায়িকা মায়ার ভূমিকায়—নমিতা।

অভিনয় এত স্বাভাবিক হচ্ছে যে, মায়াকে তার সজীব বলে মনে হচ্ছে। একটি প্রাণচঞ্চলতার তরঙ্গে সমগ্র রঙ্গালয় মূক! নাটকের বাকী চরিত্রগুলির কিছুই তার চোখে পড়ছে না। সে দেখছে, একাগ্র হয়ে তন্ময় হয়ে দেখছে—তার সাধের সৃষ্টি, স্বপ্নের সঞ্চয়, কথার অক্ষয় স্তূপ দিয়ে অঙ্কিত—মায়াকে!

···দৃশ্যের পর দৃশ্যের অভিনয়!

একটা ব্যর্থ প্রেমের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী! একটি অযোগ্য পুরুষ ভালবেসেছে, সমস্ত মন আর আত্মা দিয়ে ভালবেসেছে—আকাশস্থিত নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সুদূরতম নক্ষত্রের মত দুর্লভ নারী মায়াকে। মায়া তাকে করেছে প্রত্যাখ্যান। কিন্তু আকর্ষণের মত বিকর্ষণও একটি বৈজ্ঞানিক সত্য! সহসা একদিনের কয়েক ঘণ্টার অবসরে—মেঘে ঢাকা আকাশে যখন সজল সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, তখন মায়া সেই অযোগ্য ব্যক্তির মধ্যে এক অসাধারণত্ব করেছে আবিষ্কার। অন্ধকারের শিহরণে তার প্রেম উন্মুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে অযোগ্য হতভাগ্য তার নাগালের বাইরে—দূরে, অনেক দূরে চলে গেছে। রেখে গেছে—স্মৃতির বৃশ্চিক দংশনভরা একটি অবসরপূর্ণ অখণ্ড কালো রাত, আর কালো মেঘ, বজ্র ও বিদ্যুত। এম্‌নি সময় সেই আঁধার রাতে ঝড় উঠল।

শশাঙ্কশেখরের দুই চক্ষুর দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। নমিতার অভিনয়, প্রাণঢালা অভিনয়—কিছু তার চোখে পড়ছে না। সে দেখছে, দেখছে—সেই আঁধার রাতে, বর্ষার জল-কল্লোলে, ঝড়ের মত্ততায়—মায়াকে, বিরহিনী মায়াকে।

—সত্যি, অদ্ভুত আপনার লেখার ক্ষমতা!

নমিতার সর্ব্বাঙ্গে তখনও উত্তেজনা। মঞ্চে তখনও শোনা যাচ্ছে কৃত্রিম ঝড়ের শব্দ, মুহুর্মুহু বজ্রের আওয়াজ।

সে শশাঙ্কর সামনে এসে দাঁড়াল বিদ্যুতের মত।

শশাঙ্ক বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে দেখলে। নমিতা, অদ্ভুত নমিতা, অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। তার বিশাল চোখ দুটিতে সজল সন্ধ্যার ছায়া।

—আচ্ছা, এ কি কল্পনা?

আকস্মিক এই প্রশ্ন! শশাঙ্ক সচকিত হয়ে উঠল। কি বলবে সে, কি বলবে! সত্যি, এ ত কল্পনা নয়; এ যে একেবারে বাস্তব! তার চোখের সামনে, তারই জীবনে ঘটে-যাওয়া ঘটনা—নিদারুণ, মর্ম্মান্তিক! তাই ত এত দরদ, এত বেদনার প্রকাশ! সে বিহ্বল হয়ে বললে—না!

—না? অস্বাভাবিকভাবে নমিতা বললে। কিন্তু সে অস্বাভাবিকতা শশাঙ্কর চোখে পড়ল না। সে তখন বহুদূর অতীতের স্মৃতির অন্ধকার হাতড়ে আবিষ্কার করেছে—আর একটি নারীকে। সে নমিতা নয়, মায়া। সেই অন্ধকারের

মধ্য থেকেই শশাঙ্ক কথা কইলে অপ্রকৃতিস্থের মত—এ কাহিনী, এ কাহিনী আমারই জীবনের !

—সত্যি ? নমিতার চীৎকারে শশাঙ্ক বাস্তব জগতে ফিরে এল। সে চারিদিক চেয়ে দেখলে। নমিতা সেখানেই। মঞ্চে—তখনো ঝড়! শশাঙ্কর চারিদিকেও ঝড় উঠেছে! ঝড়···ঝড়···ঝড়!

কিন্তু নমিতা চীৎকার করলে কেন! গেলই বা কোথা! বিস্মিত শশাঙ্ক ভাবলে—বজ্র আর বিদ্যুত!

* * *

শেষ রাত্রির অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে। শশাঙ্ক তক্তপোষে অর্দ্ধ শয়ান অবস্থায় অতন্দ্র নয়নে মেসের বিবর্ণ দেয়ালটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। দেয়ালটার স্থানে স্থানে চটা উঠে গিয়ে বালি বেরিয়ে পড়েছে। সে ভাবছে—মায়া আর ঝড়!

সেখান থেকে অনেক দূরে, কল্‌কাতার আর এক অংশে, একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকার একটি সুসজ্জিত ঘরে—তন্দ্রাহীন নয়নে জেগে বসে—আর একটি নারী! সে ভাবছে—আজকের অভিনয়, এ কি সত্যিই অভিনয়? কি অদ্ভুত! যবনিকার অন্তরালবর্ত্তী নিষ্ঠুর সত্য—অতীত, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর অতীত—এত রাত্রির বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের পরে—একটি ভূমিকার রূপে এসে—তার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা—অভিনেত্রীর জীবনকে বিষাক্ত ক'রে দিয়ে গেল! আশ্চর্য্য, কেউ কি আজ বুঝতে পারেনি—এত রাত্রির প্রাণঢালা অভিনয়ের পরে—আজকের রাত্রিই তার প্রথম রাত্রি—যে রাত্রিতে—সে অভিনয় করেনি?

তার বিশাল চোখ সজল হয়ে উঠল।

ঝড়! ঝড় উঠেছে!

বিপ্লব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আনো বিপ্লব, বিপ্লব আমি চাই—
অনাগত মহা-প্লাবনের ঢেউ খাই।
উন্মাদনায় মাতুক ভূলোক
এ শান্তিপুর ডুবু ডুবু হোক,
রস বাদরের পাথার দেখিয়া যাই।

২

আগের দীপালী দেখিতে আমার আশ,
নগরে নগরে নব 'রঘুনাথ দাস'।
করুণ আমার 'রূপ সনাতন'
ভারতের নব যুগ পত্তন
ফিরিয়া আসুক সে গভীর বিশ্বাস।

৩

প্রেমের প্রবাহে হোক দেশ তোলপাড়,
আবার বাড়ুক ঝুলির অহঙ্কার।
মহতের পদ রজ অভিষেক—
সিংহাসনের জাগাক বিবেক,
বিশ্ব হউক মৈত্রীতে একাকার।

৪

ভক্তির বলে বলী হক দুর্ব্বল,
কুণ্ডল কাছে আসুক কমুণ্ডল।
ভারতী হউক মধুচ্ছন্দা,
বহাক ভাবের অলকনন্দা,
অনুরাগে রাঙা হউক ভূমণ্ডল।

৫

নব সাহিত্য, নব সুর, নব গান,
জীবনে করুক নবীন জীবন দান।
এক হয়ে যাক শ্বেত পীত সব,
দধি হলুদের মহা উৎসব,
হিংসা ঘৃণার হয়ে যাক অবসান।

জাতিবিভাগ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

মুক্তির আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ঢাকায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে "জাতিভেদ ও তাহার বিষময় ফল" নামে তাহা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, জাতিভেদ ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জাতিবিভাগের ব্যবস্থাসকল মনু-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। তাঁহাদের মনে ঘৃণার ভাব ছিল না। এজন্য ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, এই সকল ব্যবস্থা ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর।

মনুর আদেশ কিরূপ উচ্চ তাহা মনুসংহিতার ১২।৯১ শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ঐ শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ :—যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন এবং আত্মার মধ্যে সকল প্রাণীকে দর্শন করেন, তাঁহার দৃষ্টিতে সকল প্রাণীই সমান, যিনি আত্মার পূজা করেন—তিনি স্বরাজ্য লাভ করেন।

মূল শ্লোকটির ভাষাও খুব সরল—

সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানং সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি।
সমং পশ্যন্ আত্মযাজী স্বারাজ্যম্ অধিগচ্ছতি॥

মনু ১২।৯১

মনুসংহিতায় জাতিবিভাগের যে বিধান দেওয়া হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই সমদর্শন লাভ করা। প্রকৃত সমদর্শন লাভ করিবার পক্ষে জাতিবিভাগ কিরূপ সহায়ক হইয়াছে একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা দেখান যাইতে পারে।

পার্শীদের পূর্বপুরুষগণ পারস্যদেশে বাস করিত। মুসলমানগণ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া বলিয়াছিল, "তোমরা মুসলমান হও, নচেৎ তোমাদিগকে বধ করিব।" অধিকাংশ পার্শী মুসলমান হইল। যে সকল পার্শী স্বধর্ম রক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আশ্রয় লইল, ভারতের হিন্দু রাজা তাহাদিগকে সাদরে আশ্রয় প্রদান করিলেন এবং অবাধে নিজ ধর্ম অনুসারে পূজা করিবার অধিকার দিলেন। মুসলমানগণ যে পার্শীদের সহিতই এরূপ ব্যবহার করিয়াছিল তাহা নহে, কাশ্মীরেও করিয়াছিল, অন্যত্রও করিয়াছিল। "এক হাতে তরবারি, এক হাতে কোরাণ।" অথচ মুসলমানগণের মধ্যে জাতিবিভাগ নাই, তাহাদের "সার্বজনীনতা ও ভ্রাতৃত্বে" আচার্য রায় "মুগ্ধ হইয়াছেন।" দুঃখের বিষয় আচার্য রায় বুঝিলেন না যে, মুসলমানগণের এই যে উক্তি, "তুমি মুসলমান হও তোমার সহিত ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিব, মুসলমান না হইলে তোমাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিব।"—ইহাই ভেদের অতিশয় অশোভন ও উগ্র অভিব্যক্তি। হিন্দুদের মনের ভাব এইরূপ—আমাদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি পাঁচটি জাতি আছে, সেইরূপ আর একটি জাতি পার্শী বা মুসলমান থাকিতে পারে, সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করুক, পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ হিংসা যেন না থাকে। যে ব্যক্তি যে ধর্মই পালন করুক কাহাকেও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিব না—ইহাই প্রকৃত সমদৃষ্টি। তোমাকে আমার ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, করিলে তোমার সহিত ভেদব্যবহার করিব না, যদি আমার ধর্ম গ্রহণ না কর তাহা হইলে তোমার ন্যায্য অধিকারও তুমি পাইবে না—ইহা প্রকৃত সমদৃষ্টি নহে। ভেদরক্ষা করিয়া যে সমদৃষ্টি তাহাই যথার্থ সমদৃষ্টি। জোর করিয়া ভেদলুপ্ত করিয়া যে সমদৃষ্টি তাহা প্রকৃত সমদৃষ্টি নহে।

জার্মানগণ য়িহুদিদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা সকলেই জানেন। পাশ্চাত্য সকল দেশের লোকই য়িহুদিদিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি পোষণ করেন, অল্পবিস্তর য়িহুদি-পীড়ন সকল দেশেই চলে, জার্মেনীতে ইদানীং তাহা খুব বীভৎস মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যদেশে জাতিভেদ নাই। তবে এত ভেদ দৃষ্টি কেন? হিন্দুগণ কখনও কোনও জাতির সহিত এরূপ অন্যায় অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন কি?

আজকাল এইকথা শোনা যায় যে, সকল মানুষের সহিত সমান ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপী ও অসাধু তাহার প্রতি যে ব্যবহার করা উচিত, যে ব্যক্তি সাধু ও পরোপকারী তাহার প্রতিও সেই ব্যবহার করা উচিত, নচেৎ সাম্যবাদ নষ্ট হইবে একথা কেহ বলেন না। সুতরাং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা কর্তব্য ইহা যথার্থ নহে। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত, ইহাই যথার্থ। সকল সমাজেই এই নীতি গৃহীত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করিয়াছে তাহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই নীতির উপর হিন্দুর জাতিবিভাগ প্রথাও প্রতিষ্ঠিত। অন্য সমাজে কেবল ইহজন্মের কর্মের হিসাব করা হয়। হিন্দুসমাজে পূর্বজন্মের কর্মেরও হিসাব করা হয়। জীব পূর্বজন্মে যেরূপ কর্ম করে তদনুসারে পরবর্তী জন্মলাভ করে—ঋষিগণ তপস্যার প্রভাবে এই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। অন্য দেশের ধর্মপ্রচারকগণ এই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই।

পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিতে জন্ম হয় ইহা বেদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫-১০-৭ বাক্যের অনুবাদ এইরূপ :—'যাহারা উত্তম কর্ম করে তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহারা চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিতে জন্মগ্রহণ করে।' মূল বাক্যটি এইরূপ ;—রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যন্তে, ব্রাহ্মণ-যোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা, কপূয়চরণা কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যন্তে স্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।

জাতি বিভাগের মূল কথা এই যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে তাহার ব্রাহ্মণোচিত কর্ম করিবার স্বাভাবিক যোগ্যতা থাকে। সে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বর্দ্ধিত হয় —তাহাও তাহাকে ঐরূপ কর্ম শিক্ষা করিবার অধিকতর সুযোগ প্রদান করেন। তাহার ব্রাহ্মণোচিত কর্ম করাই কর্তব্য। সেইভাবে সে সমাজের যত বেশী সেবা করিতে পারিবে, যুদ্ধবিগ্রহ বা কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম দ্বারা সে তত বেশী সেবা করিতে পারিবে না। অপর পক্ষে তন্তুবায়ের পুত্রের পক্ষে তন্তুবায়ের কর্মের দ্বারা সমাজের সেবা করা স্বাভাবিক। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করিবে যে, সে যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই জাতির নির্দিষ্ট কর্ম তাহার পক্ষে সমাজসেবার এবং সমাজের মধ্য দিয়া ঈশ্বরসেবা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। গীতা ১৮।৪৬ শ্লোকে এই ভাবটি প্রকাশ করা হইয়াছে।

এইভাবে জীবিকার সহিত ঈশ্বরারাধনা করিবার ভাব সংযুক্ত করিয়া দেওয়াতে প্রাচীন ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ভারতে একদিকে যেমন জ্ঞান ও ভক্তিতে উন্নতি হইয়াছিল, অপর দিকে সেইরূপ কারুকার্য এবং সকল প্রকার শিল্পকলাতেও জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিল।* ভারতের যে পতন হইয়াছে, বর্ণাশ্রমধর্ম সে পতনের কারণ নহে, বৌদ্ধযুগের ধর্মবিপ্লবের পর বর্ণাশ্রম ধর্মে অবহেলাই ভারতের পতনের কারণ। কারণ ধর্মযুদ্ধ করা যে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য কর্ম, ধর্মযুদ্ধে শত্রুবধ করিলে যে পাপ হয় না—বৌদ্ধধর্মে অহিংসা-ধর্মের অতিরিক্ত প্রচারের ফলে লোকে এ কথা ভুলিয়া গেল। হিন্দুধর্মে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কাহাকেও সন্ন্যাস প্রদানের পূর্বে তাহার সন্ন্যাসলাভের অধিকার আছে কি-না, অর্থাৎ তাহার মনে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে কি-না ইহা বিচার করিতে হইত। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে অবিচারে সকলকে সন্ন্যাসী হইতে বলা হইল। ইহার ফলে সমাজে দুর্নীতির প্রসার হইল। এই সকল কারণে হিন্দুসমাজের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনিষ্টকর হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে, যখন বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষিত হয় তখন দেশের সকল বিষয়েই উন্নতি হয় এবং বর্ণাশ্রমে অবহেলা হইলে দেশের অবনতি হয়, তখন ভগবান অবতীর্ণ হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা করেন, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বর্ণাশ্রমধর্মে আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয় ইহা সত্য। কিন্তু কোনও লোকের স্পর্শ করা অন্ন না খাইলে যে তাহাকে ঘৃণা করা হয় তাহা সত্য

* মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "জাতিভেদ প্রচলিত থাকায় ভারতবর্ষের সমুদয় শিল্পকার্য্য বহুপূর্ব্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং সমস্ত পৃথিবীতে তুলনারহিত হইয়াছে।" (সামাজিক প্রবন্ধ, ১০৪ পৃঃ)

নহে। বিধবা নিজের পুত্রের বা কন্যার স্পর্শ করা অন্ন অনেক সময় খান না। তাই বলিয়া তিনি যে পুত্র বা কন্যাকে ঘৃণা করেন তাহা নহে। ভাব শুদ্ধ রাখিবার জন্য এরূপ নিয়ম পালন করা প্রয়োজন এইরূপ বিশ্বাসেই খাওয়া ছোঁওয়ার নিয়ম-গুলি পালন করা হয়। একত্র আহার না করিয়াও এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়াও পরস্পর প্রীতি রক্ষা করা সম্ভব। ভারতবর্ষে চিরকাল তাহা হইয়া আসিয়াছে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, জাতিবিভাগের জন্য ভারত পরাধীন হয় নাই। এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। মুসলমানগণ যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষই জয় করিয়াছিল তাহা নহে! তাহারা মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি নানা দেশ জয় করিয়াছিল, ঐ সকল দেশে জাতিবিভাগ ছিল না, অতএব ইহা কিরূপে বলা যায় যে জাতিবিভাগই ভারতের পরাজয়ের কারণ? বিশেষতঃ অন্যান্য দেশ মুসলমান আক্রমণে যে পরিমাণে বাধা দিয়াছিল, ভারতবর্ষ তদপেক্ষা অনেক বেশী বাধা দিয়াছিল। এই কথা বঙ্কিমবাবু "ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?" এই প্রবন্ধে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। এ বিষয়ে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। মুসলমানেরা যে সকল দেশ জয় করিল প্রায় সকল দেশেই মুসলমান ধর্ম ও মুসলমান রাজত্ব স্থায়ী হইল, কেবল ভারতবর্ষেই তাহা হয় নাই। জাতিবিভাগ যদি হিন্দুকে দুর্বল করে তাহা হইলে পাঠান বিজয়ের পর হিন্দুর দুর্বলতা ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। পরন্তু পাঠান বিজয়ের তিন-চারি শত বৎসর পরে পাঠানেরাই দুর্বল হইয়াছিল, হিন্দুরাজগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিল। মোগল আক্রমণের সময় পাঠানদিগকে পরাস্ত করিতে বাবর কিছুমাত্র বেগ পান নাই। কিন্তু রাণা সঙ্গের সহিত যুদ্ধের পূর্বে বাবর খুব ভীত হইয়াছিলেন, সারা রাত্রি জাগিয়া প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন, আর কখনও মদ খাইবেন না, মদ্যপানের সুবর্ণ পাত্রগুলি দরিদ্রদিগকে দান করিবেন—এই প্রকার অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পুনরায় মোগল বিজয়ের দুই শত বৎসর পূর্বে মোগলশক্তি খর্ব হইল, পাঠান-শক্তিরও পুনরভ্যুদয় হইল না, হিন্দু-শক্তিরই পুনরুত্থান হইল। উত্তরে শিখ-জাতির অভ্যুদয় হইল, দক্ষিণে কাবেরি হইতে উত্তরে পাঞ্জাব পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের গৈরিক পতাকা বিজয়গর্বে উড্ডীন হইল। ইংরেজেরা ভারত জয় করিলেন, মোগলের নিকট হইতে নহে, মহারাষ্ট্র ও শিখদের নিকট হইতে। হিন্দুজাতির বার বার এইরূপ উত্থান দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুর সমাজ-গঠনপ্রণালী (সবর্ণাশ্রম ধর্ম) হিন্দুর পরাজয়ের কারণ নহে, পরাজয়ের অন্য কোনও আকস্মিক কারণ ছিল। ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুর সমাজগঠন-প্রণালী হিন্দুর জীবনে শক্তিসঞ্চার করে, তাই পাঠান ও হিন্দুর সংঘর্ষে প্রথমতঃ হিন্দু হারিয়া গেলেও শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুরই জয় হইয়াছিল এবং মোগল ও হিন্দুর সংঘর্ষে প্রথমে হিন্দুর পরাজয় হইলেও শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুর জয় হইয়াছিল।

কিন্তু জাতিভেদ কি জাতীয় ঐক্যবোধ নষ্ট করে না? না, করে না। স্বয়ং ভগবান্ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, মুনি ঋষিরা যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহা কখনও ঐক্যবোধ নষ্ট করিয়া সমাজের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। একটী সমাজের মধ্যে সকলের অধিকার সমান হইলেই যে ঐক্যবোধ থাকিবে তাহা বলা যায় না। যে পরিবারের মধ্যে পুত্রগণ পিতামাতাকে মান্য করে, পুত্রগণের মধ্যে ছোট বড়কে মান্য করে, সেই পরিবারের মধ্যে ঐক্যবোধ বেশী— না, যে পরিবারে সকলেই সমান অর্থাৎ কেহ কাহাকেও মানে না, সে পরিবারে ঐক্যবোধ বেশী?

জাতিবিভাগের সৃষ্টি যিনিই করুন তাঁহার এই বুদ্ধি ছিল যে, সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্যভাব প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, এই ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই তিনি জাতিবিভাগ করিয়াছেন। ঐক্যের জন্য শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশে জন্ম অনুসারে শ্রেণীবিভাগ নাই, অর্থ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ আছে। অর্থ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ হইলে সমাজে অর্থের গৌরব অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, ধনী ব্যক্তিগণ দরিদ্রদিগকে ঘৃণা করেন, দরিদ্র ব্যক্তিরা ধনী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, সমাজে শান্তি বিনষ্ট হয়। জন্ম অনুসারে শ্রেণীবিভাগ অর্থের ঔদ্ধত্য সংযমিত করে; এক জাতির ধনী ও দরিদ্র একত্র আহার করে ও বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় এজন্য ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে ধনী ও দরিদ্র একত্র আহার বিহার করে না। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায় দরিদ্রের সহিত একত্র আহার-বিহার বর্জ্জন করিতেছেন।

অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থাও মনুসংহিতাতে আছে। মনুর আদর্শ কত মহান্ তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। যাঁহার আদর্শ এত মহান্ তিনি কখনও ঘৃণামূলক ব্যবস্থা দিতে পারেন না। সুতরাং অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থাও ঘৃণামূলক হইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত। ইহা যে ঘৃণামূলক নহে তাহা মনুসংহিতার যে শ্লোকে অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থা আছে সে শ্লোকের অর্থ আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে। শ্লোকটির অনুবাদ এইরূপ: ঋতুমতী রমণী, চণ্ডাল, শব যে ব্যক্তি শব স্পর্শ করিয়াছে, সদ্যপ্রসূতা রমণী ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।

চণ্ডালের সহিত ঋতুমতী ও সদ্যপ্রসূতা পত্নী বা ভগিনীকেও এক পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে। ঘৃণার ব্যবস্থা হইলে এরূপ হইত না। অন্যত্র মনুসংহিতার ৩।৯২ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, চণ্ডালকে যত্নপূর্ব্বক আহার দিবে। যাঁহার মনে ঘৃণার ভাব আছে তিনি একথা বলিবেন না। চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির জীবিকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অন্য জাতির লোক যাহাতে সে জীবিকায় হস্তক্ষেপ না করে তাহার ব্যবস্থাও আছে। তাহার ফলে ভারতে অস্পৃশ্যজাতীয় লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া চারি-পাঁচ কোটি হইয়াছে। যদি তাহাদিগকে ঘৃণা করা হইত, তাহাদের উপর অত্যাচার করা হইত তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা কমিয়া যাইত। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া রেড ইণ্ডিয়ান, হোটেনটট্ প্রভৃতি জাতি লুপ্তপ্রায়। ট্যাস্‌ম্যানিয়ার শেষ আদিম অধিবাসীর মৃত্যুসংবাদ সেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্যদেশের অস্পৃশ্যতা বাস্তবিক ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য সেখানে অস্পৃশ্যজাতির বিলোপ হইতেছে। হিন্দু শাস্ত্রবিহিত অস্পৃশ্যতা ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, যে মন্দ কর্ম করে তাহার মন অপবিত্র হয়, পরজন্মেও মনের অপবিত্রতা বিদ্যমান থাকে, তাহার সংস্পর্শে অন্য ব্যক্তির মনে অপবিত্রতা সঞ্চারিত হয়—এই সকল তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা এক দিকে উচ্চবর্ণের পবিত্রতা রক্ষার সহায়ক, অপর দিকে নিম্নবর্ণের পবিত্রতা উৎপাদনের সহায়ক, কারণ পূর্বজন্মের মন্দ কর্মের জন্য দেহ অপবিত্র মনে করিয়া অনুতাপ করিলে পূর্বজন্মকৃত কর্মজনিত মলিনতা শীঘ্র দূর হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন যে, বিড়াল ঘরে আসিলে ঘর অপবিত্র হয় না, চণ্ডাল আসিলে কেন হইবে? মানব বুদ্ধিমান জীব, বিধিনিষেধ মানবের জন্যই করা হয়; বুদ্ধিহীন পশুর জন্য করা সম্ভবপর হয় না। এক ব্যক্তি অপরের গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে তাহার দণ্ড হয়, বিড়াল অনধিকার প্রবেশ করিলে দণ্ড হয় না। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে বিড়াল অপেক্ষা মানবকে ঘৃণা করা হয়। মানসিক পবিত্রতার দিক হইতেও বিচার করিলে দেখা যায় যে, অন্যায় কার্যকারী মানবের সাহচর্যে যেরূপ মনের অধোগতি হয় পশুর সাহচর্যে সেরূপ হয় না। একটি দুশ্চরিত্র রমণীর কৌতূহলে ধর্মানুরাগ হইয়াছিল। সে রামকৃষ্ণ পরমহংসের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়াছিল বলিয়া পরমহংসদেব অত্যন্ত আপত্তি করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায়, যে-ব্যক্তি পূর্বে অন্যায় কর্ম করিয়াছিল সে অন্যায় কর্ম ত্যাগ করিবার পরও অস্পৃশ্য থাকে। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সে পরজন্মেও অস্পৃশ্য থাকে, কারণ দুষ্ট সংস্কারযুক্ত মন পরজন্মেও বিদ্যমান থাকে। অনুতাপ এবং ভক্তিতে মন নির্মল হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্মল হইয়াছে কি-না তাহা সচরাচর বুঝিতে পারা যায় না। যাহার মন নির্মল হয় সে পরজন্মে উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করে।

আচার্য রায় বলিয়াছেন, "সমস্ত পৃথিবী আজ অস্ত্রোন্নতি সাধনায় মগ্ন।" পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে একথা লোকেই বিশ্বাস করিত। কিন্তু জার্মানী ইটালী প্রভৃতি যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে এখন আর একথা বলা যায় না। এখন স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিও পাশ্চাত্যজাতিসমূহের বিজ্ঞানে উন্নতি হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্যক্ উন্নতি হয় নাই। জাপানের উন্নতির পরিচয়স্বরূপ আচার্য রায় বলিয়াছেন যে তাহারা "সুবৃহৎ রণতরী নির্মাণ করিয়াছে; কামান বন্দুক বিস্ফোরক প্রস্তুত করিয়াছে।" কিন্তু চীনের সহিত যুদ্ধে জাপান যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহাতে কি বুঝিতে পারা যায় নাই যে, প্রকৃত যাহা উন্নতি, মনের উন্নতি—তাহা জাপানের হয় নাই? আচার্য রায় বলিয়াছেন, "হাজার হাজার বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতি জীবনের কোনও লক্ষণ দেখাইতে পারিল না।" জীবনের লক্ষণ কি রণতরী, কামান, বন্দুক, বিস্ফোরক প্রস্তুত না করিলে দেখান যায় না? এই হাজার হাজার বৎসরের মধ্যে শঙ্করাচার্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণ

পরমহংসের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাতে কি জীবনের লক্ষণ দেখান হয় নাই? রাণা প্রতাপ, শিবাজি, পুত্ত, জয়মল্ল, প্রতাপাদিত্য—ইঁহারা কি জীবনের লক্ষণ দেখান নাই? আচার্য রায় বলিয়াছেন যে, জাতিবিভাগের ব্যবস্থা পৃথিবীর কোনও দেশে, কোনও কালে ছিল না বা নাই কিন্তু যাহা পৃথিবীতে অন্য কোনও দেশে কোনও কালে ছিল না, তাহা যে অবশ্যই মন্দ হইবে তাহা কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যায়? কর্মফল এবং পুনর্জন্ম তত্ত্বের উপর জাতিবিভাগের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। গভীর তপস্যার ফলে আর্ষঋষিগণ এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আচার্য রায় বলিয়াছেন যে, উত্তর ও পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, তাহার কারণ "হিন্দুসমাজের অসহনীয় উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া অস্পৃশ্য হিন্দুগণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।" কিন্তু ভারতবর্ষের সর্বত্রই ত অস্পৃশ্যতা প্রচলিত। অন্য প্রদেশের অস্পৃশ্যরা কেন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে নাই? প্রকৃতপক্ষে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইবার কারণ এই যে, ঐ অঞ্চলে বৌদ্ধের সংখ্যা বেশী ছিল। বৌদ্ধধর্মের সেরূপ শক্তি ছিল না যাহাতে মুসলমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। হিন্দুধর্মের সে শক্তি ছিল। এজন্য ভারতের অন্য প্রদেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান হয় নাই। আচার্য রায় বলিয়াছেন যে শাস্ত্রে জাতিভেদের বিরুদ্ধেও নিদর্শন পাওয়া যায়, কারণ "ব্যাসদেব পরাশরের ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ও সত্যকাম কুমারী জবালার পুত্র।" কিন্তু এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, জাতিবিভাগ অনিষ্টকর এবং বর্জন করা উচিত। মৎস্যগন্ধা ক্ষত্রিয় রাজা বসু উপরিচরের কন্যা। পরাশরের তপঃশক্তি প্রভাবে তাঁহার ঔরসজাত পুত্র মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ এবং মহাপুরুষ হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ইহা সত্য। কিন্তু সেজন্য বিশ্বামিত্রকে অনেক তপস্যা করিতে হইয়াছিল। তপস্যার দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়, সুতরাং জাতিপরিবর্তনও হইতে পারে। জবালা কুমারী ছিলেন একথা উপনিষদে নাই। জবালা এই কথা বলিয়াছেন "বৎস, তোমার গোত্র আমি জানি না, কারণ যৌবনে যখন গৃহকর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম তখন তোমাকে লাভ করিয়াছি।" (আচার্য শঙ্কর এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন)। শাস্ত্রে যখন স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, বর্ণশঙ্কর অমঙ্গলজনক তখন এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণসঙ্কর মঙ্গলজনক বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না।

আচার্য রায় এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন

সর্বত্র শাস্ত্রম্ আশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য বিনির্ণয়।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে॥

আচার্য এই বাক্য কোন্ শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বলেন নাই। উদ্ধৃত করিতে বোধ হয় একটু ভুল হইয়াছে। মূল বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে যুক্তি সহকারে বিচার করা প্রয়োজন। বিচারের দ্বারা প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করা উচিত। এই বাক্যের এরূপ উদ্দেশ্য হইতে পারে না যে শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করা উচিত। গীতা ১৬।২৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুবাদ এইরূপ: "অতএব কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ণয় করিবার জন্য শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রের বিধান কি তাহা জানিয়া কর্ম করা উচিত।"

বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত সর্বত্রই জাতিবিভাগের প্রশংসা আছে। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষাকর্ত্তা। ব্যাস বাল্মীকি মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ ইহা প্রচার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য রামানুজ তুলসীদাস শ্রীচৈতন্য রামকৃষ্ণ সকলেই ইহা সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং এই ব্যবস্থা অনিষ্টজনক হইতে পারে না। এই ব্যবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া টিকিয়া আছে। পাশ্চাত্যদেশে প্রকৃত সামাজিক ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই বলিয়া বার বার নূতন ব্যবস্থা প্রচারিত হইয়াছে এবং অশান্তির শেষ নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম অনুসরণ করিয়া ভারতের অবনতি হয় নাই, বর্ণাশ্রমধর্ম অবহেলা করিয়া অবনতি হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে, দরিদ্রের জীবিকা রক্ষা করিয়াছে, সমগ্র জাতিকে পরিশ্রমশীল করিয়া প্রাচীন কালে শিল্পবাণিজ্যের অশেষ উন্নতি করিয়াছে, বর্ত্তমান সময়েও ইহা আমাদের উন্নতির পথে কিছুমাত্র অন্তরায় নহে। ইহা পরিত্যাগ করিলে ধর্ম এবং ইহলোকে উন্নতি উভয় বিষয়েই অনিষ্ট হইবে।

ভূস্বর্গ চঞ্চল *

শ্রীদিলীপকুমার রায়

স্নেহময়ী !

তোমার সঙ্গে সেদিন তোমার বাড়িতে যে সব কথা হ'ল তার রঙে মনটা আমার এখনো যেন রঙিয়ে আছে, যদিও এ দুদিনের মধ্যেই তোমার আমার মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান এনে ফেলেছে বাষ্পযান ও পেট্রোল যান দুয়ে মিলে। এখন আমি শিলঙের একটি অতি রমণীয় উদ্যানে ব'সে তোমাকে লিখছি এই চিঠি। আমার সামনেই ধরণীদার রেইনফোর্স'ড্-কংক্রীটে-গাঁথা ঘড়িওয়ালা বিজলি হৌস শোভমান। দশ বৎসর বাদে দেখি, এই কংক্রীটের অভ্যুদয় যেখানে সেখানে—অথচ আমি এ হেন কোনো সৌধে এ যাবৎ বিরাজ করি নি এ কি কম দুঃখের কথা।

দুঃখ কেন? যেহেতু এ-কংক্রীটের পরিচ্ছন্নতা যৎপরোনাস্তি কংক্রীট—এমন পরিষ্কার পরিপাটি! মহাত্মা গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধা আমার অকৃত্রিম, কিন্তু তিনি যা-ই বলুন না কেন—পর্ণপত্র, গোরুর গাড়ি, আর চরকার যুগ যে আর ফিরবে না এ ভাবতেও বুকে বল আসে না কি? কাশ্মীরেও একথা মনে হ'ত বার বারই। ধরো যদি বজরাটিতে বিজলি বাতির বদলে থাকত টিমটিমে তেলের কুপি? তাহলে ঝড়-ঝাপটা তো দূরের কথা, একটু হাওয়া উঠলেও টাল সামলানো দায় হ'ত না কি? এই শিলঙের কথাই ধরো না। এমন সুন্দর রাস্তা ঘাট কি পায়ে চলা মেঠো পথের চেয়ে ভালো না? মেঠো পথে অবশ্য আপত্তি নেই, ঘেসো রাস্তায় হাটতেও খুবই ভালো লাগে আমার। কিন্তু তা ব'লে যদি ধরো এই জগতে ঘেসো পথই হ'ত একছত্র অধিপতি, তাহ'লে কবির কবিত্বও কি বেশ একটু ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত না?

ঠাট্টা নয়। তোমার সঙ্গে সেদিন যে সব কথা হচ্ছিল সে সূত্রে আমার মনে হয়েছে কত বারই আধুনিক সভ্যতার কথা। আমাদের বিশ্বাসের নানান্ গভীর মূলই যে আজ আলগা হয়ে গেছে—এ কম দুঃখের কথা নয়। তুমি ঠেকে শিখেচ—এ যুগে ভক্তিকে ভক্তি করলে কত বিপদ, গুরুকে গুরু বললেও কত গুরু গঞ্জনাই না সইতে হয়। জীবনের পরম লক্ষ্য অনেকটা ঝাপসা হ'য়ে গেছে এ-ও পরিতাপের বিষয় সন্দেহ কি? তবু তুমি যে বলছিলে এসেন্স ভালোবাসো, সুন্দর জিনিষ ভালোবাসো—এ সবের কি কোনো সুরাহা হ'ত কোনো দিনো, যদি আধুনিক সভ্যতার নানা উদ্ভাবনী প্রতিভা সৌন্দর্যসৃষ্টির কাজে বাহাল না হ'ত? আধুনিক যুগের আনুষঙ্গিক দোষ আছে অনেক—মানি, কিন্তু সনাতন যুগের সবই যে নিখুঁৎ ছিল একথাও তো মেনে নেওয়া যায় না। কালিদাসের কথাই তাই প্রামাণ্য ধ'রে নেওয়া যাক যে, পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্—আধুনিক যা কিছু সবই অনিত্য। সাধু সাধু হে কালিদাস! যদি আরো হাল আমলের দার্শনিক নজির চাও তো এডিসনের সার রজার ডি কভার্লির জয়জয়কার ক'রে বলি এসো—Much can be said on both sides.

আধুনিক সভ্যতার একটা হ'তে-পারত-চমৎকার-অভ্যুদয় হ'ল স্বয়ংসিদ্ধ যানবাহন। শিলঙে যখন এহেন বায়ুগতি রথে আমরা সদলবলে হুহুশ্ শব্দে "দূরের জিনিষ এনে কাছে কাছের জিনিষ ফেলে পাছে" ছুটি—তখন একথা মনে না হ'য়েই পারে না; তবু এ-অভ্যুদয়কে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন করতে পারি না, যেহেতু এ আজো শুধুই ধনীচর্যা করে। রোসো রোসো, আমি জানি যা তুমি বলতে যাচ্ছ: এ দোষ মোটরের কোনো মোটরস্থে নয়। এও মানি যে এর মূলে সমাজবিধির হাজারো গলদ লুকিয়ে। তবু সবাই যা পেতে পারে না, সমাজের ব্যবস্থা তার জন্যে দায়িক হ'লেও তাকে ভোগ করতে মনের কোথায় খচ খচ করে না কি? একজনের সঙ্গে কালই হচ্ছিল এই কথা মোটরে। আমি বলছিলাম: "বিলাস ক্ষতি করেই।" সে বলল: "কিন্তু বিলাসের সীমান্তরেখা টানা যাবে কোথায়?"

* ধরণীকুমার বসুর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লিখিত; শিলঙে তাঁর ওখানে যখন অতিথি ছিলাম সেই সময়েই।

এ ধরণের সাধারণ প্রশ্নের উত্তর পুরোপুরি দেওয়া কঠিন, বিশেষ অভাব-অভিযোগের ক্ষেত্রে। কারণ একজনের কাছে যা অত্যাবশ্যক আর একজনের কাছে যে তাই বিলসন একথা অপ্রতিবাদ্য। তা ছাড়া, বিলাস সাধারণ লভ্য হ'লে এ নিয়ে "বিবেকদরশনে ভাই আসে না ক্রন্দন।" তাই তো সোশ্যালিস্‌মের মূলনীতিটি না মেনেই উপায় নেই: মানুষ শক্তিতে সমান নয় বটে কিন্তু তাই ব'লে তাদের মধ্যে ধনবাঁটোয়ারা সমান হ'লে সে লাভের বখ্‌রা পায় সমগ্র সমাজ। ধরো আমরা "শিলঙ-পীকে" উঠলাম ধরণীদার মোটরে, কিন্তু আমার মোটরহীন বন্ধুদের মধ্যে অনেককেই তো পায়ে হেঁটে উঠতে হ'ল। অবশ্য দুর্গমের অভিযানের আনন্দ অস্বীকার নয়, কিন্তু তবু বলা চলে যে মোটরে শিলঙ-পীকে আরোহণ করে যে অপরূপ দৃশ্য দেখলাম তারও মূল্য যথেষ্ট। আধুনিক সভ্যতার প্রধান দোষ তো তার উপকরণবাহুল্যে নয়—উপকরণ-বাঁটোয়ারার বৈষম্যে। কিন্তু সমাজতত্ত্ব নিয়ে এ গুরুগম্ভীর গবেষণা থাকুক এখন, বিশেষ যখন এ-তত্ত্বের তাত্ত্বিক আমি সত্যিই নই। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' গীতার এ রুলিং আমি শিরোধার্য মনে করি বরাবরই। তবে যানবাহনের প্রসঙ্গটি টেনে আনা অবান্তর হয় নি, কেন না বক্ষ্যমান বিষয়বস্তুটি কাশ্মীর হ'লেও কাশ্মীরকে আমরা তো কম পাই নি এই যানবাহনের প্রসাদে।

শুধু কাশ্মীরই নয়। কাশ্মীর থেকে পেশোয়ারের পথে যে-অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম—বিশেষ ক'রে দুমেল ছাড়িয়েই—তার নেই তুলনা। দুমেল থেকে একটা পথ নেমেছে রাওলপিণ্ডির দিকে, আর একটা—পেশোয়ারের দিকে।

গুলমার্গ অঞ্চল ছাড়া কাশ্মীরের জাঁকালো দৃশ্য যে-সব আছে সেদিকে আমরা বড় ঘেঁষি নি—যথা অমরনাথ বা আরো কত জায়গা—মনে নেই নাম। কারণ সে সব স্থল দুর্গম—শুধু ব্রজবাবুর জুড়ি ক'রেই যাওয়া যায়—(কি-না পদব্রজে) তাই মনে একটা দুঃখ ছিল। আমি প্রবৃত্তিতে দুরারোহী নই। দৈহিক ক্লেশ অথবা সওয়ার বা কৃচ্ছ্র সাধনের মহিমাও আমার মন টানে না খুব বেশি। আমি মনে করি মানুষের স্বধর্ম বন্যতা নয়—তার স্বধর্ম তথা স্বভাব হ'ল নাগরিকতা। অরণ্য তার কাছে উপভোগ্য হয় তখনই যখন সে পোষ মানে। আলডুসের লেখায় প্রায়ই লাখ-কথার-এক-কথাদের দেখা মেলে ব'লে তাঁকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। এ রত্নবাণীদের একটি হচ্ছে তাঁর এই উক্তি যে, মানুষ বন নিয়ে কবিত্ব করে ততক্ষণই, যতক্ষণ বন ষোলো আনা বন হ'য়ে না ওঠে। তিনি লিখেছেন—একবার জাভায় এক দুর্গম পত্রসঙ্কুল অরণ্যে ঢুকে তিনি বেরুতে আর পথ পান না। উঃ শ্বাস আসে আটকে—কোথায় লোকালয় কোথায় লোকালয় ক'রে প্রাণ ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। কবিরা বন নিয়ে মাতামাতি করেন, বন কাকে বলে জানেন না ব'লে। বনের মতন বন মনের মতন হয় কেবল শ্বাপদের বা খেচরের। মানুষ স্বভাব-আরণ্যক নয়—অন্তত স্বভাবে সভ্য মানুষ নয়। কী? সেকালের তপোবন? কিন্তু সে সবও ঐ যে বললাম নির্ভেজাল বন ছিল না—তাদের নাম কানন। সেখানে হিংস্র পশুপক্ষীর প্রাদুর্ভাব ছিল না; নীবার, আলবাল, শকুন্তলা, বালব্রহ্মচারী, গুরু, তাপস, তাপসী, ধেনু, উদ্যান—এসবই ফুটে উঠত আনন্দ ও শান্তির রসে রসিয়ে।

কিন্তু তবু সভ্য মানুষের মধ্যেও আছে তার আদিম আবির্ভাবের প্রবণতা। তাই দুর্গম বিপদসঙ্কুল গিরিবর্ত্ম পর্বতচূড়া মেরুযাত্রা আরো তার কাছে বরণীয়, ভয়াবহ জলপ্রপাত বা গহ্বর তাকে আগে মুগ্ধ করে। উপনিষদে বলেছে সেই পরম পুরুষের ভয়েই বায়ু বয়, আগুন পোড়ায়, গ্রহউপগ্রহ স্বকক্ষপথে ঘোরে। ভয়াবহ কিছুর মধ্যে তাই তো পাই বিরাটের স্পর্শ। আমরা নিত্যই থাকি নিজেদের সসীমতার গণ্ডীবদ্ধ—সসীমতা আমাদের ক্ষুণ্ণ করে, ব্যাহত করে, বাড়তে দেয় না। তাই থেকে থেকে ছাড়া পেতে ছুটে যাই গহন অরণ্যে—তুঙ্গ পর্বতে—অপার জলযাত্রায়।

পেশোয়ারের পথে এই শ্রেণীর বিপুলকায় খাত, গহ্বর—ravine দেখলাম। স্থানে স্থানে স্রোতস্বিনী এসে মিলিয়েছে তার নাগরিক সুরটি। যেন তপস্বীর দুশ্চর তপশ্চর্যার বর দিতে এসেছে কোনো অপ্সরী। বড় মনোহর কঠোরে-কোমলে এ-সঙ্গম। সচরাচর রসভোগে দ্বৈতই আমাদের মন টানে। সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু, আলো ছায়া, মেঘ রৌদ্র—এদেরই আঙনে আমরা বাসা বাঁধি—অল্প নিয়েই ঘর করি। কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই তো অনল্পের এত আদর। পেশোয়ারের পথে শৈলমালার বিপুলবিস্তীর্ণ মূর্তির অপরূপ মহিমায় দৃশ্যে একথা আরো মনে হ'ল—যেন

নতুন ক'রে। মনে হ'ল মানুষের স্বভাব বিচিত্র—কত ভাবে যে সে রস চায়, কত রূপে যে সে নিজেকে দেখতে চায়! পর্বতের চূড়া থেকে অকারণ ঝাঁপ দিতে পারে যে উন্মাদ কেবল সেই বটে, কিন্তু কে না কল্পনায় ঝাঁপ দিয়েছে বলো? আকাশে উড়তে যদি সত্যিই হ'ত—মানে দেহসম্বল হ'য়ে—তাহ'লে মাথা যে ঘুরত এ নিশ্চয়, কিন্তু তবু পাখি দেখে কে না কল্পনায় পাখি হয়েছে? আকাশ আমাদের আপন নয়—তবু কে বলবে সে মাটির চেয়ে আমাদের কম আপন? না স্নেহময়ী, তুমি তো জানো ভাই, ধ্যানে অনন্তপথের জয়যাত্রী হওয়ায় কী আনন্দ। জীবনে সবচেয়ে বড় উপলব্ধিদেরকে বলতে গেলে প্যারাডক্সের মতন শোনায়। শোনাবেই, কেন না মহৎ উপলব্ধিগুলি বড় ব'লেই গড়পড়তাদেরকে করে নাজুর, আর তাতে অনাদূতরা জোট পাকিয়ে রুখে ওঠে। এইখানেই প্যারাডক্সের মনস্তত্ত্ব নিহিত।

* * * *

একথার আর একটা প্রমাণ পেলাম সিন্ধুনদে এসে। এপথে পেশোয়ার যেতে হ'লে সিন্ধুনদকে না ডিঙিয়ে লক্ষ্যসিদ্ধি অসম্ভব। আমাদের পেট্রলযানকেও তাই যেতে হ'ল সিন্ধুনদের উপর দিয়ে।

আহা কী সে দৃশ্য স্নেহময়ী! নদীর সঙ্গে পাহাড়ের সে কী সমন্বয়! নীলাঞ্চলা আবর্ত সঙ্কুলা উদারকিঙ্কিণি সিন্ধু! ব্যাকরণ ডুবল—ক্ষমণীয়, সিন্ধু নদ নদী নয় যে! অথচ নীলাঞ্চলা না ব'লে নীলাঞ্চল বললে মন গালে যেন চড় মারে, অভ্যেস স্নেহময়ী, অভ্যেস। সেই যে রাজপুত্তুর বলেছিল না—কী শীত কী গ্রীষ্ম তাঁর দুটি ক'রে বোম্বাই আম চাইই চাই ক্ষীরযোগে? কোটালপুত্তুর আপত্তি ক'রে উঠল: "কিন্তু শীতকালে বোম্বাই আম পান কোত্থেকে?" রাজপুত্তুর উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলল: "কি জানো? ও কেমন অভ্যেস!" তাই নদের বিশেষণে স্ত্রীত্ব আরোপ।

অসম্ভব নিত্য হয় সম্ভব সমান
অভ্যাসের ইন্দ্রজালে—শোনো পুণ্যবান্

কিন্তু যা বলছিলাম। সিন্ধুনদী—থুড়ি নদের—সে মহিমময় দৃশ্য ভুলব না। হরিৎ নীলাভ জল যেন ডাকছে নীলাম্বরাভ ফেনমালার হাততালি দিয়ে। ওখানে পাহাড়—চলেছে অশ্রান্তনটিনী তার নীল নূপুর বাজিয়ে—দেখলে প্রাণের কণ্ঠে জেগে ওঠে গান:

সুপ্তির সাথী শান্তিরে করো আদর যে কত ছন্দে!
চিরজাগ্রতা চিরচঞ্চলা গতির অধীরানন্দে!
শ্যামলের কায়া ধরো কলকায়া মিটাতে মরুর পিপাসা
রূপরাগ তব কণ্ঠে উছল, মরমে—অরূপ দুরাশা।
সুনীল লহরী মুকুরে ফলিয়া নীলিমার জয় যাত্রা
আনিলে ধরার অঙ্গনে কোন্ অধরার বরবার্তা?

* * * *

পেশোয়ার শহরটি গোলাপ ফুলের জন্যে বিখ্যাত জানো বোধ হয়। কিন্তু এছাড়া এর আর একটি বস্তু উৎকৃষ্ট—জলহাওয়া। পেশোয়ারে পৌঁছতে না পৌঁছতে—

কণ্ঠে জাগিল সঙ্গীত, প্রতি অঙ্গে জাগিল শিহরণ

অম্বর হ'তে আলো-অপ্সরী করে আনন্দ বিতরণ

ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা কে না পড়েছে শিশুকালে? হঠাৎ মানুষের জন্মভূমির আবহাওয়া তার দেহমনের আবহাওয়াও গড়ে তোলে এ-কিম্বদন্তী অংশত সত্য সন্দেহ কি? দৈহিক গড়ন সম্বন্ধে একথা বলতে বেশি কেউ আপত্তি করবে না, কিন্তু আমাদের মনের প্রকৃতিও যে বাইরের প্রকৃতির প্রভাবে অনেকখানি গ'ড়ে ওঠে একথা হ'ল সেই শ্রেণীর "প্রতিজ্ঞা" যাকে পুরোপুরি প্রতিপন্ন করা অসাধ্য না হ'লেও দুঃসাধ্য সন্দেহ নেই। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের মূল দৃষ্টি, বস্তুতান্ত্রিক—মেটীরিয়ালিস্ট—কাজেই যদি বলি—"ঐ দেখ, জলহাওয়ার গুণে পেশোয়ারি বা কাবুলিরা কী বলিষ্ঠ", তা হ'লে হয়ত একথাও বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্তহিসেবে মানবেন যে এ-দেহবলের ছোপ মনেও লাগে। কারণ, অভিজ্ঞতায় একথাও সবাই জানে, প্রকৃতি যেখানে বেশি প্রশ্রয়দাত্রী নন সেখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব বেশি সমৃদ্ধ। পেশোয়ারীদের ধরণধারণ দেখে ভালো লাগে আরো এই জন্যে। এরা দেখতেও যেমন জোয়ান মনেও তেমনি উদার। এ সম্পর্কে এদের অধিনায়ক আবদুল গফুর খাঁ ওরফে সীমান্ত গান্ধির কিছু বর্ণনা করলে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি।

বহুদিন থেকে আমার ইচ্ছা ছিল, এই নির্ভীক বলিষ্ঠ

উদার মানুষটির সঙ্গে আলাপ করব। ছবিটবিতে এঁর চেহারা আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল। পেশোয়ারে আমি এসেছিলাম খাইবার পাস দেখতে নয়—এই মানুষটিকে দেখতে—তাঁর নিজকীয় পরিবেশে—তাঁর ভিটেয়—উৎমানজই গ্রামে। এ সময়ে (অক্টোবরে) মহাত্মা গান্ধিও তাঁর অতিথি ছিলেন। কাজেই দুই মহাত্মাকে এক সঙ্গে দেখার লোভ সামলাতে পারি নি।

পেশোয়ারে আমরা উঠেছিলাম তত্রত্য হিসাবনায়ক—কনট্রোলার—শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী মহাশয়ের অতিথি হয়ে। চৌধুরী মহাশয় সহধর্মিণী সহ যথোচিত আতিথ্যধর্মিষ্ঠ হ'তে ত্রুটি করেন নি, এ কথা বোধ হয় না বললেও চলতে পারে। কারণ ও অঞ্চলে তাঁর আতিথ্য-বদান্যতা একটা দ্রষ্টব্য বস্তু: বিশেষ, বাঙালীরা আসে পেশোয়ারে প্রথম, খাইবার পাস দেখবার দুর্ভোগ সইতে (পেশোয়ারে এলে ঐ নীরস পাসটি দেখাই চাই, নইলে লোকে বলবে কি এই ভয়ে···সেই সনাতন টুরিস্টীয় কর্মভোগ!) দ্বিতীয়, চৌধুরী মহাশয়ের আতিথ্য উপভোগ করতে। এ হেন অতিথি-বৎসলতা দাতাকর্ণের পরকমই দেখা গেছে। ধরণীদা যেমন ভ্রমণ স্পেশালিস্ট, চৌধুরী মহাশয় তেমনি অতিথি-স্পেশালিস্ট, আতিথ্য গ্রহণে না অবশ্য—আতিথ্য দানে। এঁর সহধর্মিণীও এ বিষয়ে সত্যিই পতিমর্মিণী। কি না, উভয়ে কম্পীট করেন কে বেশি অতিথিবৎসল দেখতে ও দেখাতে। কেবল এক বিষয়ে এঁদের মধ্যে ঈষৎ মতভেদ আছে—(no rose without a thorn বলে না?)—সে হচ্ছে, ভোজ্য-বিধানে। চৌধুরী মহাশয় সংযমী পুরুষ, কাজেই অতিথিদের পাকস্থলী অত্যধিক ভারাক্রান্ত না হয় এদিকে তাঁর দৃষ্টি প্রখর। চৌধুরাণীর মতিগতি উল্টো। তিনি আটাশটির কম ব্যঞ্জন রাঁধেনই না। এতে বড় মজা হ'ত সময়ে সময়ে। ধরো, দুপুরে চৌধুরাণী আমাদের খুব খাওয়ালেন গণ্ডেপিণ্ডে। বিকেলেও চা-যোগে তিনি বিপুলপত্নিনী হ'তে চান, বলেন:

"হে অতিথি জেনো
যত খাই তত বল দেহে পাই, তাই কম খেতে চাই না।"

অম্‌নি চৌধুরী মহাশয় হাঁ হাঁ করতে করতে পাদপূরণ করেন:

"না অতিথি শোনো,
যত খাই তত মোটা হ'য়ে যাই, তাই বেশি খেতে ধাই না।"

সময়ে সময়ে এহেন প্রশ্রয় নিরুৎসাহের আলো-ছায়ায় বেশ একটা আমোদের ছবি ফুটে উঠত।

* * * *

চৌধুরী সাহেবের কৃপায় মোটরের অভাব ছিল না।

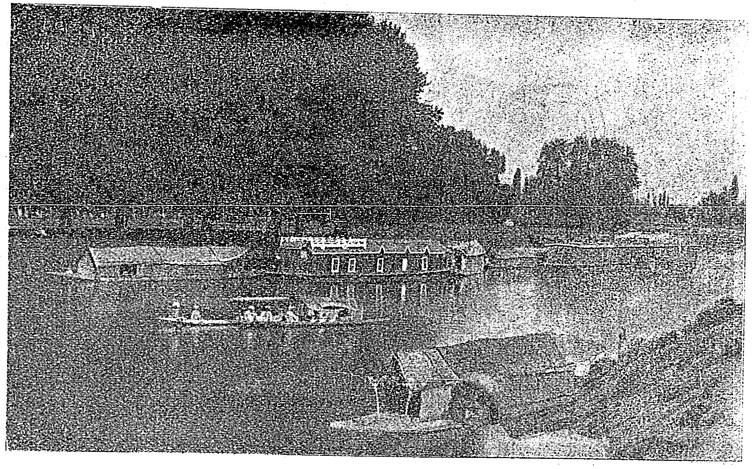

ঝিলম ও বজরা

কাজেই মোটরে ক'রে দুদিন গেলাম মহাত্মা গান্ধি-সন্দর্শনে আবদুল গফুর খাঁর বাড়ি।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ি। খাঁ সাহেবের ছেলে করল অভ্যর্থনা। মহাত্মাজি স্নানের ঘরে গেছেন। খাঁ সাহেব এলেন ধীরে ধীরে। কথা বলছিলেন আশ পাশের গ্রামবাসীদের সঙ্গে—কুঁড়ে ঘরে বেঞ্চিতে ব'সে। তিনি শুধু জীবন নয়, প্রতি আচরণেই তাদের সপাংক্তেয়। মহাত্মাজিকে এই ধরণের পল্লী-পরিবেশে দেখতে পেয়ে ভাগ্য গণলাম। তার উপর সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু ও শিষ্য আবদুল গফুর খাঁ। সব জড়িয়ে এ-যাত্রাটা আমাদের হয়েছিল জয়যাত্রা। (এখানে তোমাকে চুপি চুপি ব'লে রাখি, মহাত্মাজিকে হাল আমলে

অশ্রদ্ধা করার যে ফ্যাসানের চল হয়েছে বাংলা দেশে সে-ফ্যাশনে আমি সায় দিই না, মহাত্মাজিকে ঠিক আগেকার মতনই ভক্তি করি)।

এমন অনেক সময়েই হয় যে, দর্শনীয়কে কল্পনায় এত বাড়িয়ে রেখেছি যে চোখে দেখলে ধূসর লাগে—যেমন উল্টোটাও হয়—অর্থাৎ বাস্তব কল্পনাকেও মানায় হার। খাঁ সাহেব এই শেষের দলের লোক। আসল মানুষটিকে কল্পিত মানুষের চেয়েও বেশি ভালো লেগে গেল। পেশোয়ারীদের পৌরুষ, দীর্ঘকায়, ঈষৎ রক্তিম স্বাস্থ্যদীপ্তির আভা গৌরবরণ শ্মশ্রুল মুখটিকে মনোহর ক'রে তুলেছে।

আলাপ করলেন হিন্দিতে।

শ্রীমতী দে জায়া ও তাঁর পোষা বাঘ

কত দুঃখ তাঁকে সইতে হয়েছে শুনলাম তাঁর মুখে। কতবারই যে জেলে গেছেন ও বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। তখন জেলের ব্যবস্থা ছিল জঘন্য। খাবার ছিল এমনই অখাদ্য যে খেয়ে তাঁর সমস্ত দাঁতের মাড়ি উঠল প'চে—সব কয়টি দাঁত তুলে ফেলতে হ'ল। আরো কত ক্লেশ। অথচ সেজন্যে কোনো ক্ষোভ নেই এঁর মনে। খাঁ সাহেব মার্টার স্বধর্মে। বহুবার কারাবরণ করেছেন জেনে শুনেই। কিন্তু সেখানে যে দুঃখ পেয়েছেন সে-দুঃখকে প্রাপ্য ব'লেই বরণ করতে পেরেছেন। স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের ম'তই স্বেচ্ছাবৃত দুঃখ তাঁর চরিত্রকে করেছে উজ্জ্বলতর—তাঁর চেহারায়ও লেগেছে এই ঔজ্জ্বল্যের ছোপ। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের কি একটা লেখায় পড়েছিলাম—দুঃখকে যখন মানুষ আত্মসাৎ করে তখন দুঃখের তাপ ফুটে ওঠে আলো হয়ে। ক্ষোভ হ'ল এই তাপ—তেজ হ'ল আলো। খাঁ সাহেব তাঁর দুঃখের সমস্ত ইন্ধনটুকুর তাপ আলোয় রূপান্তরিত করেছেন তাঁর প্রসন্ন গ্রহণশক্তির রসায়নে। কিন্তু দুঃখ নিয়ে যখন মানুষ ক্ষুব্ধ হয় তখন সে আলো না বিলিয়ে বিলোয় শুধু তাপ। এই সত্যটি খাঁ সাহেবের সংস্পর্শে এসে যেন নতুন ক'রে প্রত্যক্ষ করলাম।

কথায় কথায় তিনি তুললেন পেশোয়ারীদের প্রসঙ্গ। বললেন, এরা সহজেই বিশ্বাস করে। এদের হিংস্রতা সম্বন্ধে যত সব রচনা তার সাড়ে পনর আনাই ভুয়ো। তবে এরা কথা দিয়ে কথা না রাখলে অগ্নিশর্মা হ'য়ে ওঠে। তাই এদেরকে অহিংস রাখা শক্ত বই কি। কিন্তু তা ব'লে প্রকৃতিতে এরা মোটেই অশান্ত নয়। তবে কি-না তেজস্বিতার যে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ প্রবৃত্তিদমন তথা আত্মসংযমে, তার খবর এরা বড় একটা রাখে না। এরা হুজুগের সাড়া দিতে যতখানি তৎপর, অসদাচরণের শোধ তুলতেও ঠিক তেম্‌নিই পটু। কিন্তু মোটের উপর এরা প্রকৃতিতে সরল, একরোখা, বিশ্বস্ত।

আরো অনেক কথাই হ'ল তাঁর সঙ্গে। তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন একটা শান্ত অথচ কঠিন দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে যে সময়ে সময়ে অভিভূতি আনে। এঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে বেশ বোঝা যায়, কেন এঁকে পেশোয়ারীরা তাদের "বাদশা"—বাচা—শিরোপা দিল। যারা বহুকে চালায় তাদের মধ্যে থাকে একটা আশ্চর্য চুম্বক। তার বর্ণনা হয় না। বস্তুতান্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সত্য থাকলেও সে-ভাবের ভাবুকদের এ-মত অগ্রাহ্য যে, যুগই গড়ে তার মানুষকে। রাসেলের বিশ্লেষণই সত্যের বেশি কাছ ঘেঁষে যায় যে, মস্ত পার্সনালিটিরা অনেক সময়েই স্বয়ম্ভু, যুগ তাদের গড়ে নি—বরং তারাই যুগধর্মের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে বার বার, বার বার, বার বার। আজকের দিনে একথা কে অস্বীকার করবে যে, লেনিনের জন্ম না হ'লে রুষদেশে এত বড় একটা আন্দোলন এত তাড়াতাড়ি রূপপরিগ্রহ করতে পারত না? ধর্মের এলাকায় একথা যে আরো হাজার গুণে

সত্য, তা কি আর বলার দরকার আছে? বুদ্ধ বা খৃষ্ট যদি না জন্মাতেন তো মানবসভ্যতার চেহারা যে বদ্‌লে যেত এটা অনুমান নয়—এরই নাম নৈশ্চিত্য। কিন্তু এ গবেষণা থাক্, খাঁ সাহেবের কথাই বলি! কথায় কথায় বললাম: "খাঁ সাহেব, আপনার মতন এমন মানুষই তো আমাদের চাই—যাঁর মধ্যে রয়েছে প্রেমের সঙ্গে সত্যের যোগ। আপনি মিল ক'রে দিন হিন্দু-মুসলমানের। নইলে ভারতবর্ষের গতি কী হবে বলুন?"

খাঁ সাহেবের মুখে ফুটে উঠল করুণ হাসি, বললেন: "আমি কী করব বলুন? মিল হয় তখনই যখন অন্তরে আসে নির্ভর—যখন মানুষ প্রেমের মন্ত্রকে দলের মন্ত্রের চেয়ে বড় ব'লে মানে। ভিতরে প্রীতির ভিৎ পাকা না হ'লে বাইরে মিলনের ইমারৎ শুধু তাসের ঘরই হ'য়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষই আচারগত ধর্মের চেয়ে আন্তর মৈত্রীকে বড় ক'রে না দেখবে ততদিন হ'তে পারে শুধু সুবিধে-গড়া সন্ধি—সৌভ্রাত্র্যের রাখীবন্ধন না।"

এমন সময়ে স্নান সেরে মহাত্মাজি ঢুকলেন। উঠে দাঁড়ালাম সবাই।

একগাল হেসে মহাত্মাজি ইঙ্গিত করলেন বসতে। মুখে খুশির কী যে দীপ্তি! জহরলালের কথা মনে পড়ে—মহাত্মাজির শিশুসরল হাসি যে না দেখেছে মহাত্মাজির মাহাত্ম্যের অনেকখানিই তার কাছে অগোচর র'য়ে গেল।

ওমা, মহাত্মাজি আজ মাস দুই হ'ল মৌনী! কথাটিও কইবেন না। প্রায় ব'সে পড়লাম।

বললাম: "আমরা বড়ই বিপন্ন বোধ করছি—মহাত্মাজি কথা বলেন না কতদিন?"

মহাত্মাজি হেসে একটি কাগজে লিখলেন: "মাস দুই। এতে শুধু যে আমারই ভালো হয়েছে তাই নয়, অপরেরও মঙ্গল" (My silence is good for me and certainly good for everybody else)। ঘরে হাসির ঢেউ প'ড়ে গেল।

একথা সেকথার পরে মহাত্মাজি কাগজে লিখে প্রশ্ন করলেন: "Why have you not brought the Nightingale?"

আমি বললাম: "উমাকে কাল আনব, সে গেছে আজ খাইবার পাস দেখতে।"

* * * *

সেদিন উৎমানজইয়ে গিয়েছিলাম শুধু আমি, মায়া ও মানুদা। পরদিন গেলাম সদলবলে—চৌধুরী-দম্পতীও সঙ্গ নিলেন।

মহাত্মাজিকে প্রণাম করতেই তিনি তাকালেন এযার দিকে। বললাম: "এরই কথা আপনি লিখেছিলেন আপনার পোস্টকার্ডে। ও আপনাকে আজ ওর নাচ দেখাতেই পণ ক'রে এসেছে।"

মহাত্মাজি সায় দিয়ে খুব একগাল হাসলেন।

বললাম: "এতে আপনি খুশি, না অখুশি, মহাত্মাজি?"

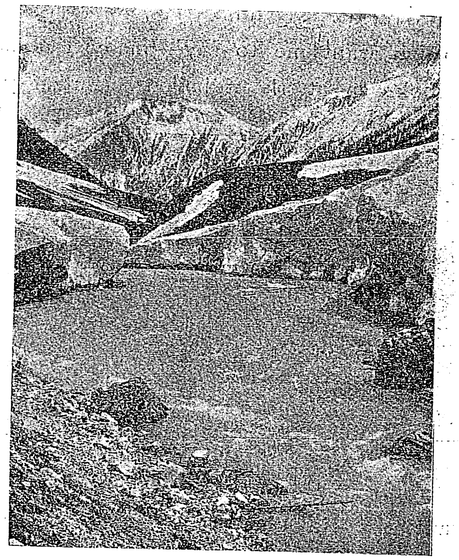

কাশ্মীরে সিন্ধুনদে তুষার দৃশ্য

মহাত্মাজি কাগজে ফের লিখলেন: "গীতার ভাষায় বলতে গেলে আমার হওয়া উচিত না-খুশি, না-অখুশি।" (In the language of the Gita I should be neither glad nor sorry.)

বললাম: "কিন্তু হৃদয়ের ভাষায়?"

মহাত্মাজি তৎক্ষণাৎ লিখলেন: "হৃদয়ের কোনো ভাষা নেই, কেন না, হৃদয় কথা কয় শুধু হৃদয়ের সঙ্গে। (The heart has no language, it speaks to the heart).

প্রথমে উমার সঙ্গে আমি গাইলাম ডুয়েটে "চাকর রাখো জি।" তারপর এবা নাচল ওর গানের সঙ্গে :

আজ সখী সুন বাজত বাঁসরিয়া
নির্মল নীরে যমুনা তীরে গাবত সাঁবরিয়া।
ইত্যাদি

বিশেষ ক'রে এ গানটির সার্গমের সঙ্গে এবার নাচ উঠল জ'মে। এ-সার্গমটি শুনো গ্রামোফোনে। অনেকের এ নতুন ধরণের সার্গমটি অত্যন্ত ভাল লেগেছে ব'লেই শুনতে বলছি।

এবার বিদায় নেবার পালা। মহাত্মাজি কাগজে লিখলেন: Do you want me to say—'many thanks'? It looks so utterly ridiculous. But if you

গান্ধীজি, আবদুল গফুর খাঁ প্রভৃতি

want the ridiculous you may have them. (তোমরা কি চাও আমি বলি—'বহু ধন্যবাদ'? এক্ষেত্রে ধন্যবাদ জ্ঞাপন যে কী হসনীয়! তবে যদি তোমরা হসনীয়কেই চাও—তবে নেও)।

*   *   *   *

ফিরবার সময়ে মান্নুদা আমি বাবুল ও হাসি ফিরলাম একটি মোটরে। সে মোটরের সারথি ছিলেন যিনি তাঁর নামকরণে হয়েছিল একটুখানি চুক। কারণ, নিশ্চয়ই তাঁর নাম হওয়া উচিত ছিল শ্রীমৎ বিদ্যুৎবীর্য। উঃ কী হাঁকানোটাই না তিনি হাঁকালেন! মান্নুদা বেচারীর তো চক্ষু চড়কগাছ। বাবুলের, হাসি-র ও আমার খুব ভালো লাগছিল মোটরের সে-উল্কাবেগ—কিন্তু আরো ভালো লাগছিল সারথিকে। মান্নুদার সেই গলদ্‌ঘর্ম উপদেশ, সানুনয় উপরোধ—সর্বোপরি সর্বনাশা বেগের অজস্র কুফলের অপ্রতিবাদ্য ব্যাখ্যা :

ঐ ঐ ঐ—করছ কী হে?—সাম্‌নে ও যে গরুর গাড়ি!
চললে সোজা টিপ ক'রে তায়? সুস্থ কি আর ফিরব বাড়ি?
এখানে হাসপাতালো নয় ভালো শুনি—ঐ ঐ—আঃ—
কী করো হে? ডাইনে বেঁকো—ঐ যে ডোবা—
সাম্‌লাও—বাঃ—
গেল গেল ঘোলা জলে হায় পৈতৃক প্রাণটা গেল—
না যাক্, গেছি বেঁচে—ও কী! ডাইনে কেন? বাঁয়ে হেল।
দুগ্‌গা দুগ্‌গা—এমন ফেরেও হায় বিভুঁয়ে মানুষ পড়ে!
এমন করলে কেমন ক'রে আত্মারাম আর থাকেন ধড়ে?
ও কি—হাসি! অত হাসা মানায় না বালিকায় মোটে···
গান গাও তাই রক্ষে পেলে—নৈলে যেতাম বিষম চ'টে।
কী মণ্টু? তুমিও ব্রুটাস্! এ-ও কি হ'ল হাসির কথা?
কবি তুমি নও—হ'লে হায় ব্যথার ব্যথী বুঝতে ব্যথা।
স্কিড্ করা কার নাম জানো কি? পিছ্‌লে গেলে কী যে—ইয়ে
হবে জানো? ফুঁ যদি দিই মণ্টু-গুঁড়ো ফরফরিয়ে
যাবে উড়ে—আর বাবুলের হাস্যবদন হবে যে কী—
গেল গেল—এই দুষ্‌মণ সারথিটা ভেবেছে কী?
ও কী? হাসি! ও হাসি নয় বোদ্ধা হাসি—ওর যে কী নাম
জানো কি গো? নির্বোধ যে সারে কি তার হাসির ব্যারাম?
উল্টোলে এ রথ সরলা, কী যে হবে জানো কি তা?
উল্টে যাবে বিধির রীতি—নিচে মাথা ওপরে পা।
এই—ড্রাইভার!—গেছি গেছি—হায় দুর্গা, ও শ্রীহরি!
বেঘোরে প্রাণ গেল মা বাপ্,—বাঁচাও আমায় কৃপা করি
দিচ্ছি কথা মগের দেশে আসব না আর—বেলতলাতে
ডুবার কি সে যায় হায়—নেই কেশের লেশও যার মাথাতে!
জানো কি হে "ক্যাপসাইজিং" কাকে বলে সায়েবেরা!
মোটর মানুষ চড়ে কেন? ইজিচেয়ার সবার সেরা।
থাম্ রে শোফার, একটুও কি নেই রে দয়া তোদের ডেরায়?
নেই ফোরসাইট? কত ফ্যাসাদ আছে জানিস বেগের নেশায়?
এম্‌নি যদি ফাটে টায়ার—থাম্‌বে গাড়ি, আর কিছু না।
বেগের মাথায় ফাট্‌লে রে ভাই, কী হবে—
কেউ জানে কি তা?

তার ওপরে তোমরা শিশু—ভাঙলেও হাড় লাগবে জোড়া।
বৃদ্ধ হ'লে রোগা—সে যে গোদের ওপর বিষের ফোঁড়া।
বেগ্‌বান এই সৃষ্টি ক'রেই হ'ল মানুষ কপাল-পোড়া।
মোটর শোফার হায় হ'ল তাই আমারি শিল আমার নোড়া।
এবারটি ভাই দে ক্ষ্যামা—তোর কানে কথাও যায় না কি রে?
ঝাঁকুনিতে পায়ের রক্ত চিংড়ি সম উঠল শিরে।
এই হাসি! ফের্! জানবে কবে—এম্‌নি ক'রেই ডিগবাজিতে
মরে মানুষ গ্রহের ফেরে বাহাদুরীর কারসাজিতে।
ও—ও—ওঃ—গিছি গিছি—দুগ্‌গা নাম আর কেন জপা?
হাড়গুলো সব ভেস্তে গেল—নই তো মুনি মহাতপা :
"মান্নু" আমার নাম মোটে ভাই, "মানুষ" হওয়ার
একটু বাকি—
সে-চেষ্টায়ো হ'লাম ব্যর্থ—হায় রে, এ-খেদ কোথায় রাখি?
মিথ্যে এলাম হেথায়—গেলাম—প'লাম—ম'লাম—
থাম্‌রে চাষা!
হাসি!—আমি উঠব রেগে—না থামলে অভব্য হাসা!
মণ্টু! তুমি বোঝাও ওকে—বোঝাও অবোধ সারথিকে
ভেবেছ কি তুলব পটল আমিই—থাকবে তোমরা টিঁকে!"

*   *   *   *

কিন্তু দরদীর কাছে সত্যিই এ হাসির কথা নয় স্নেহময়ী! মান্নুদার সেদিনকার মুখ যদি দেখতে তোমার নিশ্চয় স্নেহ হ'ত। মান্নুদা বেচারী প্রকৃতিতে বেজায় সাবধান—তাই বেগের নেশায় যত য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে সেইগুলিই মনে টাঙিয়ে রেখেছে, ভুলে গেছে যে দ্রুতগমনে যত দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের সংখ্যা খুবই কম। মানুষ যে নিশ্বাসটি বেদনায় ফেলে সেটিই মনে রাখলে যে হাজার লক্ষ নিশ্বাস সহজে ফেলে তাদের ভুলে যায়। কাশ্মীরেও তাই ও বহুক্ষেত্রেই উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠত—পাছে বিপাকে পড়ে। যুক্তির দিক দিয়ে একথা অস্বীকার করাও যায় না যে, আস্তে চলায় বিপদ কম, জোরে চলায় বিপদ বেশি। একথাও অপ্রতিবাদ্য—যুক্তির দিক দিয়ে—যে সাবধানের মার নেই। কিন্তু এই জীবনটা বড় বিচিত্র। তার আনন্দের তহবিল প্রায়ই খালি থেকে যায় যদি বিপদকে একেবারে খারিজ ক'রে দেওয়া যায়। এখানে কাল গিয়েছিলাম এক আর-এন-দে নামে অরণ্যরক্ষী (forest officer) উচ্চপদস্থ বন্ধুর বাড়ি। তাঁর স্ত্রী পুষেছিলেন বাঘের বাচ্চা। ব্যাঘ্রশাবকের সঙ্গে তাঁর ছবি দেখলাম। সত্যি কথা বলতে কি, বাঘ পুষতে আমি তেমনি ডরাই, মোটরে ছুটতে মান্নুদা যেমন ডরায়। কিন্তু কল্পনা করতে বাধে না যে—বাঘ পোষায় দে-জায়া বিড়াল পোষার চেয়ে বেশি আনন্দ পেতেন। এই ব্যাঘ্রশিশু তাঁকে কাম্‌ড়েও দিয়েছে দু-একবার—তবু তাকে তিনি অনেক দিন তাঁবে রেখেছিলেন শুধু এই জন্যেই নয় কি যে, বিড়ালকের চেয়ে শার্দ্দূলককে তাঁবেদার রাখায় বেশি আনন্দ?—এই জন্যেই না কবি লিখেছিলেন :

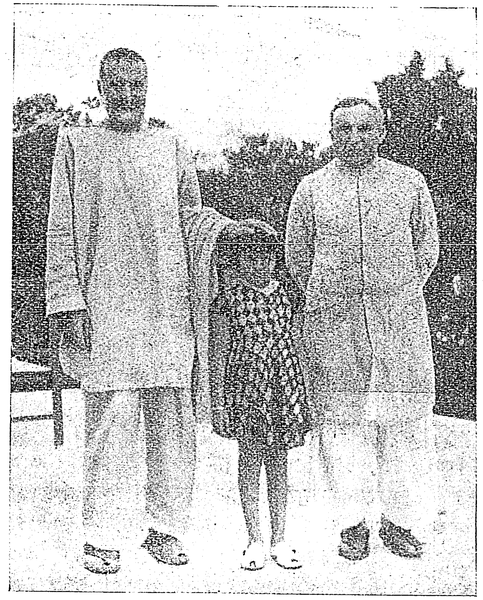

সীমান্ত গান্ধী ও তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ খাঁ সাহেব

জানো না কি বিপদ এবং আমোদেই ঘেঁষাঘেঁষি?
যেখানে ভাই বিপদ অধিক সেইখানেতেই আমোদ বেশি?
মানুষ-ঠেলা গাড়ি ক'রেও যাওয়া যায় না কোনো গতিক?
তবুও তার চেয়ে তেজী ঘোড়শোয়ারেরই আমোদ অধিক।
তাকে দমন করতে পারায়, তাকে নিজের বশে আনায়
(যদিও তা করতে গিয়ে অনেক প্রভুই পড়েন খানায়)
তবু তাতে ফুরতি একটা বিশেষ রকম আছে যেন
বিপদ আছে ব'লেই ফুরতি নইলে লোকে চড়ে কেন?

লাঠির চেয়ে তরোয়ালের খেলাই কেন করতে আসে ?
শশক শিকার চেয়ে কেন বাঘ শিকারই ভালোবাসে ?*

অবশ্য ভালোবাসে যে তার একটা প্রধান কারণ এই যে, বিপদে আছে উত্তেজনা, আর উত্তেজনার মধ্যে আছে যে-উত্তাপ তাকে অনেক সময়েই প্রথমটায় আনন্দ ব'লে ভুল হয়। কারণ এর মধ্যে আমাদের স্নায়বিক চেতনা অনেকখানি খোরাক পায়। সব ক্ষুধাতৃপ্তির মধ্যেই খানিকটা সুখ তো থাকেই।

তাছাড়া এ-যুগে স্নায়বিক আনন্দেরই প্রতিষ্ঠা বেশি। তাই না স্পীডের জয়জয়কার। এ আনন্দ গভীর নয়, কিন্তু ধীর। বেশির ভাগ মানুষ পথচলায় চায় তীব্রতাই বেশি গভীরতার চেয়ে। স্পীডের আনন্দ দেয় এই তীব্রতা। তীব্রতা আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে—মানে, তার প্রসাদে আমরা বেশি ক'রে উপলব্ধি করি যে আমরা বেঁচে আছি।

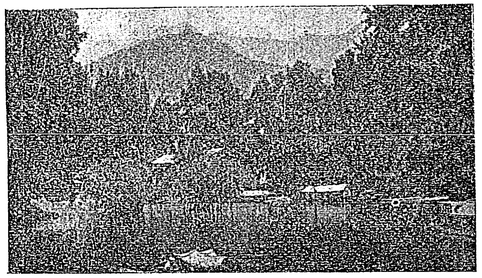

ডালহৃদ ও শঙ্করাচার্যের পাহাড়

কিন্তু গভীরতার মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনার প্রশ্রয় নেই। তারা দেয় শান্তি। সচরাচর লোকে স্বস্তি আর শান্তিকে সমার্থক মনে ক'রে থাকে—ঠিক যেমন করে তামসিকতা ও সাত্ত্বিকতার বেলায়ও। এ ভুলের কারণ এই যে, বাইরে থেকে দেখতে ওদের চেহারা ভারি এক ধরণের। কিন্তু তলিয়ে দেখতে গেলে ধরা পড়ে যে ওদের মধ্যে প্রভেদ আশমান-জমিন। শান্তি হ'ল জীবনের মূলের সঙ্গে প্রাণের মৈত্রী, স্বস্তি হ'ল গতিচক্রের থেকে সাময়িক অব্যাহতি। একটা সদর্থক—positive, আর একটা নঙর্থক—negative. (সাত্ত্বিকতা ও তামসিকতার মূল ভেদও এইখানেই)। মানুষ তার গভীর প্রবৃত্তিতে চায় এই শান্তির রস। শান্তিতে তার প্রতিষ্ঠা। শান্তি বিনা কি সে বাঁচতে পারে ভাই? স্নায়বিক আনন্দ স্নায়বিক ব'লেই সাময়িক—ক্ষণিক অশান্ত। য়ুরোপ আমাদের আজ এই শিক্ষা দিতে চায় যে, ক্ষণসুখ বহুবাঞ্ছিত যদি তা তীব্র হয়। তীব্র বলতে তারা প্রায়ই গভীর বোঝে। কিন্তু তীব্রতা ও গভীরতা সমানধর্মী নয়। গভীরতার চাহিদা অন্তরের কাছে, তাই স্বাদ পেতে দেরি হয়।—তীব্রতা সহজেই আকৃষ্ট করে—কেন না, তার আবেদন প্রাণের চঞ্চলতার কোঠায়। এই জন্যেই গীতায় বলেছে যে গভীর সাত্ত্বিক আনন্দের চাখনদার হওয়া কঠিন—বহু অনুশীলনে তবে এ-রসের রসিক হওয়া যায়, যেখানে রাজসিক আনন্দকে গ্রহণ করতে বেগ পেতে হয় না।

কিন্তু তবু বলব যে, রাজসিক উল্লাস তামসিক তন্দ্রাতুরতার চেয়ে বড়। মানুষ ঝিমিয়ে পড়ে সহজেই—তাই বিপদবরণকে ভালো ব'লেই মানি—এজন্যে নয় যে, তাতে উত্তেজনা আছে; এইজন্যে যে, এতে ক'রে আমরা চেতনার উচ্চতর স্তরে উঠি। তাই মানুদার অজস্র অকাট্য যুক্তি সত্ত্বেও আমি বলব যে যারা নিরাপদে ঝিমোয় তাদের স্বস্তির চেয়ে যারা উধাও পথের পথিক হ'তে চেয়ে আরামের নোঙর কাটতে চায় তারা ঊর্ধ্বতর চেতনার মানুষ। একথা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা শক্ত, কেন না, এধরণের উপলব্ধির প্রেরণা আসে যুক্তিলোক থেকে নয়, তার চেয়ে ঊর্ধ্বতর জগত থেকে। কাজেই এ-ধরণের উপলব্ধি বা নৈশ্চিত্যকে যুক্তিতর্ক দিয়ে সাব্যস্ত করতে গেলে হয়ত নিরাপদপন্থীই জিৎবেন জমা-খরচের ওকালতিতে। কিন্তু জীবনের বিচিত্রতা এ-খানেই যে যারা বেশি চালাক তারাই বেশি হারায় কম দেখে'—যারা এককথায় ধ্রুবকে ছাড়ে অধ্রুবকে পেতে, তারা অধ্রুবকে যদি না-ও পায় তবু না-পাওয়ার মধ্যে দিয়ে এমন কিছু পায়ই যা পায় না তারা যারা সাবধানতার ঘাঁটি আগলে ব'সে রইল। তবে হয়েচে কি, এ ধরণের উপলব্ধিকে প্রমাণ করবার কোনো বাঁধা শড়কট নেই। কেবল একটি কথা বলা চলে যে, যারা সব অগলে খাসা নিরাপদে ব'সে থাকে তারা জীবন থেকে তাদের দীর্ঘজীবী সঞ্চয়ে যতটা জমা করে হারায় তার চেয়ে অনেক বেশি খোয়ায়। রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্মীছাড়ার দলের" সম্বন্ধে স্তবগানে তাই আমি যোগ দেই সর্বান্তঃকরণে—যদিও সঙ্গে সঙ্গে একথা ব'লে রাখতেই হবে যে, জীবনে সবচেয়ে বড় প্রবণতা উত্তেজনার নয়—গভীরতার। তবে কি না, গভীরতার পসারীদের চেয়ে উত্তেজনার খরিদ্দাররা চিরদিনই দলে পুরু হ'য়ে এসেছে—হয়ত থাকবেও বরাবরই। তাই যদি মানুদা বিদ্যুৎগতির উল্লাসকে এদিক দিয়ে নামঞ্জুর করতে চায় তাহ'লে বলতেই হবে সে ভুল বলছে না। ইতি

তোমার মণ্ট দা

* দ্বিজেন্দ্রলালের—"আলেখ্য" পুস্তকে মদ্যপ কবিতা।

সঙ্গীত

কথা, সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীমতী সাহানা দেবী

গান

আমি স্বপনের মালা গাঁথি,
ওরে অসীম যে মোর সাথী।

আমি চলি তারি গান গেয়ে গেয়ে
সে যে চলে মোর তরীখানি বেয়ে
আমি আকাশ-কামনা গাঁথি
ওরে অসীম আমার সাথী।

আমি তপনের সুর সাধি'
বাঁধি অধরারে সুরে বাঁধি
তারি কণক-রশ্মি বানে
চলি চাহি' তার মুখপানে

সে যে চলে কূলে কূলে দুলে দুলে
আমি চলি অকূলের পাল তুলে
আমি আলোক-মন্ত্র গাঁথি
মোর সূর্য্য চন্দ্র সাথী॥

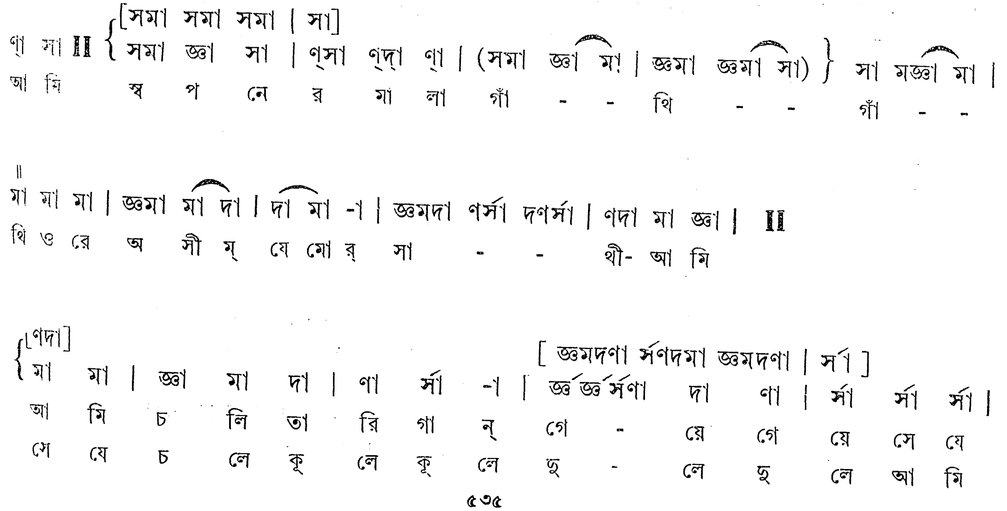

সর্মা র্মা জ্ঞা।
সর্জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞর্সা। র্মা জ্ঞর্মা র্মা। সর্মা জ্ঞর্মা জ্ঞর্মা। জ্ঞর্সা} {র্সা র্সা। সর্মা জ্ঞা র্সা।
চ লে মো র্ ত রী খা নি বে য়ে আ মি আ কা শ
চ লি অ কূ লে র পা ল তু লে চ লি আ লো ক

সর্জ্ঞা জ্ঞা র্সা। ণর্সা ণা দা]
ণর্জ্ঞা র্সা ণা। দর্সা ণা দা। মা} মা মা। মা জ্ঞমদা ণর্সা। ণর্সা ণর্সা -া।
কা ম না গাঁ - - থি ও রে অ সী- ম্ আ মা র
ম ন্ ত্র গাঁ - - থি মো র স্থ - র্ব চ ন্ দ্র

সা মা জ্ঞমা। সা ণ্া সা। II II
সা - থী - আ মি
সা - থী - আ মি

[জ্ঞা মা দা। মা ণা র্সা]
{সা সা। সা মা জ্ঞা। মা সা জ্ঞা। সমা জ্ঞা মা। -া মা মা। জ্ঞা মা মদা। দমা জ্ঞা -া।
আ মি ত প নে র স্থ র সা ধি' - - বাঁ ধি অ ধ রা রে সু র

র্সা দণা -া। া} ণদা ণা। ণা র্সা র্সা। মজ্ঞা দমা র্সণা। ণা দা মা। -া জ্ঞা -া।
বাঁ ধি - তা রি ক ণ ক র - শ্মি বা নে - - চ লি

সদা দা দা। মা জ্ঞমা জ্ঞমা। সমা জ্ঞা মা। -া
চা হি' তা র্ মু খ পা নে - -

এ গানটির সুর মালকোষ, ছন্দপ্রধান, একটু নতুন ধরণের। সঙ্গীতশাস্ত্র মতে হয় তো সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়। মালকোষের জমকালো না টুকরো নানা তানে, অথবা প্রতি ছত্রে কখনো সুরের কখনো ছন্দের নানা বৈচিত্র্যেই এ গানটির রূপ এবং রস ঠিক ফুটবে, নইলে শুধু মূল সুরে নয়। গানের কোনও এক একটি টুকরো নিয়ে সুরের নানা কারুকার্য্য ক'রে তাইতেই আবার ঘুরে ফিরে আসতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল সুরটিতে সে লাইনটি বা কলিটি এক একবার গেয়ে নিতে হবে, তাহ'লেই এই গানে যে-রসটি আনতে চেয়েছি তা ফুটে উঠবে। সব স্বরলিপিতে দেওয়া সম্ভব নয় ব'লে আমি শুধু মূল সুরটির স্বরলিপি দিলাম—বাকি গায়কের রস-সৃষ্টির ক্ষমতার হাতে। তাল—একতাল।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুধীর নাথ মিত্র

গীতিকাব্য

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

নাগরিকা

শ্রীচরণদাস ঘোষ

চৌদ্দ

সন্ধ্যা হইয়াছে। নগরের সুবৃহৎ এক অট্টালিকায় অতিরিক্ত সজ্জিত এক কক্ষে চিত্রা বসিয়া আছে—তাহার অঙ্গ ভরিয়া অলঙ্কার, পরিধানে সুচিক্কণ বিচিত্র-রঙের বস্ত্র। এখন সে নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাগরিকা।

কতক্ষণ বসিয়া তাহা হুঁস নাই, এক সময়ে চিত্রার মুখে হাসির ঈষৎ আভা দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুখ দিয়া অস্ফুট নির্গত হইল—"অসমাপ্ত মানুষ, অসমাপ্ত হাহাকার!"

এমনি সময়ে খাস ভৃত্য কঙ্কন প্রবেশ করিয়া চিত্রার হাতে এক টুক্‌রা কাগজ দিল—কাহার নাম লেখা।

পড়িয়াই চিত্রার মুখখানা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তেই সে-ভাবটা গোপন করিয়া কহিল, "নিয়ে আয়।"

প্রবেশ করিল নন্দন।

চিত্রা ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, লোকজনকে গৃহে তুলিবার—আবাহন ও বরণ করিয়া। হাসিয়াই কহিল, "হঠাৎ?"

"দরকার আছে।"

"খু—উ—ব?"

"নইলে আস্‌বো কেন?"

"হুঁ!" বলিয়া চিত্রা এক চাপা নিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর চকিত হইয়া পার্শ্বের একটি কাষ্ঠাধার হইতে একখণ্ড কাগজ তুলিয়া লইয়া নন্দনকে দেখাইল—তাহাতে লেখা চিত্রার আসন্ন সাক্ষাৎপ্রার্থীদের নাম ও সময়।

নন্দন মূঢ়ের ন্যায় কাগজখানার উপর চোখ বুলাইয়া প্রশ্ন করিল, "তার মানে?"

"এই—এত বিশিষ্ট ভদ্র লোক, শ্রেষ্ঠ নাগরিক, শ্রেষ্ঠী, রাজপুরুষ, সমাজপতি—একের পর একজনকে সময় দেওয়া আছে।"

"আমি তা জান্‌তে আসিনি।"

"বাজে লোক যারা তাদের সঙ্গে কথা কইবার অবসর আমার খুবই কম!"

নন্দন চমকিয়া উঠিল। মুখ খুলিয়া হঠাৎ আর কোনো কথা কহিতে পারিল না। বুঝি-বা তন্মুহূর্ত্তে এই কথাটাই তাহার সারা অন্তর ছাইয়া ছিল—'এই সে! ধরিত্রীর ধারাবাহিক ইতিহাসে ইহাদেরই নাম গৃহলক্ষ্মী!' * * * নন্দন চিত্রার দিকে তাকাইল, দেখিল—তাহার সুন্দর মুখে সেই অতুলনীয় রূপ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেই শাশ্বত শ্রী, যাহা কঙ্কনকে অহর্নিশ তন্ময় করিয়া রাখিত! বাহিরের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে—সবই সেই! তত্রাপি সে—এই? সহসা অবজ্ঞা ও ঘৃণায় তাহার অন্তঃস্থল ভরিয়া উঠিল—ছি, ছি!

নন্দনকে নীরব থাকিতে দেখিয়া চিত্রা পুনশ্চ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "বল্‌বার কিছু থাকে ত' বলুন—সময় কম!"

"কঙ্কন নগরে এসেছে—"

কাহার নাম করিয়া কি কাহিনী নন্দন নিবেদন করিল, তাহা চিত্রা যেন বুঝিতেই পারে নাই, এমনি ভাব দেখাইয়া কহিল, "কার কথা বল্‌ছেন?

"'কঙ্কন' ব'লে কাউকে তুমি চেন?"

অনাসক্ত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ চিত্রা জবাব দিল, "কত লোক আসে যায়! সবার নাম কি মনে রাখা সম্ভব?"

নন্দন মাটির দিকে মুখ নামাইল, তাহার মনে হইল পদতল হইতে যেন বসুমতী সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু হটিয়া পিছাইয়া যাইতে সে আসে নাই, পরক্ষণেই নিজেকে দৃঢ় করিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "আমার কথার সঠিক জবাব দাও—কোনও দিন নিজের সবটা সাজিয়ে দেবপূজার নৈবেদ্যর মতো কাউকে ধ'রে দিয়েছিলে কি-না?"

চিত্রা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইল, যেন এক ভদ্র নারী সদর রাস্তায় হঠাৎ এক দুশ্চরিত্রের মুখ দেখিয়াছে!

নন্দন তেমনি করিয়াই আবার সুরু করিল, "কবে জান? যেদিন সে ছিল গৌতম, আর তুমি ছিলে অহল্যা! দিয়েছিলে—ওই রূপ?"

চিত্রা মুখ ফিরাইল। শ্লেষকণ্ঠে জবাব দিল, "রূপ?

একজনকে দিলে এর দাম ওঠে না, রূপের পূজারী প্রত্যেকের এতে অধিকার আছে!"

পরিষ্কার সরল কথা! এর প্রতিবাদ চলে না। সুতরাং, নন্দন চুপ করিয়াই রহিল। ক্ষণকাল পরে কি মনে করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমাকে চেন, এই তোমার সামনে যে দাঁড়িয়ে—এই আমাকে?"

ঘরময় শত বাতির আলো, সেই আলোকে চিত্রার মুখখানা চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। হঠাৎ অট্ট হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই!"—বলিয়াই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল এবং চোখের পলক পড়িতে-না পড়িতেই একটি সুবর্ণ পাত্র ভরিয়া সুরা আনিয়া নন্দনের সম্মুখে ধরিল।

"ও কি!"—নন্দন খানিকটা পিছাইয়া গেল।

চিত্রার মুখে হাসি আর ধরে না—সেই হাসি! কহিল "তুমি দয়া করে চিনে এসেছ, আর আমি চিন্‌বো না?"

"ও-আবার কি?"

"পরিচয়! সুরাপাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়েছে দেখছ না? আমি নাগরিকা, এ আমার নবজন্ম, এ পথে প্রথম লম্পট—এসেছিলে তুমি!"

নন্দনের মুখখানা ঝুলিয়া পড়িল। অন্তত এ মেয়েটির কাছে এই অভিযোগের বুঝি-বা প্রতিবাদ নই। কিন্তু কি করিয়া সে আজ বুঝাইয়া দিবে—'আমি তা নই!' একটু পরে মুখ তুলিয়া কহিল, "চিত্রা, তুমি এখন আমার—এ কথা একদিন বলেছিলাম, তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমাকে আমিই চেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু কেন—তা বলবার অবসর দাও নি, আজ দেবে?"

চিত্রা আসক্তিহীন চক্ষে নন্দনের পানে একটিবার তাকাইল, তাকাইয়াই অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

নন্দন কিন্তু হাল ছাড়িল না। কহিল, "তুমি আর কঙ্কন! আমি জানতাম—তুমি তার কে! এও জানতাম, ছাড়াছাড়ি তোমাদের হবার নয়! কিন্তু তাই যখন হ'য়ে দাঁড়ালো তখন ভেবেছিলাম কি, শুন্‌বে?"

চিত্রা মুখ ফিরাইয়া বিদ্রূপের কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আত্মহত্যা করবো—এই ত?"

"তাই করে থাকে! কিন্তু, সে কে, জান? পুরুষের মন নিয়ে যে মেয়ের জন্ম হয়!" বলিয়া নন্দন একটু থামিল। পরক্ষণেই আবার সুরু করিল, "বোধহয় এর চেয়ে তা ভাল ছিল। কিন্তু আমার কি মনে হলো, জান? মনে হলো, তাই যদি হয়, সে শোচনীয় মৃত্যু কঙ্কনকেও বাঁচিয়ে রাখ্‌বে না, হোক্ না সে যতই সাক্ষাৎ বুদ্ধদেব!" এক কটাক্ষ করিয়া আবার বলিয়া উঠিল, "তাই সাবিত্রী-সমাজের এক গোপন-অস্ত্র চুরি ক'রে তোমাকে জয় করতে গিয়েছিলাম—স্বামীর আদেশ—ইহলোকে তোমার 'তুমিটি' এখন থেকে আমার!"

চিত্রার মুখের উপর ঘন ঘন রঙ্ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল—রোষের, বিদ্রূপের—ঘৃণা ও অবিশ্বাসের! ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "আর একজন—তার—"

"হ্যাঁ! যার রক্ত মাংসের দেহ অন্তত তোমার কাছে একেবারেই নিষ্প্রাণ!"

চিত্রার চোখে আকস্মিক বিস্ময়ের এক ছোঁয়াচ পড়িল। পড়িতেই নন্দন কহিল, "শুন্‌বে, কেন?—এক জনের আত্মহত্যা বাঁচাতে আর একজনের আত্মহত্যার প্রয়োজন হয়! চিত্রা, যার সুনাম থাকে, মৃত্যু তাকে নিতে পারে না। কিন্তু, আমি লম্পট!"

চিত্রার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। উত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনি চলে যান! বাজে কথা শোনবার অবসর নেই। আমার সময়ের দাম—অনেক!"

এক নির্ম্মল হাসি হাসিয়া নন্দন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "মিথ্যে কথা। সীতা দেবী রামের অনুচরকে তাড়াতে পারেন নি, তুমিও পারবে না।" অতঃপর মুখের ভাব গম্ভীর করিয়া আবার সুরু করিল, "কিন্তু, আমি ভুল ভুল করেছিলাম! আমার মনেই ছিল না—আমি পুরুষ মানুষ, আর তুমি স্ত্রীলোক! এ দুই পক্ষের সব কাজের হিসেব-নিকেশ এক নিয়মে চলে না। সেদিন বুঝিনি চিত্রা—যে নিয়মে আমরা চলি, সে নিয়মে তোমরা চল না! তখন টের পাইনি—বিধাতাপুরুষ তোমাদের জন্যে কোন নির্দ্দিষ্ট আইন, কোন বৈধ নিয়ম, এমন কি বুকের সঠিক অনুভূতি পর্য্যন্ত আমাদের মতো ক'রে তৈরী করতে পারেন নি। এ কথাটা বুঝিছি আজ! মেয়েমানুষ—অমৃত দিয়ে তোমরা পুরুষকে বাঁচাতে পার, আবার বিষ দিয়ে মারতেও তোমাদের বাধে না!"

এমন সময়ে কঙ্কন আসিয়া চিত্রার হাতে একখণ্ড কাগজ দিল। চিত্রা ত্রস্ত হইয়া উঠিল, প্রার্থী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! নন্দনকে কহিল, "আচ্ছা, নমস্কার! আপনি

এখন যেতে পারেন।" তারপর কঙ্কনের দিকে ফিরিয়া নবাগত প্রার্থীকে ভিতরে আনিবার আদেশ দিল।

কঙ্কন চলিয়া গেল। কিন্তু নন্দন উঠিল না। চিত্রা ব্যস্ত হইয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "যান্ আপ্‌নি—"

নন্দনের মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল। কহিল, "আত্মহত্যান সঙ্গে নিয়ে আসিনি, ও নিয়ে ফিরেও যাবো না—"

এমন সময়ে অদূর রাজপথ হইতে এক কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—"

সঙ্গে সঙ্গে নন্দনের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। অস্ফুট আতঙ্কে বলিয়া উঠিল, "ওই শোনো! ও গলা চেন কি? ওই কঙ্কন—"

চিত্রা একটি বার ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়াই তার পর দ্বারদেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে নন্দনকে বলিয়া উঠিল, "আপনি এখনি বেরিয়ে যান!"

কিন্তু নন্দন এতটুকুও বিচলিত হইল না। কহিল, "এক কথায় তা কি পারি?" অতঃপর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল, "চিত্রা! সে আজ আর দশজনের একজন নয়—ভিক্ষু!—নিঃসম্বল এক ভিক্ষু! তার মাথায় হাজার লাঠি পড়্‌বে!"

চিত্রা আবার অপর দিকে মুখ ফিরাইল।

নন্দন তথাপি দমিল না। ঘুরিয়া গিয়া চিত্রার চোখের উপর চোখ ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "এক কাজ করতে পার?—মা-দুর্গার মত তার পাশে গিয়ে দাঁড়াও না!"

চিত্রার মুখে এক নির্ম্মম হাসির আলো দেখা দিল। শ্লেষকণ্ঠে কহিল, "আমি?"

"হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ! এই মুহূর্ত্তের এই তুমি! নগরের শ্রেষ্ঠ নাগরিকা—অপরূপ রূপবতী শ্রীমতী চিত্রা! যার হাতে—এ অঞ্চলের ধর্ম্ম, সমাজ, সমাজপতি!"

চিত্রার মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, যেন তার বুকের ভিতরটা মুচড়িয়া উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সহজ মাত্রায় দাঁড় করাইয়া নন্দনকে ঘা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আর ভিক্ষুর হাতে—'পরমার্থ'!" বলিয়াই উঠিয়া গিয়া কক্ষের এক কোণে এটি-উটি সরাইয়া-নামাইয়া, নামাইয়া-সরাইয়া মানানসই করিতে লাগিল, যেন বা এই বিশেষ কাজটা হঠাৎ তার মনে পড়িয়াছে!

নন্দনও বিভ্রান্তের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্থিরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সময় নেই, চিত্রা!"

চিত্রা ফিরিয়া দাঁড়াইল, যাহার দিকে চোখ ফিরায় সেই যেন এক অচেনা লোক? কহিল, "আমাকে ডাক্‌ছেন?"

এক আকস্মিক ক্রোধে নন্দনের চোখ দুটা জ্বলিয়া উঠিল। বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না! তোমাকে যারা ডাকে তারা মাতাল!" বলিয়াই দৃঢ়পদক্ষেপে ঘর কাঁপাইয়া যেমন বাহির হইয়া যাইবে, থম্‌কিয়া দাঁড়াইল—সমাজপতি?

কেহ যে ভিতরে আছে 'সমাজপতি' তাহা টের পান নাই; ভৃত্য চঞ্চলের মুখে ভিতরে প্রবেশের অবাধ আমন্ত্রণ পাইয়াছেন যে! নন্দনকে দেখিয়াই তাঁহার মুখখানা কালি হইয়া গেল।

আর নন্দন? বাঘের মুখে শিকার পড়িবার মত তার চোখ দুটা অস্বাভাবিক বড় হইয়া ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল! ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া অট্ট হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "স্বাগতং! শিবের ঘরে শিব!"

সমাজপতির পা দুটা তখন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তথাপি সময়োচিত সামর্থ্যে কোনও রূপে নিজেকে খাড়া রাখিয়া বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই নন্দন বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই কি হয়!"

সমাজপতি থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। সভয়ে নন্দনের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি গীতার ব্যাখ্যা শুন্‌তে এসেছিলাম।"

"ব্যাখ্যা করতে আমিও প্রস্তুত।" বলিয়াই নন্দন অপর হাতে চিত্রার পরিত্যক্ত সেই সুরা পাত্রটা উঠাইয়া লইয়া চিত্রার প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিল, "এইবার এই জিনিষ কাজে লাগ্‌বে।" বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া পাত্রটা সমাজপতির মুখের গোড়ায় ধরিল।

ব্যাপারটা যে কতদূর গুরুতর তাহা সমাজপতি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ছেড়ে দাও! আমি তোমার দাবী শুনতে রাজি!"

"হুঁ! সমাজপতি—পারের মাঝি!" বলিয়া নন্দন কি-যেন বিশেষ চিন্তা করিতে-করিতে সুরা পাত্রটা নামাইয়া রাখিল—তারপর হঠাৎ চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তা পারি! কিন্তু—"

সমাজপতি প্রবল আগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "বল বাবা, বল—"

"একটা বিধেন!" বলিয়াই নন্দন ইতস্তত চাহিয়া কক্ষের এক কোণ হইতে একখণ্ড কাগজ ও কালি-কলম আনিয়া সমাজপতির সম্মুখে রাখিল, রাখিয়া কহিল, "লিখুন, স্বীকার করছি—বড় ভিক্ষুরই ধর্ম্ম!"

সমাজপতির মুখখানা আবার ছাই হইয়া গেল। নিষ্ফল আক্রোশে তিনি মুহূর্ত্তকাল ফুলিয়া উঠিয়াই এতটুকু হইয়া গেলেন। অতঃপর অসহায়ের ন্যায় নন্দনের দিকে তাকাইতেই নন্দন গম্ভীরভাবে কহিল, "লিখে যান—কারণ, ভিক্ষুর ধর্ম্মে উন্নত হয়েছে কঙ্কন, আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে পতিত আমার ন্যায় নারকী!"

তর্ক করা বৃথা। সমাজপতি নির্দ্দেশমত লিখিয়া দিয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেলেন; যেন এক নর-ঘাতক তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া রক্ত দেখিয়া তাঁহাকে নিস্তেজ করিয়া গোপনে রাস্তায় নামিয়া গিয়াছে।

নন্দনও আর অপেক্ষা করিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল—তখন এক অপ্রত্যাশিত জয়ের আলোকে তাহার সারা মুখ আলোকিত! আকস্মিক এক-ঝোঁকের মাথায় চিত্রার দিকে সরিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "স্বামী তার গর্ব্ব—এতে যদি স্ত্রীর গর্ব্ব হয়, তা হলে অহঙ্কার—সে তোমারই!"

বলিয়াই নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

পনের

নির্দ্দেশমত কঙ্কন পরদিন প্রভাতেই নগরে প্রবেশ করিয়াছিল। যাত্রাকালীন ত্রিবর্ণ করিলেন আশীর্ব্বাদ, মঠবাসী দিল বিদায়। একে-একে সকলেরই কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া যখন সে কৌমুদীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কৌমুদী মুখ ফিরাইয়া ত্রিবর্ণকে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "আমিও যাবো, বাবা?"

সকলেরই বিস্মিতচক্ষু কৌমুদীর উপর পড়িল। কিন্তু ত্রিবর্ণের চোখে এক অপরিমেয় স্নেহ আর পরিপূর্ণ কৌতুক! স্মিতমুখে কহিলেন, "কঙ্কনের গৌরব—এ ভাগাভাগী হবার নয়, মা!"

কৌমুদীর মুখটি একটিবার অবনত হইল। পরক্ষণেই আবার মুখ তুলিয়া কহিল, "কিন্তু সবায়ের সঙ্গে সবাই ত যায়! আমিও গেছি অনেকের সঙ্গে—"

"সবায়ের সঙ্গে তুলনা করে কঙ্কনকে এখানে আনি নি মা! বলেছি ত সেদিন, ভূমিষ্ঠ হয়েই ও দাঁড়াতে শিখেছে!"

"আহত হ'লে—"

"শুশ্রূষা? সেবা?—ও সবের প্রয়োজন ভিক্ষুর খুবই কম, একথা তুমিও জান!" কথাগুলি ত্রিবর্ণ স্নেহকণ্ঠে বলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। একটু পরেই আবার কহিলেন, "তবুও কেন ও-কথা বল্‌ছ, তা আমিও জানি! ধরিত্রী—এর একই বুকে শ্মশানও জ্বলে, আবার স্নানও ভূমিষ্ঠ হয়!"

কৌমুদীর মুখটি ঝুলিয়া পড়িল—লজ্জায়।

কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই ত্রিবর্ণের। পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "প্রয়োজন যখন সত্যিই হবে, তখন কেউ তোমাকে ধরে রাখ্‌তে পারবে না। কিন্তু সে-বার্ত্তা এখনো তোমার কাছে পৌছয় নি!" বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

বিদায় মিলিয়াছে। কঙ্কনও আর অপেক্ষা করিল না।

* * * *

আকস্মিক হইলেও নিমেষেই কঙ্কনের অভিযান-বার্ত্তা নগরময় ছড়াইয়া পড়িল। রাজপথে পদার্পণ করিতেই উন্মত্ত নাগরিক দলে-দলে আসিয়া কঙ্কনের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—প্রত্যেকের হাতে লাঠি! সহস্র রক্তচক্ষু—তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া কঙ্কন, এক স্থির চন্দ্রালোক!

কঙ্কন হাসিয়া কহিল, "আমাকে মারবে? কিন্তু আমি যদি মার না খাই!"

জনতার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সচল হইয়া উঠিল। প্রত্যেকের মুখে-চোখে যেন এক অপ্রতিহত মোহের স্পর্শ। কঙ্কনের পরিচিত মুখ, সৌম্য মূর্ত্তি, সুগৌর অবয়ব, সবচেয়ে তার নির্ভীক অথচ নির্বিষ কথাবার্ত্তা সকলকেই যেন বিহ্বল করিয়া তুলিল—ওই সেই সর্ব্বত্যাগী! কাহারো মুখে শব্দ নাই, যেন ওই পরামাশ্চর্য্য 'বিদ্রোহীর' মুখের এক দুর্লঙ্ঘ্য 'শাসন' সকলকেই বলিয়াছে—'চুপ্!'

একমুখ হাসি। কঙ্কন পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "কে-ন? আমি যে তোমাদের ভালবাসি!"

দলের যে অগ্রণী তাহার ঠোঁট দু'টা একবার নড়িয়াই থামিয়া গেল, যেন কিছু বলিতে চায়, পারিতেছে না!

কঙ্কনের দৃষ্টি তাহা এড়াইল না। তৎক্ষণাৎ আবার কহিল, "এক রক্তে জন্ম আমাদের!"

লোকটির মুখ দিয়া এইবার কথা বাহির হইল। কণ্ঠে ঈষৎ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, "না। বিধর্ম্মী তুমি শত্রু!"

"তা হ'লে আমারও হাতে লাঠি থাকতো—"

"তুমি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেছ!"

এই প্রশ্নের জবাব দিতেই বুঝি-বা কঙ্কনের ধরাতলে আবির্ভাব। মৃদুকণ্ঠে কহিল, "সে কি, আমি করেছি ভাই—না, তোমরা?"

মুহূর্ত্তেই সমগ্র জনতা ঝড় তুলিল—"আমরা?"

"হ্যাঁ! মানুষের ধর্ম্ম মানুষের গলা জড়িয়ে ধরা! কিন্তু তোমরা আমাকে মারতে এসেছ—এ-নির্দ্দেশ ত ধর্ম্মে নেই!" বলিয়াই কঙ্কন এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "মানুষ! ইহলোকের ওপর তার যা প্রথম কর্ত্তব্য, তাই তার ধর্ম্ম। ভূমিষ্ঠ হ'য়েই সে মায়ের কোলে ওঠে, তারপরই মায়ের গলা ধরে, দু' হাতে জড়িয়ে! 'মা' মানে—মাটি, এই ইহলোক—পৃথিবীর সবাই!"

অপর পক্ষের লোকটিও প্রস্তুত হইয়াছিল। অবিলম্বেই সে প্রতিজবাব দিল, "ঋষির শাস্ত্র তা বলে না!"

কঙ্কন সহাস্যে জবাব দিল, "হ্যাঁ ভাই, ঋষির শাস্ত্রও তাই বলে। তোমরা তা জান, কিন্তু মান না। ধর্ম্ম মনে ক'রে যা নিয়ে তোমরা এখন রয়েছ, আসলে ওটা ধর্ম্মই নয়—ধর্ম্মের বিকার মাত্র!"

সকলেই চমকিয়া উঠিল। কঙ্কনের কথা তখনও শেষ হয় নাই, কহিল, "কলঙ্ক! ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক—একেই একেই দূর করতে 'ভিক্ষু'র আবির্ভাব! আসলে 'ভিক্ষু'ও হিন্দু!"

কঙ্কনের মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না। প্রতিপক্ষের একে-একে সকলেই দেখিতে পাইল, যেন তাহার চোখ দিয়া এক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। একটু পরেই সে আবার সুরু করিল, "এই পৃথিবী—বিধাতার হাতে-গড়া এ উপবন! গাছপালা ভেঙে পথ করে চল্‌বার আমাদের অধিকার নেই! ধীর সন্তর্পণে পল্লব সরিয়ে প্রত্যেক পাতাটির ওপর মমতা রেখে আমাদের চল্‌তে হবে। হিন্দুধর্ম্ম—এই পথ-চলারই সঙ্কেত! এই সঙ্কেত তোমাদের হাতে পণ্ড হয়েছে!"

এক অশ্রুতপূর্ব্ব কাহিনী! প্রতিপক্ষের মুখের ভাব দেখিয়া প্রতীয়মান হইল যেন তাহারা প্রবল বিস্ময়ে ও সংশয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ, স্বর্গীয় আত্মীয়স্বজন যে-ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হইয়া দেব-নিবাসে সিংহাসন পাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের অচল বিশ্বাস, উহাই কি আজ এই লোকটার মুখের এক খোঁচায় টলিয়া হইবে? মুহূর্ত্তেই সমাজপতির রক্তচক্ষু তাহাদের চোখে দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত হইল এবং ত্রস্ত হইয়া তাহাদের একজন বলিয়া উঠিল, "তা হলে কি বল্‌তে চাও—আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ সবাই গেছেন নরকে?"

কঙ্কন মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, "আগেকার কথা আমি তুলিনি বন্ধু। আমি তুল্‌ছি, আজকের কথা! চেয়ে দেখো—আমরা এসেছি কি নিয়ে, আর তোমরা এসেছ কি দিতে! একদল—আনন্দময় নবজীবন, আর একদল—নিষ্ঠুর মৃত্যু!"

অপরপক্ষ নীরব হইয়া রহিল, যেন কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল পরেই অগ্রণী প্রশ্ন করিল, "তোমরাও তা হ'লে হিন্দু!"

একমুখ হাসিয়া কঙ্কন জবাব দিল, "নিশ্চয়ই। পৃথিবীতে ধর্ম্ম—এক আর এক, দুই নয়! তবে যা মলিন হয়ে পড়েছে তাকে নির্ম্মল করা চাই!"

"তার মানে?"

"তোমাদের ধর্ম্ম, তার যা নির্দ্দেশ বর্ত্তমানে, তা তোমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য—তাই তোমরা একে বিকৃত ক'রে তুলেছ অহঙ্কারকে আদর্শ করে! কিন্তু ভিক্ষুর ধর্ম্ম সহজ সরল সুস্পষ্ট!"

অগ্রণী সম্মোহিতের ন্যায় প্রশ্ন করিল, "বুঝিয়ে বলো!" বলিয়াই সে মাটিতে বসিয়া পড়িল, আর-আর সকলেও বসিল। হাতের লাঠি ও তাদের মুঠি খুলিয়া পড়িয়া গেল।

এক বিরাট জনতা! সকলেই স্তব্ধ, সকলেই অলস, সকলেই তন্ময়, অথচ সকলেই সজীব। উহাদেরই সম্মুখে—দাঁড়াইয়া কঙ্কন—একাকী?

কঙ্কন কহিল, "ভিক্ষুর ধর্ম্ম—'আমি' আর 'তুমি' আলাদা নয়—পৃথিবীর সকল লোকের ভেতর 'তুমি' আর 'আমি' সবাই মিলে মিশে 'মানুষ'—একটি!"

একজন তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে—ছেলেপিলে নিয়েও সপরিবারে ভিক্ষু হ'তে পারি—এও তবে হ'তে পারে ?"

কঙ্কনের মুখে তখনো হাসি মিলায় নাই। কহিল, "স্ত্রীপুত্র পরিবার কি তুমিআমি ছাড়া, ভাই ?"

আর একজন কি বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না, এইবার যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, "ঘরে যুবতী বউ থাক্‌লেও ?"

কঙ্কন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "যার বউ নেই, সে অসম্পূর্ণ মানুষ! বেশী ক'রে মানুষকে 'ভিক্ষু' করে ওঁরাই —সংসারে থেকেই !"

এমন সময়ে অদূরে যুক্তকণ্ঠের আওয়াজ উঠিল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" এবং দেখিতে-দেখিতে একদল নাগরিক ভিড় ঠেলিয়া কঙ্কনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহাদের মুখে-চোখে, সর্ব্বাঙ্গেই যেন এক নবজীবনের ঝড়!

আকস্মিক দৃশ্য! ও-পক্ষের সকলেই চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর অগ্রণী ইহাদের প্রত্যেকেরই মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া সংশয়ে ও বিস্ময়ে কহিল, "তোমরা—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই নব-দলের একজন প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "মানুষ, মানুষের পশু বৃত্তি ছেড়ে—ভিক্ষু!"

অগ্রণী চোখ মুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "ভি—ক্ষু ?"

"সাক্ষী—সমাজপতি!"

অগ্রণীর চোখ মুখ স্থির হইয়া গেল, যেন আকাশের এক ঝলক্ বিদ্যুৎ তার দেহের চেতনা স্তব্ধ করিয়া চকিতে মিলাইয়া গেল!

বুঝিতে পারিয়া নব দলের একজন হর্ষোজ্জ্বল মুখে কহিল, "না হ'লে, কি পারি ?"

বলিয়া রাখি, ইহারাই সেদিন কঙ্কনের গৃহ হইতে দল ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল, বুঝি বা অবিচল এই সঙ্কল্প লইয়াই!

প্রতিপক্ষরা পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতেই নব-দলের একজন অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরাও বল—সঙ্ঘং শরণং—"

অগ্রণী ত্রস্ত হইয়া হাত তুলিয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও! আর একটু অপেক্ষা করো! সমাজপতি ?—সমাজপতির মুখের একটা কথা, একটা বাণী—তারপর!" বলিয়াই বিভ্রান্তের ন্যায় সদলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

* * * *

পথে আর বাধা নাই। কঙ্কন আবার পথ ধরিল—সম্মুখে সে, পশ্চাতে তাহার নব-দল। অতঃপর নগরের নাট্যশালার যে দৃশ্য উন্মোচন হইল, তাহা অভূতপূর্ব্ব। যতই উহারা অগ্রসর হয়, ততই দলে দলে লোক যোগাইয়া পড়ে—মেয়ে, পুরুষ! কেহ কাহারো অনুমতি গ্রহণ করে না, কেহ কাহাকে প্রশ্নও করে না। বর্ত্তমান এই মুহূর্ত্ত—এ-সময়ে প্রত্যেকের যাহা করণীয়, যেন তাহাই সে করিতেছে—আত্মদান, ভিক্ষুর ব্রতে, ধর্ম্মে, জীবনে! দেখিতে দেখিতে সমগ্র নগরের যেন এক অভিনব, অপরূপ, অ-কল্পিত মূর্ত্তি ফিরিয়া গেল। ইহার যে সমস্ত অধিবাসী—তাহাদের কাহারো প্রাণ-প্রতিষ্ঠা যেন এতদিন হয় নাই, হইয়াছে আজ! প্রকৃতিপুঞ্জ—তাহাদের অভিষেক যেন এতকাল করিয়া হয় নাই, হইয়াছে—এইমাত্র!

বিরাট বাহিনী। দুই-একটি মোড় ফিরিয়া আর একটি প্রশস্ত রাস্তা—সেই রাস্তায় পড়িয়া উহারা এক বাঁকের মুখে আসিতেই, পার্শ্বের এক বৃহৎ অট্টালিকার বারান্দায় একটি নারীমূর্ত্তি দেখা দিল এবং তৎক্ষণাৎ সে দ্রুতবেগে নীচে নামিয়া আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া কঙ্কনের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে হাসি, চোখে কৌতুক! কহিল, "আমি! চিন্‌তে পারেন আমাকে ?"

সঙ্গে-সঙ্গে জবাবটা দিল বাহিনীর যুক্তকণ্ঠ—"নাগরিকা!"

কঙ্কনের নির্ব্বিকার মুখখানা নাগরিকার দিকে নামাইতেই নাগরিকা বাহিনীর জবাবটা সমর্থন করিল, "তাই!" বলিয়াই কঙ্কনকে কহিল, "একটা কথা আছে, শুন্‌বেন ?"

"বলো।"

"আড়ালে! ঠাকুর-দেবতার কাছে নিবেদন কি-না!"

কঙ্কনের মুখে এইবার ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। কহিল, "আমি মানুষ—দশের একজন, দেশের সন্তান!" বলিয়াই বাহিনীকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিয়া নাগরিকাকে কহিল, "কোথায় যাবে, চলো।"

রাস্তা, তাহারই অপর পার্শ্বে একটি বড় গাছ—সেইখানে গিয়া উভয়ে দাঁড়াইল, মুখোমুখী হইয়া। একটু পরেই নাগরিকা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল; হাসিয়াই কহিল, "এ রাস্তার ধার, এখানে আপনাকে নিয়ে দাঁড়ালে এখ্‌খুনি লোকে লোকারণ্য হবে! চলুন ওই ঝোপটার ভেতর—ওই যে বাগান, ওরই ঠিক ও-পারে।" বলিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইল।

দেহকে বাদ দিয়া আত্মাকে লইয়াই যাহার কারবার, তাহার নিকট স্থান বা পাত্র-পাত্রীর বিশেষ কোন অর্থ থাকে না! সুতরাং কঙ্কনও কোন আপত্তি করিল না। উভয়ে সেই ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিয়া একখানি প্রস্তর-খণ্ডের উপর উপবেশন করিল—পাশাপাশি।

উভয়েই চুপ্‌চাপ। কাহারো মুখে কথা নাই, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া। তারপর এক সময়ে নাগরিকা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। অকারণ এক হাসি, চাপিতে হইবে—তাই বুঝি-বা তাহা চাপিতে-চাপিতে নাগরিকা শ্যামকা বলিয়া উঠিল, "চিত্রা আর কঙ্কন—কঙ্কন আর চিত্রা! কোথায় তারা আজ ?"

"এই যাও, মৃত পুরাতনের বিস্ময় মুগ্ধ আকস্মিক নমস্কার!" কঙ্কন মুখখানা ঈষৎ নত করিয়া কহিল, "কি কথা বল্‌বে, বল্‌লে না ?"

"আপনি ভিক্ষু—আপনার ধর্ম্ম কি ? এককথায় বলুন!"

"ভালবাসা।"

হাসিতে কেহ বলে নাই। তথাপি একমুখ হাসিয়া নাগরিকা বলিয়া উঠিল, "জানি গো, জানি! নইলে তোমার জন্য ঘর ছেড়ে আমি বেরিয়ে পড়ি ?" এক বিলোল কটাক্ষ করিয়াই সে আবার সুরু করিল, "জানি তোমার বুক আর কুবেরের ভাণ্ডার—দুই-ই সমান! নইলে অত লোক—ওরা কি পোষ মান্‌তো তোমার ? কিন্তু—" হঠাৎ মুখের ভাব কঠিন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বল্‌তে পার, ওই বুক আর ওই ভালোবাসা—ওই দুটোর মালিক কে ? তুমি, না আর কেউ ?"

কঙ্কন চুপ করিয়া রহিল, বুঝি-বা মঠের অধ্যক্ষ এ-প্রশ্নের উত্তর তাহাকে শিখাইয়া দেন নাই।

কিন্তু এই দুর্দ্দান্ত মেয়েটি ছাড়িবার পাত্রী নহে। এদিক-ওদিক একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই আবার গলা চাপিয়া কহিল, "একদিন! তুমি আর সে, সে আর তুমি—এক-দুই, দুই-এক—মাত্র একটি মানুষ ছিলে! এ ছাড়া, এই এত বড় পৃথিবীর ভেতর আর কেউ ছিল কি ?"

একজোড়া অবশ চোখ—সেই চোখ দুটি তুলিয়া কঙ্কন নাগরিকার দিকে তাকাইল। তাকাইতেই নাগরিকা আবার বলিয়া উঠিল, "কঙ্কন আর চিত্রা কোথায় তারা আজ ?"

কঙ্কন তাড়াতাড়ি মুখ নামাইতেই নাগরিকা শাসন-কঠিন কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তা হয় না, ভিক্ষু ? তোমার মুখ চেয়ে আজ লক্ষ লোক—আমি একা নই! উত্তর দাও—ছিল কি তাদের মধ্যে আর কেউ ?"

সম্মোহিতের ন্যায় কঙ্কন জবাব দিল, "না!"

নাগরিকা আবার সুরু করিল, "ঠিক সেইদিন—সেইদিন প্রয়োজন হ'য়েছিল, কাকে—কার ? তোমাকে তার, না, তাকে তোমার ?"

"যদি বলি—"

"থেমো না!"

"যদি বলি—আমাকেই তার!"

নাগরিকা এক মর্ম্মভেদী হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তাহ'লে জেনে রাখ্‌বো—পৃথিবীর ছোট-বড় সমস্ত কলঙ্ক একদিন এক জায়গায় জড় হ'য়ে একটা মূর্ত্তি নিয়েছিল, সেই মূর্ত্তি—চিত্রার!"

কঙ্কনের মুখখানা কাঁপিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কহিল, "না। তাকেই—আমার!"

নাগরিকা নির্নিমেষনেত্রে কঙ্কনের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "কেন ?"

কঙ্কন চুপ করিয়া রহিল, যেন প্রশ্নটা সে বুঝিতে পারে নাই, যেন বা উহার অর্থ ভিক্ষুর অভিধানে নাই।

নাগরিকা মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল। ক্ষণপরেই আবার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "এ কথার জবাব দিতে তুমি পার না, ভিক্ষু! কেন পার না—তাও আমি জানি!"

চিত্রা থামিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তকাল। তারপর হঠাৎ শ্লেষ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভিক্ষু, ঠকিয়ে ধার্ম্মিক হওয়া চলে, কিন্তু প্রেমিক হওয়া চলে না! 'ভালবাসা', ওই-ধর্ম্ম—ও তোমার নয়!" বলিয়াই উঠিয়া পড়িয়া বাহির হইয়া আলেয়ার ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

পশ্চাৎ হইতে পিঠের উপর হঠাৎ চাবুক পড়িলে মানুষ যেমন করিয়া উঠে তেম্‌নি করিয়াই কঙ্কন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তৎক্ষণাৎ সম্মুখের দিকে ঝোঁক দিয়া যেমন পা বাড়াইবে, পা উঠিল না, যেন পিছন হইতে টান পড়িয়াছে। কঙ্কন চমকিয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিল, দেখিল—যেন এক অতি-পরিচিত নারীমূর্ত্তি দুটি হাত জড় করিয়া একটিবার মাথা নোয়াইয়াই সরিয়া গেল, তার মুখে মিনতি, চোখে জল, সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া স্তব-স্তুতি! অনুমানে নহে, কঙ্কন স্পষ্ট করিয়াই বুঝিল, ও মূর্ত্তি—চিত্রার! * * * ওদিকে সে আর মুখ রাখিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি যেমন মুখ ফিরাইবে, দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া—কৌমুদী!

(ক্রমশ)

নববর্ষা

শ্রীসুনীলবরণ রায়চৌধুরী

পুঞ্জীত মেঘে আঁধার আজিকে বরষা-প্রভাত বেলা।
দূরে বনশিরে চমকে বিজলী—যেন সে আলোর মেলা॥
উতলা বাতাসে শিরীষের সাড়ি,
উঠে পড়ে আর খেতেছে আছাড়ি;
দূর বেনুবনে সুরু হোল ওই কোন উন্মাদ খেলা।
পুঞ্জীত মেঘে আঁধার আজিকে বরষা প্রভাত বেলা॥

কালো দিঘীজলে তীরের তরুর ছায়া কেঁপে কেঁপে মরে,
গাঁয়ের বধূরা ওপার হইতে শূন্য কলস ভরে,
আকাশের পানে চাহে বারবার;
দূর পথে ফেরা যাবে না'ক আর,
সকাল বেলার বাসী কাজগুলো তাড়াতাড়ি সবে করে,
কালো দিঘী জলে তীরের তরুর ছায়া কেঁপে কেঁপে মরে।

দিগন্তরেরে আড়াল করিয়া সঘন বরষা ধারা;
শিঞ্জিনী তালে পুলকিত-চিত এল রে পাগল পারা,
এল পল্লীর ঘন বনতলে,
ঝরাল নিঝর কালো দিঘী জলে,
জল টগরের তনুলতা খালি জলতলে হোল হারা,
দিগন্তরের ওপার হইতে এল রে বরষা ধারা।

"দে জল" "দে জল"—চাতক যুগল উড়ে গেল কত দূরে,
বাতাসে সে ধ্বনি কেবলি যে শুনি গুমরে করুণ সুরে।
সিক্ত মাধবী কুঞ্জের ফাঁকে,
ক্লান্ত শালিক থেকে থেকে ডাকে,
ভিজা বায়ু পশে ঘরের দুয়ারে—যুঁইফুলবাস মাখা।
"দে জল" "দে জল" চাতক যুগল ছড়ায় আকাশে পাখা।

এমনি বরষা এসেছিল বুঝি দূর সে অতীত বরষে;
নীপের পরাগ বহিয়া পবনে দুকূল বাহিয়া হরষে।
বুঝি কালিদাস আপনারে হারা,
মেঘদূত তার কোরেছিল সারা,
মেঘমল্লার ছন্দে গাঁথিয়া প্রাণের অমিয় পরশে,
এমনি বরষা ছিল বুঝি সেই সুদূর অতীত বরষে!

বেহুলার ব্যথা বাজিতেছে বুকে। ডেকে গেল কোন্ সুদূরে,
কলার ভেলায় ভাসে কি সে আজও সাথে লয়ে প্রাণবঁধুরে?
নব বরষার জলে ভরা নদী,
সেই গান আজো গাহে নিরবধি,
তারই সে মেদুর মধুর রাগিণী ঝর ধারে বাজে দুকূলে।
বেহুলার ব্যথা আজো বাজে বুকে—ডাকে যবে কেরা সুদূরে।

ডাহুক ডাহুকী ডাকিয়া মরিছে বেতসের বন আড়ালে,
চখা চখী দল কাঁদিয়া বিহ্বল—কেহ কারে বুঝি হারালে!
ভিজে শালিকের ছায়া পড়ে জলে,
গাঙ্ বেয়ে নেয়ে গান গেয়ে চলে,
জলধারা সাথে কেতকীর রেণু পথে পথে কেগো ছড়ালে?
ডাহুক ডাহুকী কেঁদে মরে আজ বেতসের বন আড়ালে।

যাদুবিদ্যা ও বাঙালী

যাদুকর পি-সি-সরকার

একদা ভারতের স্বর্ণযুগে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক এমন বিদ্যা ছিল না, যাহা নিষ্ঠাসহকারে অধীত না হইত। সে ছিল ভারতের জাগরণ যুগ! তারপর পতন যুগের এক অশুভ মুহূর্ত্তে ভারতের সেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার স্রোতে ভাঁটা পড়িল। বস্তুর বিজ্ঞান অতলে ডুবিল, সংগোপনের প্রয়াস সেখানে পাইল প্রাধান্য। ফলে জ্ঞানচর্চ্চা লোপ পাইল, সকলে পাশ্চাত্য শিক্ষার বাহ্যিক চাকচিক্যে তখন অন্ধ ও মুগ্ধ। সমাহিত হইয়া এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিলে ব্যথা ও বেদনায় বুক হাহাকার করিয়া ওঠে। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞানগবেষণামন্দিরের দ্বারে মাথা ঠুকিয়া যখন আত্মসম্বিৎহারা এই জাতিই আবার জাগিবে, তখন সে বুঝিবে তাহাদের কি ছিল এবং আলোচনার অভাবে তাহারা আজ কি অমূল্য সম্পদহারা হইয়াছে।

যে বিদ্যাদ্বারা একব্যক্তি অপরকে মোহিত বা বশীভূত করিয়া ফেলিতে পারে বা চক্ষুর সম্মুখে নানারূপ অদ্ভুত, চমকপ্রদ বা লোমহর্ষণ ক্রিয়া দেখাইতে পারে তাহাকেই যাদুবিদ্যা বলা হয়। যাদুকরগণ সাধারণের চক্ষে ধূলা দিয়া যে সকল কৌতূহলোদ্দীপক ও বিস্ময়কর রহস্যের সৃষ্টি করিয়া তোলে তাহা সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা বা সাধারণ দৃষ্টি দিয়া উদ্ঘাটন করা সহজসাধ্য নহে। যাদুবিদ্যার চমকপ্রদ ও লোমহর্ষণ ক্রিয়াদর্শনে কেবল বিস্ময়াবিষ্টই হইতে হয়। বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতগণকেও সময় সময় ইহার ভেল্কীতে পড়িয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছে। সেইজন্য যুগে যুগে সর্ব্বদেশেই যাদুবিদ্যা প্রভূত সমাদর ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিয়াছে। যাদুবিদ্যার রোমাঞ্চকর অভিনয় দেখিলে ইংরেজী প্রবাদ—"Facts are sometimes stranger than fiction," অর্থাৎ—"সময়ে বাস্তব ঘটনা উপন্যাস অপেক্ষাও চমকপ্রদ হয়"—কথাটাই বার বার মনে আসে।

ভারতবর্ষকে যাদুবিদ্যার দেশ বলা হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এদেশে যাদুবিদ্যার যথেষ্ট সম্মান পরিলক্ষিত হইয়াছে। ভারতীয় যাদুবিদ্যার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা আধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বলিত (spiritual) এবং অনেক অনেক যৌগিক প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতে আবিষ্কৃত সম্মোহনবিদ্যাও এই যাদুবিদ্যারই একটি অংশবিশেষ। বর্ত্তমানকালে বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের হিপ্নোটিজ্‌ম্ ও মেসমেরিজ্‌ম্ বিদ্যা অতিশয় আধুনিক। সম্মোহনবিদ্যা অধিকতর উচ্চাঙ্গের বিদ্যা।*

যাদু ও সম্মোহনবিদ্যা এতদ্দেশে অতিশয় প্রাচীন। ইহা তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত অনিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধির মধ্যে 'বশিত্ব' সিদ্ধির পর্য্যায়ভুক্ত। তন্ত্রশাস্ত্রের মারণ, উচাটন প্রভৃতির মধ্যে ইহা বশীকরণ অধ্যায়ের অন্তর্গত। এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইলে প্রচুর সাধনার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের নামই সাধনা। কথিত আছে, পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় এই বিদ্যা মাঝে মাঝে প্রদর্শিত হইত, সেই জন্য ইহার নাম 'ইন্দ্রজালবিদ্যা' এবং ইহা দেবসেনানী কার্ত্তিকেয় আবিষ্কৃত চৌর্য্যবিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু ব্যাপারটি চুরি হইলেও তন্ত্রশাস্ত্রের অপরাপর বিভাগের ন্যায় প্রচুর সাধনাসাপেক্ষ। আজও প্রচলিত প্রবাদ শুনা যায় যে, বাঙলাদেশে ভোজরাজা নামক এক রাজা এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতেই ইহা ভোজরাজার খেলা, ভোজবাজী বা ভোজবিদ্যা নামে প্রচলিত। তাঁহার স্ত্রী রাণী ভানুমতীও

---

* 'হিপ্নোটিজ্‌ম্' এই ইংরেজী শব্দটি নিদ্রা অর্থে ব্যবহৃত গ্রীক শব্দ 'হিপ্নস্' (Hypnus) হইতে গঠিত এবং ইহার প্রকৃত অর্থ মায়ানিদ্রা বা নিদ্রাকর্ষণবিদ্যা—মেসমেরিজ্‌ম্ ও হিপ্নোটিজ্‌ম্ মূলত একই বিদ্যা। মেস্‌মেরিজ্‌ম্ এই শব্দটি উক্ত বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা ভিয়ানা শহরের ডাক্তার মেসমার সাহেবের নাম হইতে গঠিত। হিপ্নোটিজ্‌ম্ ও সম্মোহন বিদ্যায় পার্থক্যও যথেষ্ট। সম্যক্‌রূপে মোহিত হইলেই তবে সম্মোহন। সম্মোহিতাবস্থায় পাত্রের আত্মবোধ থাকে না ও বাহ্যজ্ঞান থাকে না, হিপ্নোটিজ্‌মে তাহা থাকিতেও পারে।—লেখক।

নাকি এই বিদ্যায় সমধিক পটিয়সী ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতেই ইহা "ভানুমতীর খেলা" নামে পরিচিত। এই সমস্ত হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে অতি পুরাতনকাল হইতেই এতদ্দেশে এই বিদ্যার যথেষ্ট আদর ছিল। ধনী, দরিদ্র,রাজা,প্রজা সকলেই এই খেলা অত্যন্ত পছন্দ করিতেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রচলিত প্রবাদ হইতে আজকাল একটি বাদানুবাদ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে ভোজরাজা ও ভানুমতী অবাঙালী ছিলেন। তাঁহাদের নাম হইতে ইহার প্রকৃত সত্য এখন নির্দ্দিষ্ট না হইলেও একথা সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, সেকালে বাঙলাদেশে বহু প্রতিভাবান যাদুকর ছিলেন। ভোজরাজা ও ভানুমতীর নাম হইতে পশ্চিম অঞ্চলে অর্থাৎ—বিহার সংযুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহা 'ভোজরাজকা খেল', 'ভানুমতীকা খেল' নামে সুপরিচিত। ভোজরাজা বা ভানুমতী বাঙালী বা অবাঙালী ছিলেন কি-না তাহা তাঁহাদের নাম হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান না হইলেও সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী অপর দুইজন প্রতিভাবান যাদুকরের নাম হইতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে বাঙালীদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভাবান যাদুকর ছিলেন। তাঁহাদের নাম আত্মারাম সরকার ও বাঙ্গারাম। যাদুবিদ্যা ব্যবসায়ীদের নিকট এই নাম দুইটি প্রায়ই শুনা যায়। বাঙ্গারাম সরকার ও আত্মারাম সরকার যে বাঙালী নাম ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

মোগল-রাজত্বকালেও কয়েকজন বাঙালী যাদুকর সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মোগল বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর তাঁহার স্বরচিত (আত্মচরিত) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ঃ

"আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে বাঙলায় কয়েকজন যাদুকর হাত সাফাই ও ভোজবাজীতে এরূপ দক্ষ ছিল যে, তাহাদের কাহিনী আমার এই আত্মজীবনীতে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি।

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে ঃ

"এক সময়ে আমার দরবারে এইরূপ সাতজন বাঙালী বাজীকরের আবির্ভাব হয়। তাহারা তাহাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিল। আমাকে তাহারা গর্ব্ব করিয়া বলে যে, এমনই খেলা তাহারা দেখাইতে পারে যে মানুষের বুদ্ধি সেই খেলায় তাক্ লাগিয়া যাইবে। বস্তুত তাহারা বাজী দেখাইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি এমনিই অত্যদ্ভুত খেলা দেখাইল যে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়। বাস্তবিকই কৌশলগুলি এমনই আশ্চর্য্যজনক ছিল যে, আমরা যে যুগে বাস করিতেছি সেই যুগে এমন বিস্ময়কর ঘটনা সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য।"—(মেজর প্রাইস কর্ত্তৃক অনূদিত 'জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী')।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এককালে বাঙালী যাদুকরগণ অত্যাশ্চর্য্য যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া লোক-সমাজে কিরূপ প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করিয়াছিল, উহা সত্যই নিখিল-বঙ্গ, কেন, ভারতবাসী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। কিন্তু বিদেশী সভ্যতার সংস্পর্শে ও ইউরোপ-ভাবাপন্ন মনোভাবে আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিদ্যা বিসর্জ্জন দিয়া আমরা নিঃস্ব হইয়া চলিয়াছিসাম। আমাদের স্বকীয় বিদ্যাটিও বৈদেশিক আবহাওয়ায় ম্লান হইয়া উঠিয়াছিল। নতুবা শুধু বাঙলা কেন, মধ্যযুগে সমগ্র ভারতবর্ষে এই বিদ্যা প্রায় লোপ পাইয়াছিল। সে সময়কার কোন নামকরা ঐন্দ্রজালিক বা যাদুবিদ্যার ইতিহাসও পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বিশিষ্ট বিদ্যাটির আবার পুনরভ্যুত্থান হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সর্ব্বদেশেই এই বিদ্যার প্রতিষ্ঠা ও বহুল প্রচার এই সময়েই পরিলক্ষিত হয়। যাদুকর হুডিনি, থ্রাষ্টন, গলষ্টন, হফম্যান, ডেভাণ্ট, ম্যাস্কেলীন,ডেভেনপোর্ট প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আমাদের ভারতবর্ষও এই নবজাগরণে বাদ পড়ে নাই। তবে খুব প্রসিদ্ধ যাদুকর তখন কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই অবহেলিত বিদ্যাটি জন কয়েক বিশিষ্ট যাদুকরের অক্লান্ত চেষ্টায় ও অপরিসীম সাধনায় ভারতের অতীত গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বহুলাংশে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, যাঁহাদের চেষ্টায় ও সাধনায় ভারতবর্ষ আবার তাহার লুপ্তগৌরব ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে এবং বিশ্বসমক্ষে ভারতীয় যাদুবিদ্যার বিশেষত্বকে প্রকাশ করিয়া দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে তন্মধ্যে বাঙালী যাদুকরের দানই অধিক।

ভারতীয় যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে এখনও গবেষণার অনেক অবসর আছে, প্রকৃত গুণীর দৃষ্টি এই দিকে পড়িলে ভারতীয় যাদুবিদ্যার প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই।

পাগলের রোজনামচা *

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ তিনি মৃত—এক বড় আদালতের তিনি প্রধান বিচারক ছিলেন। তাঁর ন্যায়বিচারের সুনাম ছিল। নামটি তাঁর প্রবাদের মত ফরাসী বিচারালয়ে সকলে মানত। ব্যারিষ্টার, উকিল, বিচারকের দল তাঁকে দেখলে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নুইয়ে নমস্কার ক'রত;—তাঁর মহীয়ান্ মুখ—সমুজ্জ্বল ঘন-সন্নিবিষ্ট চোখ দুটিতে আরও উদ্ভাসিত দেখাত।

দুর্ব্বৃত্তকে রক্ষা আর অপরাধের পিছনে তাড়না ক'রেই তিনি তাঁর জীবন কাটিয়েছিলেন। প্রতারক ও হত্যাকারীর এমন ভয়ানক শত্রু আর কেউ ছিল না; কারণ তিনি তাদের মনের গোপন চিন্তা, তাদের মুখের পানে চেয়েই ধ'রে ফেলতে পারতেন।

আজ বিরাশী বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন। সমগ্র জাতির দুঃখ ও প্রশংসা তাঁর সঙ্গে গেল। রক্ত-পোষাক পরিহিত সৈন্যদল তাঁর মৃতদেহ পাহারা দিল, শ্বেত-পোষাকে জনসাধারণ তাঁর কবরে চোখের জল ফেলল—যে অশ্রুধারা সত্যি ব'লেই মনে হ'য়েছিল।

কিন্তু এই বিচারকের নিজস্ব ডেস্ক খুঁজে যে অদ্ভুত রোজনামচা পাওয়া যায়, তাই শুনুন। বড় বড় অপরাধীদের মামলার রেকর্ডের সঙ্গে সেগুলিও ছিল। তার নাম দেওয়া ছিল ঃ

কেন ?

২০ জুন, ১৮৫১। এই মাত্র আমি কোর্ট থেকে উঠে আসছি। ব্লণ্ডের প্রাণদণ্ড দিলাম! কেন সে তার পাঁচটি ছেলে-মেয়েকে মেরে ফেলেছে? প্রায় এমন লোক দেখা যায়—হত্যা করা যাদের একটা আনন্দ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আনন্দ হওয়াই উচিত—হয়ত সব চেয়ে বড় আনন্দ, কারণ হত্যা করা খাওয়ার মতনই নয় কি? তৈরী করা আর ভেঙে ফেলা, নষ্ট করা! এই দুটি কথাতেই পৃথিবীর ইতিহাস আছে, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস! তবে হত্যা করা কেন এত মদ-বিহ্বল হবে না?

২৫ জুন। এমন একটা প্রাণী আছে—যে জীবিত, যে হাঁটে, যে দৌড়ায়—ভাব্‌বার কথা বটে! একটা প্রাণী? প্রাণী কি? এক সজীব পদার্থ—যা গতিবাদের প্রমাণ দেয় এবং সেই নীতিও যার ইচ্ছাশক্তিতে নিয়ন্ত্রিত। এই পদার্থ কিছুতেই আকৃষ্ট হয় না। মাটী থেকে মুক্ত তার পা দুটি। জীবনের একটী পরমাণু যা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় এবং জীবনের এই পরমাণুটিকে যে কেউ ইচ্ছামত বিনষ্ট করতে পারে, যদিও বলতে পারি না—এটার উদ্ভব কোথা থেকে। তারপর আর কিছুই থাকে না। এটা নষ্ট হয়—এর লীলা শেষ হ'য়ে যায়।

২৬ জুন। তবে কিসের জন্যে হত্যা করা অপরাধ? হ্যাঁ, কি কারণে? বরং এটাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রত্যেক প্রাণীর হত্যা করার চরম উদ্দেশ্য আছে। সে বাঁচবার জন্যে হত্যা করে, আবার হত্যা করার জন্যে বাঁচে। পশুশক্তি অবাধে হত্যা ক'রে যায়, প্রতি দিন, তার জীবদ্দশার প্রতি মুহূর্ত্তে। মানুষ না-থেমে হত্যা ক'রে চলে—নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে; কিন্তু যেহেতু এর উপর আনন্দের জন্যেও তাকে হত্যা ক'রতে হয়, তাই সে নানা রকমের শীকার করা আবিষ্কার ক'রেছে। হাতের মধ্যে যে পতঙ্গটিকে শিশু পায়, সেটিকে সে হত্যা করে—যত ছোট পাখী, ছোট ছোট প্রাণী—যা তার সামনে পড়ে। কিন্তু যে অদম্য হত্যার কামনা চিরদিন আমাদের মধ্যে আছে, তার জন্যে এসব পর্য্যাপ্ত নয়। পশু-হত্যা করাই পর্য্যাপ্ত নয়, মানুষও মারতে হবে। বহুকাল আগে নর-বলি দিয়ে এই প্রয়োজন পূর্ণ করা হ'ত। বর্ত্তমানে সমাজে বাস করার প্রয়োজনে হত্যাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হচ্ছে। আমরা হত্যাকারীকে দণ্ড দিই, শাস্তি দিই! কিন্তু যেহেতু আমরা

* গী-দ্য-মোপাসাঁ হইতে।

এই প্রাকৃতিক অথচ দাম্ভিক মৃত্যুর প্রবৃত্তিকে পথ না দিয়ে বাঁচতে পারি না, তাই আমরা থেকে থেকে শান্তি পাই—যুদ্ধ ক'রে। তখন একটা জাতি আর একটা জাতিকে হত্যা করে। রক্তের ভোজ লেগে যায়, যে ভোজে সৈন্যদল ক্ষেপে উঠে, জনসাধারণ মাতাল হয়। নারী, এমন কি, শিশুও রাত্রে শুয়ে শুয়ে বাতির আলোকে এই সব বিরাট হত্যার কাহিনী প'ড়ে মেতে ওঠে।

মানুষের এই কসাই-বৃত্তি যারা চালাচ্ছে—তাদের কি আমরা অপছন্দ করি? না, তাদের আমরা সম্মান দিয়ে ভরিয়ে দিই। সোনা ও রঙীন পোষাকে তাদের সাজাই, বুকে তাদের অলঙ্কার, মাথায় তাদের পালক এবং মেডাল, পুরস্কার, পদবী প্রভৃতি কত কিছু দিয়ে তাদের আমরা আরও বড় ক'রে দিই। তারা অহঙ্কারী এবং মাননীয়, মেয়েদের কাছে তারা ভালবাসার মত লোক, জনতা তাদের চীৎকার ক'রে অভিনন্দিত করে,—একমাত্র কারণ এই যে, তাদের লক্ষ্য মানুষের রক্তে নদী বইয়ে দেওয়া! মৃত্যুর যন্ত্রগুলি তারা রাস্তা দিয়ে দেখিয়ে টেনে নিয়ে যায় এবং কৃষ্ণপোষাক পরিহিত জনতা সেগুলি দেখে হিংসা করে। জীবিতের মর্মস্থলে হত্যা করার মহান নিয়ম প্রকৃতিই দিয়ে রেখেছে! হত্যা ছাড়া আর কিছুই সুন্দরতর এবং অধিকতর সম্মানজনক নাই!

৩০ জুন। হত্যা করা জীবনের নীতি, কারণ প্রকৃতি অনন্ত-যৌবন ভালবাসে। সে যেন তার সমস্ত জ্ঞানহীন কাজে চেঁচিয়ে বলে: "তাড়াতাড়ি কর! তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!" যত বেশী সে বিনাশ করে, ততোধিক নিজেকে সে নতুন ক'রে গ'ড়ে নেয়।

৩ জুলাই। হত্যা করা নিশ্চয় এক অতুলনীয় ও রুচিকর আনন্দ। তোমার সামনে এক জীবন্ত চিন্তাশীল প্রাণীকে দাঁড় করানো হ'ল, তার বুকে একটা ছোট্ট ছিদ্র ক'রে দেওয়া হ'ল—মাত্র একটি ছিদ্র এবং সেই ছিদ্র দিয়ে শোহিত-তরল পদার্থ বাহির হ'তে লাগল,—দেহতত্ত্ববিদ যাকে বলে রক্ত, বলে প্রাণ। তারপর তোমার সম্মুখে এক গাদা মাংস রইল প'ড়ে শক্তিহীন, শীতল এবং চিন্তাহীন!

৫ আগষ্ট। আমি বিচার ক'রে আমার জীবন কাটিয়ে দিলাম। আমার মুখের কথায় দিলাম দণ্ড, হত্যা করলাম;—যারা ছুরি দিয়ে খুন ক'রেছে তাদের গিলোটিনে হত্যা করলাম। যে সব হত্যাকারীকে শাস্তি দিয়েছি, তাদেরই মত আমারও কি হত্যা করা ঠিক হয়েছে? কে জানে?

১০ আগষ্ট। কে পারধে জানতে কোনও কালে? কে আমাকে সন্দেহ করবে কোনও দিন, বিশেষ ক'রে যাকে মারতে আমার কোন অভিরুচি নাই—এমন কাউকে যদি আমি হত্যার জন্য মনোনীত করি?

২২ আগষ্ট। আমি আর নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারি না। পরীক্ষা করতে একটি ক্ষুদ্র প্রাণীকে হত্যা ক'রেছি—সুরু হিসাবে। আমার চাকর জীনের একটী গোল্ডফিন্‌চ্‌ পাখী আফিসের জানালাতে খাঁচায় ছিল। তাকে কোন অজুহাতে কাজে পাঠিয়ে ছোট পাখীটাকে নিলাম, হাতের মধ্যে তার হৃৎ-স্পন্দন অনুভব ক'রলাম। কি গরম পাখীটার পালক! আমার উপরের ঘরে গেলাম। থেকে থেকে পাখীটাকে জোরে চাপ্‌তে থাকি, তার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়; নিষ্ঠুর হলেও কি আনন্দদায়ক! প্রায় সেটার দমবন্ধ করে ফেলি আর কি! কিন্তু রক্ত দেখ্‌তে পাই না।

কাঁচি—নখ কাটার কাঁচি বাহির করে নিই, আর ধীরে ধীরে তিনটি আঘাতে পাখীটার গলা কেটে ফেলি। ঠোঁট খুলে সেটা, পালাবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করে, কিন্তু চেপে ধরে থাকি। ওঃ! আমি ধ'রে থাকি—হয়ত একটা ক্ষেপা কুকুরকেও ধ'রে রাখতে পারতাম তখন!—রক্ত বেরিয়ে আসে—দেখতে পাই।

তারপর ঠিক হত্যাকারীদের মতই আমিও করি। কাঁচিখানি ধুয়ে ফেলি, আমার হাতও। জল ছিটিয়ে সেই দেহ, সেই পাখীটার ছোট্ট মৃতদেহ নিয়ে যাই—বাগানে লুকিয়ে ফেলতে। একটি স্ট্রবেরী গাছের নীচে সেটাকে পুঁতে ফেলি। আর কিছুতেই সে পাখীটাকে দেখা যাবে না। প্রত্যেক দিন সেই গাছ থেকে একটা ক'রে স্ট্রবেরী খেতে পারি। জীবন এম্‌নি ক'রে উপভোগ করা যায়, যদি উপায় জানা থাকে!

ফিরে এসে চাকর চেঁচামেচি করে, সে ভাবে তার পাখী উড়ে পালিয়ে গিয়েছে। কি ক'রে সে আমাকে সন্দেহ করতে পারে? আঃ!

২৫ আগষ্ট। মানুষ একটা হত্যা ক'রতেই হবে! মারতেই হবে!

৩০ আগষ্ট। মেরেছি। কিন্তু কত ছোট! ভার্নের বনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কিছুই ভাবি নি—একেবারে কিছুই না। একটা ছোট ছেলে পথ দিয়ে আসে—একটা ছেলে—হাতে তার মাখম-মাখানো এক টুকরো রুটি। সে আমাকে দেখে দাঁড়ায়, বলে—"সুদিন-সুপ্রভাত বিচারক মশায়!"

আমার মাথায় সেই চিন্তা জেগে ওঠে: "হত্যা ক'রব এই ছেলেটাকে?"

উত্তর দিই—"তুমি একা নাকি, খোকা?"

"হ্যাঁ মশায়।"

"এই বনে একেবারে একা তুমি?"

"হ্যাঁ মশায়।"

মদের মত তাকে খুন করার নেশা লাগে। ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে যাই, যেন সে সন্দেহ ক'রে না পালায়। হঠাৎ তার গলা চেপে ধরি। তার ছোট হাত দিয়ে সে আমার কব্জী চেপে ধরে এবং তার দেহ আগুনের উপর পাখীর পালকের মত কাঁপতে থাকে। তার পর আর সে নড়ে না। পাছে তার দেহ ছুঁড়ে ফেলে তার উপর কিছু ঘাস চাপিয়ে দিই। বাড়ী ফিরে এসে সান্ধ্য-ভোজন তৈরাই জমে। কত ছোট্ট সে। সন্ধ্যা বেলায় খুব খোশ-মেজাজে থাকি, যেন পুনর্যৌবন ফিরে এসেছে। রাত্রে বিশ্বাধ্যক্ষের সঙ্গে কাটাই। তাঁরা আমাকে হাস্য-রসিক বলেন। কিন্তু রক্ত আমি দেখ্‌তে পাই নি। স্থির হ'তে পারি না।

৩১ আগষ্ট। মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। তারা হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

১ সেপ্টেম্বর। দুজন বেকার পথিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রমাণ মিলছে না কোনও।

২ সেপ্টেম্বর। ছেলেটার বাপ-মা আমার কাছে আসে। তারা কাঁদে! আঃ!

৬ অক্টোবর। কিছুই পাওয়া যায় নি আর। কোন বেচারী বেকার নিশ্চয় একাজ ক'রেছে। আঃ! যদি কে দেখতে পেতাম, তবে এখন স্থির হ'তে পারতাম!

১০ অক্টোবর। আবার আর একটা। সকালে ব্রেক-ফাষ্টের পর নদীর ধারে ঘুরে বেড়াই। এক উইলো গাছের নীচে দেখি—এক জেলে ঘুমাচ্ছে। প্রায় দুপুর বেলা। কাছের আসুর ক্ষেতে পড়ে আছে একখানি কোদাল—যেন আমারই জন্যে।

সেটা তুলে নিই। ফিরে আসি; মুগুরের মত সেটা উঠিয়ে এক আঘাতে জেলের মাথাটা দেহ থেকে ছিঁড়ে ফেলি। ওঃ, রক্ত—রক্ত বেরিয়েছে। গোলাপের মত রাঙা রক্ত। ধীরে ধীরে রক্তের ধারা নদীর জলে গিয়ে মিশে। খুব গম্ভীর ভাবে আমি চ'লে যাই। যদি কেউ দেখত আমাকে! আঃ, আমাকে দিয়ে চমৎকার এক হত্যাকারীকে দেখানো যেত তবে আজ!

২৫ অক্টোবর। জেলের ব্যাপারটায় বড় সোরগোল হয়। তার ভাইপো, যে তার সঙ্গে মাছ ধরত, হত্যার অপরাধে তাকে ধরা হয়।

২৬ অক্টোবর। ম্যাজিষ্ট্রেট ভাইপোকে দোষী সাব্যস্ত করেন। শহরের প্রত্যেকে তাই বিশ্বাস করে। আঃ!

২৭ অক্টোবর। ভাইপো নিজেকে বাঁচাতে যা-তা বলে। সে বলে—সে গ্রামে গিয়েছিল রুটি কিন্‌তে। সে শপথ করে যে তার খুড়োকে তার অনুপস্থিতিতে হত্যা করা হ'য়েছে! কে সে কথা বিশ্বাস ক'রবে?

২৮ অক্টোবর। ভাইপো প্রায় স্বীকার করে আর কি! তারা তার বুদ্ধি লোপ করিয়ে দিয়েছে দেখি! হায়—ন্যায় বিচার!

১৫ নভেম্বর। তার বিরুদ্ধে অগুণ্‌তি প্রমাণ, তার মধ্যে প্রধান কারণ সে তার খুড়োর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। দায়রা আদালতে আমিই সভাপতি হব।

১৮৫২, জানুয়ারী ২৫। প্রাণদণ্ড! প্রাণদণ্ড! প্রাণ-দণ্ড! আমি তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম। য়্যাড-ভোকেট জেনারেল দেবদূতের মত ব'ল্‌লেন! আঃ! আবার আর একটা! তার মৃত্যু আমাকে দেখতেই হবে।

১০ মার্চ। কাজ শেষ। আজ সকালে তাকে গিলোটিনে দিল। ভাল ভাবে সে মরল—খুব ভাল ভাবে! আমার আনন্দ হ'ল! একটা মানুষের গলা কাটা দেখ্‌তে কি ভাল লাগে!

এখন—আমি অপেক্ষা ক'রব, অপেক্ষা ক'রতেও পারব। আমার ধরা পড়তে—এই রোজনামচা, এই সামান্য জিনিষটাই যথেষ্ট।

যুদ্ধ ও প্রগতি

শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়চৌধুরী এম-এ

শত সহস্র যুগের অর্জ্জিত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির যখন প্রয়োগ হয় উগ্রলোভাতুর কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির উদ্দেশ্য সাধনে, তখন তার ফলাফল ভোগ করতে বাধ্য হয় সমগ্র জগৎ, সমগ্র সভ্যতা এবং সমাজের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ। তিল তিল ক'রে যে বিরাট প্রলয়শক্তি আজ পর্য্যন্ত মানুষের হাতে জমা হয়েছে, তার তুলনায় প্রকৃতির বিধ্বংসী ক্ষমতা খুবই তুচ্ছ।

এই প্রলয়ের ইতিহাসে এখন পর্য্যন্ত শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাসমর। এই যুদ্ধে সাতশ ত্রিশ লক্ষ লোকের জীবন বিনষ্ট হয়েছে বা তাদের স্বাস্থ্যসুখ ও গৃহ-শান্তির বিলোপ ঘটেছে চিরদিনের জন্যে। এই বিরাট নরমেধ-যজ্ঞে বলি হয়েছিল একশ ত্রিশ লক্ষ যোদ্ধা এবং একশ ত্রিশ লক্ষ শান্তিপ্রিয় নিরীহ নাগরিক। এর ফলে পিতৃমাতৃহীন শিশুর সংখ্যা দাঁড়ায় নব্বই লক্ষ এবং পঞ্চাশ লক্ষ নারী হন স্বামীহারা। খাদ্যাভাব ও অন্যান্য কঠোর অবস্থার জন্যে যে ব্যাপক মহামারী প্রত্যেক দেশে হানা দিয়েছিল, তাতে যে কত লোক প্রাণ হারিয়েছে সংখ্যা তার এখনও সঠিক গণনা করতে পারা যায় নি। মিঃ এডউইন্ স্মিথের গণনা অনুসারে এই কারণে কেবলমাত্র আফ্রিকা মহাদেশেই যা লোকক্ষয় হয়েছে তার সংখ্যা মহাসমরের পূর্ব্ব পঞ্চাশ বছর পর্য্যন্ত সেই দেশের গোষ্ঠীবিরোধে যা প্রাণহানি হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী।

এ ত গেল কেবলমাত্র লোকক্ষয়ের কথা। এখন দেখা যাক্, ঐ যুদ্ধে যে অর্থব্যয় হয়েছিল তা মানবের সুখ সুবিধা ও কল্যাণের জন্যে ব্যয় করলে কি হতে পারত। এ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত অধ্যাপক নিকোলাস মারে বাটলার একটা হিসাব করেছেন। এই যুদ্ধে মোট এক শত বিশ হাজার কোটী টাকা খরচ হয়েছিল। অধ্যাপক বাটলার দেখিয়েছেন এই অর্থ যদি গঠনমূলক কাজে প্রয়োগ করা হ'ত তা হ'লে গ্রেটবৃটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, রুশিয়া, জার্ম্মানী এবং অষ্ট্রিয়ার প্রত্যেক পরিবারের এক একর ক'রে ভূমি, ছ হাজার পাঁচ শত টাকা মূল্যে একখানা ক'রে বাড়ী এবং দু হাজার ছ শত টাকার আসবাবপত্র হ'তে পারত। এ ছাড়া যে সকল শহরের লোকসংখ্যা বিশ লক্ষ বা তদূর্দ্ধ তার প্রত্যেকটিতে এক কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকার একটি ক'রে সাধারণ পাঠাগার ও দু কোটী ষাট লক্ষ টাকার একটি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পারা যেত। আরও বন্দোবস্ত হ'তে পারত এক শত পঁচিশ হাজার শিক্ষক এবং ঐ সংখ্যক নার্সের জন্যে একটা চিরস্থায়ী ফণ্ড্। এর পরেও যা উদ্বৃত্ত থাকত তা দিয়ে সমগ্র ফ্রান্স এবং বেলজিয়মকে ক্রয় করতে পারা যেত অনায়াসে।

লোকক্ষয় ও ধনক্ষয়ের একটা আভাষ পেলাম। এবার দেখা যাক্, গত মহাসমর জনসাধারণের দারিদ্র্য বাড়িয়ে দিয়েছে কতটা। যুদ্ধের খোরাক জুগিয়ে তখনকার দুর্ম্মূল্যের বাজারে মোটা মোটা মুনাফা লুফে নিয়ে বড় বড় ধনকুবের ব্যবসায়ী যারা—তারা হলেন আরও ধনী, সাধারণ অবস্থার লোক যারা—তারা হ'ল গরীব, আর যে ছিল গরীব —সে হ'ল আরও গরীব। যুদ্ধের পর থেকেই পর পর যে অর্থসঙ্কট দেখা দিচ্ছে তাতে দারিদ্র্যের সমস্যাকে দিনে দিনে তীব্র হ'তে তীব্রতর ক'রে তুলেছে। কয়েক বছর আগে বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘের গণনায় পৃথিবীর বেকার সংখ্যা ছিল তিনশ লক্ষ। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ লক্ষ লোক মারা গিয়েছে অনাহারে এবং বার লক্ষ লোক ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে।

মহাসমরের মহাযজ্ঞ শেষ হবার পর বিশটি বছর কেটে গেল। আবার যুদ্ধের বিরাট আয়োজন চল্‌ছে। বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘ থেকে প্রকাশিত "আর্মামেণ্ট্‌স্ ইয়ার্ বুক"এ দেখা যায়, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আগামী যুদ্ধের জন্যে যা সামরিক ব্যয় হয়েছে তার পরিমাণ গত যুদ্ধের দ্বিগুণ। বর্ত্তমানে বৃটেনের করদাতাগণ প্রতি মিনিটে তিন শত পাউণ্ড ওয়ার-আপিসকে দিচ্ছেন।

এই যুদ্ধের যে প্রচ্ছদপট গড়ে উঠেছে তাও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ থেকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। এ সময়ের মধ্যে ফলিত বিজ্ঞানের যা উন্নতি হয়েছে তারও তুলনা ইতিহাসে আর নেই।

রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের প্রচেষ্টা আজ নিয়োজিত হচ্ছে—কি ক'রে প্রলয়শক্তি আরও উগ্র, আরও দ্রুত, আরও সহজ হতে পারে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিমান ছিল শিশু—আজ সে মৃত্যুর পূর্ণতেজী বাহন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের তুলনায় আধুনিক সমর-বিমান চার গুণ সমরোপকরণ বহন ক'রে তিনগুণ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।* বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধজয়ের চেষ্টা চল্‌বে শত্রুদেশের বেসামরিক অসহায় বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের ওপর আগ্নেয় বোমা, বিষবাষ্প ও জীবাণু সংক্রামণের মারফৎ মৃত্যু বৃষ্টি ক'রে। আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনের রণভূমিতে যে বর্ব্বর হত্যাকাণ্ড চলেছে তা অনাগত ভবিষ্যতের একটা ক্ষুদ্র পূর্ব্বাভাষ মাত্র। গত মহাসমর দীর্ঘ চার বছর ধরে চলেছিল। বিশেষজ্ঞরা বলেন—সমরলিপ্সুদের হাতে যে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত হয়েছে তার সঠিক ব্যবহার হ'লে আগামী বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র মানবসমাজ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ভস্মস্তূপে পরিণত হ'তে পারে—সভ্যতার চিহ্নমাত্র আর থাক্‌বে না।

বর্ত্তমানের উগ্র যুদ্ধবাদী দেশগুলি তাদের সমরলিপ্সার যে সকল কৈফিয়ৎ দিচ্ছে তার একটি হচ্ছে অস্তি (haves) এবং নাস্তির (have-nots) যুক্তি। আর একটি যুক্তি হচ্ছে জনবৃদ্ধির আধিক্যের চাপ (pressure of overpopulation) ও তজ্জন্য সম্প্রসারণের (expansion) প্রয়োজনীয়তা। সযত্ন প্রচারিত এই যুক্তিগুলি যে একেবারেই মেকি তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।

স্যর টমাস হল্যান্ড তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর নিতান্ত অপরিহার্য্য পঁচিশটি দ্রব্যের মধ্যে বৃটীশ সাম্রাজ্যের মাত্র পাঁচটি নেই, ফ্রান্সের নেই উনিশটি, জাপানের সতের, জার্ম্মানীর উনিশ এবং ইটালীর একুশটি। অস্তি-নাস্তির যুক্তি যদি সত্য হ'ত তা হ'লে ফরাসী রাষ্ট্রের বর্ত্তমান সমরবিমুখতার পরিবর্ত্তে দেখা যেত যুদ্ধের জন্যে তার তীব্র উন্মাদনা এবং য়ুরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি "যৌথ নিরাপত্তা"র (collective security) স্তম্ভ না হয়ে স্থান নিত সমরলিপ্ত দলগুলির পুরোভাগে।

জনসংখ্যার আধিক্যের কৈফিয়তও অস্তি-নাস্তি তর্কের মতই ফাঁকা। মজার কথা এই যে, জনসংখ্যার আধিক্য (overpopulation) এবং দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন (over production of commodities) এই দুটো একই সময়ে আজ আমাদের শুনতে হচ্ছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় দুই শত কোটী এবং বাৎসরিক বৃদ্ধির হার এর প্রায় একশতাংশ অর্থাৎ দুই কোটি। এই বর্দ্ধিত সংখ্যার জন্য খাদ্যাভাব ঘট্‌বে এ হ'তেই পারে না। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার যে সব অসাধ্যসাধন করছে—পৃথিবীর সকল দেশে তার সম্পূর্ণ প্রয়োগ করলে এই বর্দ্ধিত মানব-সংখ্যার আহার জুগিয়ে কিছু সঞ্চয়ও হ'তে পারে। একথা ভুল্‌লে চলবে না যে, আগে যেখানে এক একর ভূমির ধান থেকে শস্য তৈরী করতে পঞ্চাশ ঘণ্টা লাগত, আজ সেখানে ট্রাক্টর (Tractor) কাজ শেষ করে এক ঘণ্টায়। বিজ্ঞানের গতি মন্থর নয়। বিজ্ঞান আজ ক্ষিপ্রতালে নব নব আবিষ্কার ক'রে যাচ্ছে—একথা কে অস্বীকার করবে? গত মহাসমরের সময় লর্ড লিভারহুল্‌মে হিসাব ক'রে দেখিয়েছিলেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত কলকারখানা, খনি প্রভৃতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে উৎপাদন হয় তার সার্ব্বভৌম প্রয়োগ (universal application) হ'লে পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার স্বচ্ছন্দ জীবনধারণের জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তির সপ্তাহে মাত্র একঘণ্টা ক'রে কাজ করলেই চলতে পারে।*

বাস্তবিক পক্ষে, আক্রমণ ও সম্প্রসারণ নীতির মূলে যদি সংখ্যাধিক্যের সমস্যাই থাকত তা হ'লে চীন মহাদেশের "গড্ডালিকা প্রবাহ" সমগ্র ধরিত্রীকে গ্রাস ক'রে ফেলত বহু দিন আগেই। ইটালী আবিসিনিয়াকে জয় করেছে এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে যুদ্ধ ক'রে চীনের প্রকাণ্ড একটা অংশ দখল ক'রে জাপান কায়েম হয়ে বসেছে। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক রাজকর্ম্মচারী এবং ব্যবসায়ী ছাড়া ইটালী ও জাপানের কয়জন অধিবাসী আবিসিনিয়া ও বিজিত চীনখণ্ডে বসবাস করতে গিয়েছে?

আজকাল জনসংখ্যার আধিক্যের একটা ধূয়া উঠেছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতি থেকে আহৃত বিরাট দ্রব্যসম্ভার স্বেচ্ছায় নষ্ট ক'রে ফেলবার প্রতিযোগিতায় প্রায় সকল দেশই

---

* আগামী যুদ্ধে বিমানের স্থান সম্বন্ধে মিঃ উইনটিংহাম প্রণীত 'দি কামিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার'-এর দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

* "মিঃ উইনটিংহাম্ প্রণীত 'দি কামিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার'-এর নবম অধ্যায় এবং মিঃ আর্. এল্ ওয়রাল্ প্রণীত 'ফুট্‌ষ্টেপ্‌স্ অফ্ ওয়ারফেয়ার'-এর পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পরস্পরকে যেন টেক্কা দেবার চেষ্টা করছে। অর্থসঙ্কটের সময় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পাঁচশত ষাট লক্ষ পাউণ্ড সংরক্ষিত (Preserved) মাংস এবং চোদ্দ লক্ষ গাড়ী বোঝাই বিভিন্ন শস্য নষ্ট ক'রে ফেলা হয়েছে। ১৯৩১-এর জুন মাস থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৩-এর জুন পর্য্যন্ত ১৬০ লক্ষ বস্তা ব্রেজিলিয়ান কাফি "প্ল্যান" করে পোড়ান হয়েছে। আর বিলেতের কৃষিমন্ত্রীর হুকুমে ১৯৩৪-এ সংখ্যাতীত গ্যালন দুধ নিক্ষিপ্ত হয়ে ক্লাইড্-এর জলকে প্রায় শাদা ক'রে ফেলেছিল। এ ছাড়া তূলা, চিনি, মাখন এবং আরও অনেক জিনিষ যে কত নষ্ট হয়েছে তার পরিমাণ নিশ্চিতভাবে হিসাব করতে পারা যায় নি।* অবশ্য এই সব স্বেচ্ছাকৃত অপচয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে মালের পরিমাণ কমিয়ে বাজারে বর্দ্ধিত মূল্যের মারফৎ লাভের হার (rate of profit) বজায় রাখা।

বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধবাদীদের কষ্ট-কল্পিত যুক্তিগুলি যে একেবারেই ভূয়া এতে আর কোন সন্দেহ নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের, জাতির সঙ্গে জাতির ও দেশের সঙ্গে দেশের প্রকৃত কোন বিরোধই নেই—যুদ্ধ গণস্বার্থের প্রতিকূল। যুদ্ধের আসল ষড়যন্ত্রকারী হচ্ছেন বড় বড় শিল্পপতি, খনির মালিক ও ব্যাঙ্কার। এরাই রাষ্ট্রকে মুখপাত্র ক'রে অভিযান ঘোষণা ক'রে থাকেন। এদের রাশীকৃত মূলধনের পূর্ণ প্রয়োগ স্বদেশে হবার পর উদ্বৃত্ত মূলধনের সেখানে যখন আর একটুও স্থান হয় না, তখনই হয় উপনিবেশের দরকার এবং এই উপনিবেশ সৃষ্টি-কল্পেই জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার বিকৃত ভাষ্য ক'রে এরাই জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলে সমর-মত্ততায়। পরদেশ লুণ্ঠন ক'রে বা সেই সব জায়গায় প্রভাব বিস্তার ক'রে নতুন বাজার সৃষ্টি হয় মূলধনের প্রয়োগ-কল্পে। গত মহাসমরের ইতিহাস, পুঁজিপাতির মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পৃথিবীকে বণ্টন করবার জন্যে লড়ায়ের ইতিহাস। আবিসিনিয়া, স্পেন এবং চীনের দৃষ্টান্ত নিলেও দেখা যাবে, ঐ-ঐ দেশের আক্রমণ-স্থলগুলি নানা প্রকারের খনি ও শিল্প সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

মুনাফাবৃত্তি বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার গোড়ার কথা। সমাজের ধানোৎপাদনের উপায়গুলি সংখ্যালঘিষ্ঠদের কর্ত্তৃত্বে থাকায় হয় অসঙ্গত ধনবণ্টন। প্রকৃত ধনোৎপাদনকারী যারা তারা তাদের ন্যায্যদাবী থেকে হয় বঞ্চিত। ফলে দেশের দারিদ্র্য যায় বেড়ে। অন্য দিকে, এই মুনাফাবৃত্তির উগ্র লোভ পর্য্যবসিত হয় পরদেশ লুণ্ঠনে।

সুতরাং ধনোৎপাদনের উপায়গুলিকে যদি ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বের বদলে সমাজের আয়ত্তে আনা যায় তবেই ঘটবে যুদ্ধ ও দারিদ্র্যের স্থায়ী বিলোপ। এই সম্ভাবনা যে একেবারে আকাশকুসুম নয় তার প্রমাণ—ইতিহাস। প্রগতির পথে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজের উদ্ভব হয়েছে, আবার উন্নততর সভ্যতার ভিত্তিতে এই সকল সমাজের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হয়েছে।

তাই আজ শান্তিকামীদের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র হবে প্রত্যেক দেশের সংখ্যাতীত নরনারীকে দারিদ্র্য ও যুদ্ধের মূল উৎস সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা। এদের কাছে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার বিকৃত ভাষ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা এবং আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-আন্দোলনকে ব্যাপক ও সুদৃঢ় ক'রে তোলা। দেশের জনগণ যত দ্রুত বুঝতে পারবে—যুদ্ধ তাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এর লভ্যাংশ যায় মাত্র কতিপয় ব্যক্তির ভোগ দখলে, আর তাদের হয় সকল দিকেই ক্ষতি—তত দ্রুত সমরলিপ্সু দলের শক্তি পাবে হ্রাস। আজ যদি প্রত্যেক শান্তিকামী ব্যক্তি তার অবসর সময়ে নিজ নিজ পরিবার ও পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যে আলাপ-আলোচনা মারফৎ একটা সুনির্দ্দিষ্ট সমরবিরোধী মনস্তত্ত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করেন তা হ'লে শান্তির কাজ অনেকটাই যাবে এগিয়ে।

কৃষ্টি সম্মিলনীর কলিকাতা অধিবেশনে দার্শনিক রাধাকিষণ বলেছিলেন:—"ভিত্তিতে ফাটল ধরেছে। পুরাতন বনিয়াদকে আশ্রয় ক'রে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।" তাই পরিপূর্ণ শান্তির ভিত্তিতে নয়াসমাজের পাকা বনিয়াদ গড়ে তোলাই হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল।

এই প্রচেষ্টা যে দিন সফল হবে, সেই দিন থেকে হবে প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগের পরিসমাপ্তি এবং প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভ।

* এই স্বেচ্ছাকৃত অপচয়ের বিস্তৃত বিবরণ "ফুট্‌ষ্টেপ্‌স্ অফ্ ওয়ার্-ফেয়ার্"এর পঞ্চম অধ্যায়, "রিপোর্টস্ অফ্ দি ইউ এস্ প্লানিং কমিশন," এবং মিঃ জন্ ষ্ট্রাচি প্রণীত "দি কামিং ষ্ট্রাগল্ ফর্ পাওয়ার্"-এ পাওয়া যাইবে।

পথে যাদের ঘর

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্পোরেশনের ফুটপাথের উপর পাঁচজন বাঙালী ভিক্ষুক আশ্রয় লইয়াছে। পথের পরেই পার্ক। পার্কের একটা শিমুল গাছের ডাল আসিয়া রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহারই ছায়ায় ইহাদের বাসস্থান।

খানিকটা দূরেই আর একদল পশ্চিমা ভিখারীর দল বসবাস করে। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক নাই। ভিক্ষুক হইলেও জাত্যাভিমানটুকু এখনও পূরামাত্রায় বজায় রাখিয়াছে, ছাতুখোর বলিয়া বাঙালীদল উহাদের অবজ্ঞার চোখেই দেখে।

পাঁচজন গৃহহীন ভিক্ষুক-ভিক্ষুণী পথের উপর সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রতিদিন তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসে। এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিতে কোন দিন দেখা যায় না।

একেবারে পশ্চিম পার্শ্বে বসে বিশুর মা। বাতাসী, কেষ্ট, ছিদাম আর কালীতারা পর পর বসিয়া থাকে। সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি পথচারীদের দয়া আকর্ষণ করিয়া ভিক্ষা মাগে।

ভিক্ষা চাহিবার পদ্ধতিটা সকলের একরকম নয়। বিশুর মা তাহার শীর্ণ ডান হাতখানি প্রসারিত করিয়া অশ্রান্তভাবে কান্নার সুরে বলিয়া চলে, "একটা পয়সা দিয়ে যাও বাবা। আমার ছেলেটা কৃষ্ণনগরে অসুখ হ'য়ে পড়ে আছে; দেখ্‌তে যাবো, টিকিটের পয়সাটা দিয়ে যাও বাবা।"

পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিবার পক্ষে ভিক্ষা মাগিবার এই বুলিটা সুষ্ঠু নয়। তথাপি বিশুর মা এতগুলি কথা ক্রমাগত উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে। এই পথ দিয়া যাহারা প্রত্যহ যাতায়াত করে বিশুর মাকে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করে। কারণ এক বৎসর যাবৎ বিশুর ব্যারাম নিরাময় হইল না, কৃষ্ণনগরে যাইবার পয়সাও এতদিনে তাহার জুটিল না।

বিশুর মাকে এই অঞ্চলে বৎসরখানেক যাবৎ দেখা যাইতেছে। এই দীর্ঘকাল একই প্রার্থনা শুনিতে শুনিতে পথচারীদের কান অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

বিশুর মা কিন্তু সত্য কথাই বলে। যদিও একদিনের সত্য ঘটনাটা আজ অলীকত্বে পরিণত হইয়াছে। বিশু তখন বিশ বৎসরের যুবক। কৃষ্ণনগরে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকুরী লইয়া গেল। বিশু যখন দুই বৎসরের তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। নিরবলম্ব নিঃস্ব বিশুর মা সেই হইতে ছেলেকে অনেক দুঃখে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। বিশু চাকুরী করিতে আরম্ভ করিল, এবার তাহার সকল দুঃখ ঘুচিবে ভাবিয়া বিশুর মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু দুঃখ তাহার নিদারুণতম মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া দেখা দিল। হঠাৎ একদিন কৃষ্ণনগর হইতে 'তার' আসিল, বিশু ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়াছে—মাকে সে দেখিতে চায়।

চাঁপাতলা হইতে কৃষ্ণনগরের ভাড়া দুই টাকা তেরো আনা। বিশুর মার হাতে চার-পাঁচ আনার পয়সা ছিল মাত্র। ভাড়ার টাকার জন্য সে গ্রামের প্রত্যেকের নিকট ধার চাহিল। কোথাও পাইল না। কে তাহাকে কিসের প্রত্যাশায় ধার দিবে?

একটা দিন কাটিয়া গেল। অর্থসংগ্রহ করিতে পারিল না। পরদিন সে ভিক্ষায় বাহির হইল। ধার না দিক্, একটা করিয়া পয়সা ভিক্ষা কি পাইবে না? সে বন্দরে যাইবে, পথের লোকের কাছে ভিক্ষা চাহিবে। তাহার পীড়িত পুত্রের শয্যাপার্শ্বে যাইবার মূল্যটুকু তাহাকে সঞ্চয় করিতেই হইবে। কিছু সময় লাগিবে, তথাপি সফলকাম হইবে।

ভিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়া গেল। যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে বিশু কাজ করিত তিনি দুই দিন পরে সংবাদ পাঠাইলেন, বিশু মারা গিয়াছে। তিনিই চেষ্টা করিয়া তাহার শেষ-কৃত্যের ব্যবস্থাটা করিয়া দিয়াছেন।

ইহার পর আরও চার-পাঁচ বছর বিশুর মা গ্রামেই কাটাইয়াছে। দুইটি চোখের দৃষ্টি হারাইয়া তাহার দুরবস্থা চরমে পৌঁছিল। অনাহারে মৃতপ্রায় দেখিয়া কে একজন

গ্রামবাসী তাহাকে কলিকাতার ফুটপাথে রাখিয়া গিয়াছে। সেই হইতে ভিক্ষুকদলের সহিত বিশুর মা কলিকাতার এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চল ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই সব অনেক দিনের কাহিনী। কত দিনের বিশুর মাও আজ সঠিক করিয়া বলিতে পারে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং পরিবর্ত্তিত পরিবেষ্টনীর প্রভাবে তাহার শোকের গাঢ় রং আজ অনেকখানি ফিকে হইয়া উঠিয়াছে। তবে বিশুকে সে ভোলে নাই, আর কৃষ্ণনগরের ভাড়ার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিবার কথাও সে বিস্মৃত হয় নাই। শুধু বেদনার জ্বালাটা নিভিয়া গিয়াছে। যেন ফটোগ্রাফের ছবি; বিশুকে ঘিরিয়া তাহার জীবনের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার ক্ষুদ্রতম অংশটুকুও অদ্যাবধি অম্লান রহিয়াছে। কিন্তু শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মত তাহাতে প্রাণের স্পর্শ নাই, অনুভূতি নাই। বর্ত্তমান জীবনের চূড়ায় দাঁড়াইয়া বিগত জীবনের ছবিগুলি নির্লিপ্ত-ভাবে দেখিয়া যাওয়া শুধু। বিশুর মার সহিত যেন ইহাদের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক মাত্র নাই।

জীবনের মর্ম্মান্তিক সত্যটাকে এই জন্যই সে ভিক্ষার বাহন করিয়া অবলীলাক্রমে বলিয়া চলে, "একটা পয়সা দিয়ে যাও, বাবা। কৃষ্ণনগরে আমার ছেলেটাকে দেখ্‌তে যাব বাবা। দিয়ে যাও একটা পয়সা।"

বিশুর মার পরেই বাতাসীর স্থান। তাহার জীবনের ইতিহাস ছোট। অতি শিশুকালে বিধবা হইয়া তাহার দাদার ঘরে জঞ্জাল হইয়া দিন কাটাইতেছিল। যৌবনের উন্মাদনায় বাতাসী একদিন এক প্রতিবেশীকে সঙ্গে করিয়া সুখ ও শান্তির সন্ধানে কলিকাতা আসিয়াছিল। সুখ ও শান্তির স্বপ্ন যেদিন ভাঙ্গিল, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের তখন উপায় নাই। তাই পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেষ্ট এবং ছিদাম ভিক্ষুকদের মধ্যে কৌলিন্যের দাবী করে। এই দাবী অন্যায় নয়। ইহাদের জন্ম হইয়াছে পথের উপরে; শিশুকাল হইতে ডাষ্টবিন্ ঘাঁটিয়া ভিক্ষা মাগিয়া দিন কাটিয়াছে। ইহারা একান্ত করিয়া পথের মানুষ; বাতাসী অথবা বিশুর মার মত ইহাদের বর্ত্তমান জীবনের পটভূমিকা গৃহের আবেষ্টনীতে অঙ্কিত হয় নাই।

কালীতারার ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না। সে এই দলে থাকিয়াও একটু স্বতন্ত্র। কালীতারা এই দলে অধিক দিন যোগ দেয় নাই। যেদিন দিল, সেদিন হইতে তাহার কোলে একটি ক্ষুদ্র শীর্ণকায় মৃতকল্প শিশু দেখা গেল। কালীতারা বলে, তাহার মেয়ে। বাতাসীর মেয়েটিকে দেখিয়া হিংসা লাগে—তাহার যদি অমন একটি থাকিত! বাতাসী রাগাইবার জন্য বলে, হুঁঃ, তোর মেয়ে না! কোন্ নর্দ্দমা থেকে তুলে এনেছিস্।

কালীতারা সত্যই রাগিয়া যায়। বলে, তুই দেখেছিস্ পোড়ারমুখী? মা হ'তে সাত জন্মের পুণ্যি লাগে। তোদের মত পাপীর মা হওয়া সাজে না।

এই খোঁচাটা বাতাসীর অন্তরে গিয়া বিঁধে। তাই সে চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু ওদিক্ হইতে বিশুর মা গর্জ্জন করিয়া ওঠে; ভিক্ষার বুলি বন্ধ করিয়া সে বলে, মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্ কালী। বিশু আমাকে বিশ বছর ধরে মা ডাকে নি? কেমন ছেলে পেটে ধরেছিলা জিজ্ঞেস করে আসিস্ চাঁপাতলা গাঁয়ে! তুই আর কদিনের মা যে মায়ের মর্ম্ম নিয়ে ঝগড়া করতে আসিস্?

বিশুর মার বক্ষ মাঝে মাঝে তৃষিত হইয়া ওঠে। সে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলে, তোর মেয়েটাকে আমার কোলে একটু দিয়ে যা তো। কালীতারা এই অনুরোধ রক্ষা করে না। তাহার মনে সন্দেহ জাগে। বাতাসী আর বিশুর মা তাহার সন্তান-সৌভাগ্যকে ঈর্ষ্যা করে। সুযোগ পাইলে ইহারা মেয়ের অকল্যাণ করিতে পারে। তাই কালীতারা মেয়েকে রাখিয়া কোথাও যায় না।

এই দলের মধ্যে কালীতারার উপার্জ্জন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সে সকলের নিকট হইতে একটু দূরে গিয়া তিফায় বসে। মাথার উপর আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া দেয়। ফুটপাথের উপরে কাপড় পাতিয়া মেয়েটাকে শোয়াইয়া রাখে। কাটির মতো সরু সরু হাত-পা লইয়া মেয়েটা নির্জ্জীবের মতো পড়িয়া থাকে। হঠাৎ দেখিলে বুঝা যায় না মৃত কি জীবিত। কালীতারা ঘোম্‌টার মধ্য হইতে অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে ভিক্ষা মাগে, আমার মেয়েটাকে একটা পয়সা দিয়ে যান বাবু।

একজন ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক দারিদ্র্য পীড়িত হইয়া নিরুপায়ভাবে সন্তানের জন্য ভিক্ষায় নামিতে বাধ্য হইয়াছে,—এই ভূমিকায় কালীতারা চমৎকার নিখুঁত অভিনয় করে। এই অভিনয়ের জন্যই তাহার বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন হয়।

সন্ধ্যা হইলে অভিনয়ের মুখোস খুলিয়া কালীতারা

স্বস্থানে গিয়া বসে। মেয়েকে খাওয়ায়, মেয়েকে লইয়া আদর করে। দিনের উপার্জ্জন হিসাব করিয়া গুণিয়া রাখে।

পয়সা উপার্জ্জন যদিও কালীতারা বেশী করে, তথাপি দলের মধ্যে বাতাসীর প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দেখিতে সে কুৎসিত। কিন্তু যৌবনের যে অস্তমান আভা আজও তাহার দেহে প্রতিফলিত হইতেছে, তাহাই বাতাসীকে এই দলভুক্ত দুইটি পুরুষের নিকট সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। বাতাসীর বয়স কম, সে আজও সম্পূর্ণ সক্ষম। তাই বাতাসীর উপর নির্ভর করিয়া সকলেই স্বস্তি পায়।

কেষ্ট আর ছিদাম দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত। বাতাসীকে উহাদের সাহায্য করিতে হয়। বিশুর মা অন্ধ, তাহাকে স্নান করানো, খাওয়ানো সব বাতাসীর কাজ।

বিশুর মা তাহার সেবায় মুগ্ধ হইয়া বলে, আর জন্মে তুই আমার মেয়ে ছিলি বাতাসী।

বাতাসী কোন স্নেহের বন্ধনই মানিতে চায় না। হৃদয়-বৃত্তির খেলায় একবার সে হারিয়া নিঃস্ব হইয়াছে, পুনরায় সে পথে যাইবে না। যাহা সে করে তাহা না করিলে চলে না বলিয়া।

বাতাসী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া ওঠে, কোন্ দুঃখে মেয়ে হ'তে যাব? আমরা একাদশ তিলি, আর তোমরা হ'লে শূদ্র! তোমাদের হাতের জল খেলেও জাত যায়।

পথের জীবনকে বরণ করিয়াও বাতাসী তাহার পূর্ব্বতন বংশমর্য্যাদার কথা কারণে-অকারণে প্রচার করিতে দ্বিধা করে না।

বাতাসী তাহার নিজের কথা কাহারও নিকট গোপন করে নাই। কালীতারা তাহা লইয়া টিপ্পনী কাটে; বলে, জানি লো সব জানি; কুলের গরব আর ওমুখে করিস্ না।

বাতাসীর উষ্ণপ্রকৃতি এই ইঙ্গিতে ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। সে কালীতারার নিকট উঠিয়া আসিয়া হাত-পা নাড়িয়া বলে, ঘর ছেড়েছি? বেশ করেছি! লাথি ঝাঁটা খেয়ে ভাইয়ের ঘরে দাসীবৃত্তি করতে যাব কেন? শাক-ভাত খাই, উপোস করে পড়ে থাকি, যা-ইচ্ছে করি কেউ একটি কথা বলতে পারবে না। কার তোয়াক্কা রাখি আমি?

তাহাকে শান্ত করিবার জন্য কেষ্ট কহিল, লোকটা চামার বলেই না তোকে ছেড়ে গেল বাতাসী! হ'তো আমার মতন—

ছিদাম তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলে, হ্যাঁ, তুই তো ভারী একটা রত্ন। দশ বছর আছি তোর সঙ্গে, না জানি কি?

দুইজনের মধ্যে কথার কাটাকাটি হাতাহাতিতে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়া উঠে। বাতাসী আসিয়া তাহাদের নিরস্ত করে।

বাতাসীকে কেন্দ্র করিয়া এই দুইজনের মধ্যে কলহ লাগিয়াই আছে। বাতাসী কেষ্টর পার্শ্বে বসে বলিয়া ছিদাম বুঝিতে পারে না—কেষ্টর মধ্যে এমন কি আছে যাহার জন্য বাতাসী তাহার প্রতি আসক্ত হইতে পারে। মারাত্মক কুষ্ঠ কেষ্টকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিয়াছে। তাহার হাতের আঙুল কয়টা পড়িয়া গিয়াছে; পায়ে উন্মুক্ত ভয়াবহ ঘা। নাকের অগ্রভাগটা খসিয়া পড়িয়াছে। ইহার তুলনায় ছিদাম অনেক ভাল আছে।

ছিদাম বাতাসীকে চুপি চুপি বলে—এই ঘাটের মড়াটার সঙ্গে পিরীত করে কি হবে? আমার কাছে আয় না তুই।

বাতাসী স্বীকৃত হয় না। জবাব দেয়, কেষ্টর রোজগার তোর চার গুণ। ওর সঙ্গে আছি বলেই তবু দু-চারটে পয়সা হাতে পাই। তুই অত পয়সা দিতে পারবি?

সত্যই কালীতারার পরেই কেষ্টর উপার্জ্জন। কুষ্ঠের এই ভয়াবহ রূপ দেখিয়া পথচারীদের দয়ার উদ্রেক হয়। দু-একটা পয়সা অনেকেই স্বচ্ছন্দচিত্তে দিয়া যায়।

এই ভিক্ষুকদলের সর্দ্দার রাখহরি সন্ধ্যার পর প্রতিদিন আসিয়া উপস্থিত হয়। সেদিন যে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ তাহার প্রাপ্য। ভিক্ষা-লব্ধ সামান্য দুই-চারিটা পয়সার উপর বাহিরের কেহ আসিয়া ভাগ বসাইবে, ইহা কাহারও অভিপ্রেত নয়। অথচ রাখহরির শরণাপন্ন না হইলেও চলে না। প্রতিদিন সমান উপার্জ্জন হয় না। এমন দিনও যায় একটি পয়সাও কেহ দেয় না। তখন রাখহরি ইহাদিগকে উপবাসের হাত হইতে বাঁচায়। শীতকালে দাতব্য প্রতিষ্ঠান হইতে দরবার করিয়া পুরাণো কম্বল, পুরাণো কাপড় আনিয়া দেয়। কোথায় কতদিন থাকিতে হইবে, কোন্ স্থানটা উপার্জ্জনের পক্ষে ভাল এই সব নির্ব্বাচনের ভারও রাখহরির উপর।

রাখহরিকে বেশী প্রয়োজন পুলিশের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য, ফুটপাথের উপর স্থায়ী ভাবে বাস করিতে

গেলেই পুলিশ আসিয়া তাড়াইয়া দিতে চায়। পুলিশের লাল পাগড়ী দেখিয়া দলের সব কয়টি ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে। রাখহরি ইহাদের হইয়া পুলিশের সঙ্গে কথা বলে।

রাখহরি এমনি চার-পাঁচটি ভিক্ষুকদলের অধিনায়ক। ইহাদের উপার্জ্জনের উপর ভাগ বসাইয়া তাহার দিনগুলি স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়।

কালীতারা প্রথমে রাজী হয় নাই, বলিয়াছিল তোমার দলে আমি যাব না। কিসের অভাব আমার?

রাখহরি ভয় দেখাইয়া বলিল, দেখ্‌বো তবে; রাখহরি ছাড়া কে তোকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করে। পুলিশ এসে যখন বল্‌বে ঐ মেয়ে তোর নয়, চুরি করে এনেছিস্ কি বল্‌বি তখন? প্রমাণ দিতে না পারলে পুলিশ তোর মেয়ে নিয়ে যাবে।

পুলিশ তাহার মেয়ে লইয়া যাইবে, এই আতঙ্কে কালীতারা রাখহরির শরণ লইয়াছে।

বিশুর মা প্রথমে তাহার উপার্জ্জিত পয়সা হইতে দু-একটা লুকাইয়া রাখিত। রাখহরিকে কিন্তু ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। সম্ভব অসম্ভব সকল স্থান হইতে খুঁজিয়া পাঁতিয়া লুকানো পয়সা সে বাহির করিবেই। রাখহরিকে প্রবঞ্চিত করিবার দুরাশা এখন আর কেহ করে না।

রাখহরির দৃষ্টিও বাতাসীর উপর পড়িয়াছে। বাতাসীকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া যায়। পরিপাটি করিয়া গাঁজার কলিকাটা সাজিয়া টানিতে থাকে আর বাতাসীর সঙ্গে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া গল্প করে। বলে, কোন্ দুঃখে এখানে প'ড়ে আছিস্? আয় না আমরা দু'জনে ঘর বাঁধি।

বাতাসী সম্মত হয় না। সে আজ পথের মুক্ত বিহঙ্গ, ঘরের খাঁচায় আর ফিরিয়া যাইবে না।

রাখহরির সহিত এই ঘনিষ্ঠতায় কেষ্ট অভিমান করে। বাতাসীকে বলে, যা না তুই বড়লোকের ঘরে। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের সঙ্গ মানায় না তোকে।

বাতাসী জবাব দেয় না, শুধু হাসে।

ভোর হইতেই বাতাসী দল ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায়। এদিকের ছোটখাটো চায়ের দোকানের কারিকরদের সহিত সে পরিচয় করিয়া লইয়াছে। একগাল পানমুখে দিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে দোকানের বাহিরে দাঁড়াইয়া গল্প করে। কিছুক্ষণ পরে বলে, ও কারিকরদা, একটু চা দাও না!

কারিকর ছোট একটা মাটির পাত্র পূর্ণ করিয়া চা দেয়। চা-এ চুমুক দিয়া আবার সে গল্প আরম্ভ করে।

পাইস্ হোটেলের চাকরদের সহিতও সে আলাপ করিয়া লইয়াছে। প্রত্যহ ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন তাহার নিজের এবং দলের অন্য সকলের জন্য সংগ্রহ করে। অবশ্য বিনা পয়সায় নয়; চুক্তি অনুযায়ী কিছু দিতে হয়।

দলের যাহার যাহা সামান্য কিছু প্রয়োজন হয় বাতাসী কিনিয়া আনে। ছিদাম এবং কেষ্টর বিড়ি না হইলে চলে না। এই বৃদ্ধ বয়সে বিশুর মার শিশুকালের লোভী প্রকৃতিটি জাগিয়া উঠিয়াছে। আমের দিনে একটা আম, শীতকালে একটা কমলালেবু তাহার চাই। কালীতারা তাহার মেয়ের জন্য একটু দুধ আনিতে বাতাসীর হাতে পয়সা দেয়।

বাতাসী সানন্দে সকলের সওদা করিয়া আনে। অন্য কেহ যাইতে চায় না; কারণ উঠিয়া গেলেই রোজগারের ক্ষতি হয়। বাতাসীকে পয়সার জন্য ভাবিতে হয় না। ছিদাম, কেষ্ট, রাখহরি—এদের সকলের কাছেই সে পয়সা পাইতে পারে।

দ্বিপ্রহরে যখন লোক চলাচল কমিয়া যায় তখন ইহাদের স্নান ও খাওয়ার সময়। গরু ঘোড়ার জল খাইবার জন্য পথের উপরে কোন্ এক পুণ্যবতী মহিলা লোহার চৌবাচ্চা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই চৌবাচ্চার চারদিক ঘিরিয়া সকলে আসিয়া বসে। কেষ্ট যদিও কুৎসিত রোগগ্রস্ত তথাপি সে একটু সৌখীন। দু পয়সা দিয়া লাল রঙের একটা জাপানী সাবান কিনিয়া আনিয়াছে। তাহার হাতের আঙুল নাই, তাই বাতাসীকে বলে সাবান লাগাইতে। বাতাসী সাবান মাখায় আর বলে, যা ছিরি, সাবান মেখে আর কি হ'বে?

কেষ্ট আহত হইয়া বলে, গর্ব্ব করতে নেই বাতাসী; একদিন তোরও হ'বে।

হওয়াটা কিছুই বিচিত্র নয়। পথ চলিতে গেলে যেমন ধূলায় পা জড়াইয়া ধরে, তেমনি পথকে যাহারা ঘর করিয়া লইয়াছে রোগ তাহাদের নিত্যসঙ্গী।

প্রথমে বাতাসী কেষ্টকে ঘৃণা করিত, তাহার রোগকে ভয় করিত। কিন্তু পথের জীবনে যখন অভ্যস্ত হইয়া উঠিল, তখন রোগকে সে নির্লিপ্তভাবে দৈনন্দিন জীবনের আর পাঁচটা স্বাভাবিক ঘটনার মতই গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে।

পথের জীবনে একটা ভাবনাহীন নিশ্চিন্ততা আছে; ইহা তাহাদের ভয় এবং ঘৃণার বৃত্তিকে পঙ্গু করিয়া রাখে। এই জন্যই ইহারা বাঁচিয়া থাকে।

পাইস্ হোটেল হইতে আনা উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জন বাতাসী সকলকে পরিবেশন করিয়া দেয়। বণ্টন করিয়া দিতে দিতে নিজের ভাগে তাহার প্রায়ই কম পড়ে। কেষ্ট ভাত তুলিয়া খাইতে পারে না, তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। ছিদাম দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া ওঠে। তাহার হাতের ঘা বাড়িতেছে; আঙুলগুলি খসিয়া পড়িতে বেশী দেরী লাগিবে না। তখন তো বাতাসীকেই মুখে ভাত তুলিয়া দিতে হইবে—এই সম্ভাবনায় সে আশান্বিত হয়।

বিশুর মা বড় একা। কালীতারা তাহার মেয়ে লইয়া ব্যস্ত। কেষ্ট, ছিদাম এবং বাতাসী একটি উপদল সৃষ্টি করিয়াছে। চোখের দৃষ্টি আমাদের সঙ্গীর কাজ করে। বিশুর মার তাহাও নাই। সে ক্রমাগত ভিক্ষার বুলি আওড়াইয়া চলে। যখন ভিক্ষা মাগে না, তখন চুপ করিয়া থাকে।

বিশুর মা একদিন একটি সঙ্গী পাইয়া গেল। কোথা হইতে ক্ষুদ্র একটি কুকুরছানা তাহার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। বিশুর মা হাতে তুলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিল কি জিনিষ। না পারিয়া বাতাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, ছাখ ত বাতাসী এটা কি?

বাতাসী চাহিয়া দেখিল, ওমা, এ যে সুন্দর একটা কুকুরছানা।

বিশুর মা কুকুরছানাটিকে বুকে তুলিয়া লইল। নরম, উষ্ণ তাহার স্পর্শ। গলায় একটা দড়ি দিয়া পার্কের রেলিংএর সহিত বাঁধিয়া রাখে। রাত্রিতে বাঁধন খুলিয়া বুকে লইয়া শুইয়া থাকে। কুকুরছানার সহিত কথা বলে, মুখের উপর চুমু দেয়, একই শালপাতায় ভাত খায়। বাতাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, রং কেমন? শাদা না কালো? কত বড় হ'য়েছে?

বাতাসীর কাছে বিশুর মা তাহার কুকুরছানার গুণ বর্ণনা করে।

বিশুর মা কুকুরছানার নাম রাখিয়াছে বিশু।

কালীতারার মেয়ের জ্বর হইয়াছে। কালীতারা বড় ভাবনায় পড়িয়াছে। তিন দিন কাটিয়া গেল, জ্বর কমিতেছে না। হাতের পুঁজি নিঃশেষ হইতে চলিল। মেয়েকে পথের উপরে শোয়াইয়া পূর্ব্বের মত অভিনয় করিতে পারে না। অথচ অভিনয় না করিলে কেহ পয়সা দেয় না।

একদিন কালীতারা বাতাসীকে ডাকিয়া কহিল, ছাখ্ বাতাসী, কেমন করছে ও!

মেয়েটা অস্থির হইয়া ক্রমাগত হাত-পা ছুঁড়িতেছে। চোখ্ দুইটা বড় হইয়া উঠিয়াছে, ফুটিয়া বাহির হইতে চায় যেন।

কালীতারা কাঁদিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, কি হ'বে বাতাসী?

বাতাসী রাগিয়া বলে, কি হবে আবার? মর্‌বে। ভারী তো মা! একফোঁটা ওষুধ দিতে পারলি না মুখে। যাই ফকির ডেকে আনি গে।

কালীতারা বলিল, কিন্তু পয়সা নেই যে আমার!

ওদিক হইতে বিশুর মা শুনিতেছিল। কহিল, তোর পয়সা নেই বলে মেয়েটা অচিকিচ্ছায় মর্‌বে?

বিশুর জন্য একটা লোহার শিকল কিনিবে বলিয়া অনেক কষ্টে সে দুই আনার পয়সা পর্য্যন্ত সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল। তাহা বাতাসীর হাতে তুলিয়া দিল।

ফকির আসিয়া মেয়েটার সারা দেহ ফুঁ দিয়া, হাত বুলাইয়া, মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়িয়া দিল। একটা ঔষধও খাইতে দিয়া গেল। বাতাসী চারি আনার পয়সা দিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

বাতাসী অসময়ে কমলালেবু সংগ্রহ করিয়া আনিল, চড়া দাম দিয়া বেদানা কিনিল। কালীতারার চিন্তার অংশ স্বেচ্ছায় সে আপনার মাথায় তুলিয়া লইল।

মেয়ে ভাল হইয়া উঠিলে কালীতারা প্রায়ই মেয়েকে বাতাসীর কোলে আনিয়া দেয়। বলে, নে, মেয়ে তো তোরই। তুইই যমের সঙ্গে লড়াই করে ওকে ফিরিয়ে এনেছিস্।

এই নির্জ্জীব শিশুটাকে বুকে লইলে তাহার মধ্যে একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি জাগিয়া ওঠে। এই অনুভূতির অভিজ্ঞতা

পূর্ব্বে তাহার কখনও হয় নাই। বাতাসীর অন্তররাজ্যের এক অজানিত মহলের অনুদ্ঘাটিত দ্বার আজ সহসা কাহার যাদুময় স্পর্শে খুলিয়া যায়।···

কেষ্টর প্রতি বাতাসীর পক্ষপাতিত্ব লইয়া ছিদামের সহিত প্রায়ই কলহ বাধে। এক দিনের ব্যাপারে বাতাসী অত্যন্ত চটিয়া গেল। বলিল, আজ থেকে আমার সঙ্গে তোর আর কোন সম্বন্ধ নেই। রোজ রোজ এই ঝগড়া-ঝাঁটি ভাল লাগে না।

ছিদাম কহিল, ওঃ, তোকে ছাড়া চল্‌বে না আমার ভেবেছিস্? তোর মত মেয়ে পথে ঘাটে পাওয়া যায়। কিসের এত অহঙ্কার করিস্?

পরদিন বর্ষার আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিল। রাস্তার ওপারে ফুটপাথের উপরে একটা বড় বাড়ীর বারান্দা আসিয়া পড়িয়াছে। বাতাসী সকলকে লইয়া তাহার নীচে গিয়া আশ্রয় লইল। বৃষ্টি সারাদিনে থামিল না। পথে লোক চলে না, তাই উপার্জ্জন বন্ধ। রাখহরির দেখা নাই। বাতাসী বৃষ্টি মাথায় করিয়া হোটেলের উচ্ছিষ্ট ভাত ধারে কিনিয়া আনিল। বাতাসী বলিয়াই তাহারা ধার দেয়।

ছিদামের জন্য বাতাসী কিছুই আনে নাই। সকলে খাইয়া উঠিল; ছিদাম তাহার কাপড়ের আঁচল দিয়া চোখ মুখ ঢাকিয়া একপাশে শুইয়া রহিল।

কালীতারা তাহার ভাগ হইতে একটা অংশ ছিদামকে দিতে চাহিয়াছে। কিন্তু সে গ্রহণ করে নাই; বাতাসীর দয়া সে চায় না।

রাগ করিয়া যাহাই বলুক, ক্ষুধায় ছিদামের পেট জলিতেছিল। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি থামিল। একটা খাবারের দোকানের একজন লোক সারাদিনের সঞ্চিত ঠোঙাগুলি নিকটের ডাষ্টবিনটায় ফেলিয়া গেল। তিন-চারিটা লোমহীন, ঘা-যুক্ত পথের কুকুর এই ঠোঙাগুলির মধ্যে খাবারের সন্ধানে ছুটিয়া গেল।

ছিদাম কুকুরগুলির পূর্ব্বেই ডাষ্টবিনের নিকট দৌড়াইয়া পৌছিয়াছে। এক হাত দিয়া কুকুরগুলিকে দূরে খেদাইয়া রাখিল: আর এক হাতে ঠোঙা ঘাঁটিয়া নিম্‌কি-সিঙাড়ার টুক্‌রা, আলুর তরকারী, ছোলার ডাল ইত্যাদি খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতে লাগিল।

বাতাসী কেষ্টকে ছিদামের কাণ্ড দেখাইয়া কহিল, বাতাসীর সঙ্গে ঝগড়া করলে কেমন মজা বুঝে নাও চাঁদ!

সন্ধ্যার পরে রাখহরি আসিলে তাহার নিকট হইতে পয়সা লইয়া ভাত আনিল। ছিদামকে সে সকলের আগে ভাত বাড়িয়া দিল। পরিমাণও তাহার ভাগে বেশী। ছিদাম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর খাইতে আরম্ভ করিল। বাতাসী একটি বিদ্রূপের কথাও উচ্চারণ করিল না; যেন কিছু হয় নাই এমনি তাহার ভাব।

বর্ষা কাটিয়া গিয়া শীত পড়িয়াছে। সেবার গঙ্গাস্নানের একটা দুর্লভ লগ্ন পড়িয়াছে। পুণ্যকামী হিন্দু নর-নারীর দল দেশ-দেশান্তর হইতে গঙ্গাস্নান করিবার মানসে কলিকাতা আসিয়াছে।

সকলের উপার্জ্জনই বহুগুণে বর্দ্ধিত হইল। স্নান সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে পুণ্যার্থীর দল ভিক্ষুকদের কিছু দিয়া যায়। ইহা ধর্ম্মের একটা অঙ্গ।

লগ্নের দিন বিশুর মা অনেক পয়সা পাইল। তাহার পরিধেয় বস্ত্রের একটা কোণ পয়সায় ভরিয়া গিয়াছে। বিশুর মা বাতাসীকে কহিল, গুণে ছাখ্ ত কত হয়েছে। যদি কৃষ্ণনগরে যাওয়ার ভাড়াটা হ'য়ে থাকে তা হ'লে তোকে নিয়ে যাবো একবার।

তাহার পর গলা খাটো করিয়া, যেন ভারী একটা গোপনীয় কথা বলিতেছে, এমনি ভাবে বাতাসীর কানে কানে কহিল, জানিস্ বাতাসী, কাল রাত্রে আমার বিশু এসেছিল। স্বপ্ন দেখলাম বিশু এখনও বেঁচে আছে, সেই বাবুর বাড়ীতে কাজ করছে। যেদিন চাকরী করতে বাড়ী ছেড়ে গেল, সেদিন ও কেঁদেছিল। আমাকে ছেড়ে কোন দিন থাকেনি কি-না, তাই। আমিই জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলাম। ঘরে বসে থাক্‌লে গরীবের ছেলের চল্‌বে কেমন করে? কাল স্পষ্ট দেখ্‌লাম, ও কাঁদ্‌ছে। আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে না বলে কাঁদ্‌ছে।

বাতাসী চুপ্ করিয়া পয়সা গুণিতে লাগিল। হঠাৎ বিশুর মা যেন মনের দ্বন্দ্বকে জোর করিয়া বন্ধ করিবার জন্য বলিয়া উঠিল, না, না বিশু বেঁচে আছে। নইলে এতদিন পরে আমাকে দেখা দেবে কেন? কেউ শত্রুতা ক'রে ওর মৃত্যু-সংবাদ রটিয়েছিল।

বাতাসী গুণিয়া কহিল, সাড়ে দশ আনার পয়সা হয়েছে। দেখ্‌তে অনেক, কিন্তু আধ-পয়সাই বেশী।

বিশুর মা শুধু বলিল, মোটে!—এই একটি কথাতেই তাহার আশা-ভঙ্গের বেদনাটা মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। এই সামান্য পুঁজি লইয়া কৃষ্ণনগর যাইবে কেমন করিয়া?

কুকুরছানাটা কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিশুর মা অন্য দিনের মত আজ তাহাকে কোলে তুলিয়া আদর করিল না। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। আজ সহসা তাহার পূর্ব্বজীবনের হারানো পথটা সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। এই পথ বাহিয়া সে আসিয়া পৌছিয়াছে একটি জীর্ণ গৃহে। এখানে দারিদ্র্য আছে, কিন্তু পথের জীবনযাত্রার মত তাহা কদর্য্য নয়, শ্রীহীন নয়। এই গৃহকে ঘিরিয়া আছে দুঃখ, আছে দৈন্য। একটি শতাতুর স্নেহব্যাকুল মাতৃহৃদয় দিনের পর দিন দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে তাহার শিশুপুত্রকে মানুষ করিয়া তুলিবার আশায়·····

শীত শেষ হইয়া যাইতেই কেষ্ট শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। কুষ্ঠ এখন আর তাহার কোমল অংশগুলিতে আবদ্ধ নাই; দেহের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শরীরের রং অঙ্গারের মত কালো হইয়া উঠিয়াছে; ত্বক ফাটিয়া আঁকা-বাঁকা রেখার সৃষ্টি করিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে গোসাপের পিঠ বলিয়া ভুল হয়।

রোগ মারাত্মক হইলেও একটা যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি কখনও কেষ্টর মুখ হইতে শোনা যায় না। জন্ম হইতে ইহারা দুঃখ ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং জীবনের পরিসমাপ্তি যে একদিন এইরূপেই ঘটিবে ইহাও তাহারা জানে। বেদনা-বোধের শক্তিটা লোপ পাইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর এই ভয়াবহ রূপটাও ইহাদের নিকট অস্বাভাবিক ঠেকে না, নীরবে পশুর মত সব-কিছু সহিয়া যাওয়াই যেন স্বাভাবিক।

বাতাসী মাঝে মাঝে বড় ঘা'গুলি ধোয়াইয়া দেয়। কখনও কখনও একটু দুধ সংগ্রহ করিয়া আনে। বাতাসীর এই একটুখানি যত্নে এত যন্ত্রণার মধ্যেও একটু শান্তি পায়।

মাছির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কেষ্ট আপাদমস্তক কম্বলে আচ্ছাদিত করিয়া পড়িয়া থাকে।

একদিন সকালে বাতাসী কম্বল উঠাইয়া দেখিল রাত্রিতে কেষ্ট কখন সকলের অজ্ঞাতে মরিয়া রহিয়াছে।

ছিদামের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া মৃতদেহটা একটু দূরে সরাইয়া রাখিল। পার্কের হিন্দুস্থানী মালীর বাসা হইতে বাতাসী কয়েকটা তুলসীপাতা আনিয়া মৃতের বুকের উপরে ছড়াইয়া দিল। একজনকে ধরিয়া শিয়রের কাছে খড়ি দিয়া রাম নাম লেখাইয়া লইল।

সংবাদ পাইয়া একজন পুলিশ মৃতদেহের পাহারা দিতে আসিল। বাতাসী মাথার নিকটে বসিয়া আছে। পুলিশ দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয়। পথচারীর দল নিঃস্ব হিন্দুর মৃতদেহ দেখিয়া পয়সা দিয়া যায়। অর্থের অভাবে যেন মৃতদেহ হিন্দুপ্রথানুযায়ী সৎকারের বিঘ্ন না ঘটে—এই তাহাদের ভাবনা।

বাঁচিয়া থাকিতে যাহাকে কেহ একটা পশুর অধিক মর্য্যাদা দেয় নাই, তাহারই মৃতদেহের সদ্গতির জন্য ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু পথিক ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই পয়সা জমিয়াছে অনেক। মৃতদেহের আচ্ছাদন কম্বলটার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পয়সায় ভরিয়া গিয়াছে।

পুলিশটা একটু এদিক ওদিক চাহিলেই বাতাসী সুযোগ বুঝিয়া কয়েকটা পয়সা তুলিয়া লয়।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একটা হিন্দু-প্রতিষ্ঠানের লোক আসিয়া মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেল।

প্রথম ফাল্গুনের শুক্লা সপ্তমী। সপ্তমীর তরল জ্যোৎস্না শিমূল গাছের ডালের মধ্য দিয়া আলো-ছায়ার জাল বুনিয়া ফুটপাথের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পথের জন-প্রবাহ বিরল হইয়া আসিয়াছে। বিশুর মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কালীতারাও জাগিয়া নাই; সে বুকের উপর পোকার মতো কালো মেয়েটাকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

ছিদাম এবং বাতাসী এখনও ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে। কেষ্টর শূন্য স্থানটা ছিদাম অধিকার করিয়া বাতাসীর পাশ ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিয়াছে। ছিদাম আজ উৎফুল্লচিত্তে বাতাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপনের সর্ত্তগুলি স্থির করিয়া লইতেছে।

বাতাসীর উপর আজ ছিদামের অবিসংবাদী দাবী। কেষ্ট বাধা দিবার জন্য মাঝখানে বসিয়া নাই।

প্রতীক্ষা

শ্রীমাধবলাল ঘোষাল

লিলি রাস্তায় ছুটে এসে রিক্সায় চ'ড়ে বসে বললে, "চল, এইদিকে।"

লিলিই উপরের বারান্দা থেকে রিক্সাটাকে ডেকে দাঁড় করিয়েছে, কিন্তু লিলি অসম্ভব ধরণের ছোট, এত ছোট যে রিক্সায় একলা সওয়ারী হয়ে যাওয়ার পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত, তাই রিক্সাওয়ালা অন্য কোন যাত্রীর অপেক্ষায় লিলিদের বাড়ীর দরজার দিকে চাইল। লিলি আবার ব'লে উঠল, "কই, চল্ দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"

চালক একটু অবাক হ'য়ে নূতন সোয়ারীর দিকে একটু তাকাল। তারপর গাড়ীটা একটু তুলে ঠুং—ঠুং শব্দ ক'রে এগিয়ে চলল। রিক্সা এগিয়ে চ'লে—আর লিলি রাস্তার এদিক্ ওদিক্ দেখতে থাকে।

অল্পদূর গেলেই লিলি ভয় পায়—তাই তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে, "এই, এবার বাড়ী চল্।"

লিলির কথায় পথের মাঝে থামে—ঘোরে—আবার চল্‌তে সুরু করে বাড়ীর দিকে।

বাড়ী এল।

গাড়ী থেকে নেমেই লিলি তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া একটি পয়সা গাড়ীওয়ালাকে দিয়ে বলে, "আবার কাল যাব।" বলেই ছুট্টে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

গাড়ীওয়ালা একটু অবাক হয়ে একবার লিলিদের দরজার দিকে আর একবার লিলির দেওয়া পয়সার দিকে তাকাল, তারপর কি ভেবে গাড়ী নিয়ে এগিয়ে গেল।

লিলি ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। লিলির বেশীর ভাগ সময় ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাটে। তাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যত রিক্সা যায় সবগুলিই সে লক্ষ্য ক'রে দেখে।

তারপর দিন আবার ঠিক সময়েই রিক্সা এসে হাজির হ'ল। লিলিও গম্ভীরভাবে এসে গাড়ীতে চ'ড়ে বসল। গাড়ীওয়ালা হাত দেখিয়ে বলে—"আজ এদিকে যাব খুকীমা?"

লিলি বলে—"না—না, ওদিকে যায় নি তো, এদিক দিয়ে গেছে, এই দিকেই চল।"

রিক্সাওয়ালা কিছু বুঝতে পারে না, তাই ঠুং-ঠুং করতে করতে এগিয়ে চলে—কাল যেদিকে গেছল সেইদিকে। অল্পক্ষণ পরেই সোয়ারী হুকুম করে—"এবার ফিরে চল্।"

গাড়ী ফিরল, বাড়ীও পৌছাল। সোয়ারী ভাড়া চুকিয়ে উপরে উঠে আসবার সময় খালি বললে—"আবার কাল এস।"

রাত্রে লিলি তার বাবার কাছে শুয়ে শুয়ে গল্প শুন্‌ছে। বাবা বল্‌ছেন—"অনেকদিন আগে এক দেশে এক রাজপুত্র তার মায়ের সঙ্গে বাস করত। সেই—"

লিলি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে ব'লে উঠল—"কোন্ দেশে বাবা?"

বাবা বললেন, "সে এক দেশে।" বলে আবার আরম্ভ করেন—"সেই রাজপুত্র তার মাকে খুব ভালবাসত।"

লিলি আবার বাধা দিয়ে ব'লে ওঠে—"বাবা, মা কতদিনের জন্য গেছে?"

বাবা একটু অন্যমনস্কভাবে ব'লে ফেলেন—"চিরকালের জন্যে।"

লিলি বুঝতে পারে না, খানিকক্ষণ ভেবে বলে—"হ্যাঁ বাবা, চিরকাল কত দিনে হয়?"

বাবা তার তাড়াতাড়ি উত্তর দেন—"অনেক দিন।" সঙ্গে সঙ্গে লিলিকে বুকে চেপে ধরেন। লিলি একটা ছোট্টো নিশ্বাস ছেড়ে—'অনেক দিন' যে কতদিনে হয় তার হিসাব করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। গল্প শোনাও ঐখানেই থেমে যায়।

ভোর হয়, লিলির ঘুম ভাঙ্গে। দুপুর হয় আবার রিক্সাও হাজির হয়। লিলি কিন্তু ঠিক করেছে মিছামিছি যাবে না। তাই লিলি তাকে চেঁচিয়ে বলে—"আজ যাব না, চিরকাল পরে এসো।"

পরদেশী গাড়ীওয়ালা বুঝতে না পেরে কেবল চেয়ে থাকে তার ক্ষুদ্র যাত্রীটির দিকে।

লিলি আবার বলে—"অনেক দিন পরে এসো, আজ আর যাব না।"

রিক্সা নিয়ে চলে যায়, লিলিও বারান্দায় না দাঁড়িয়ে ভিতরে চলে আসে।

কিছুদিন আগে লিলির মা একটা রিক্সা ক'রে যেদিকে লিলি যেত সেইদিকেই গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন—আর ফেরেন নি।

ইউরোপের চিত্রশিল্পে রেনল্ড্‌স্ ও গেন্‌স্‌ব্রো

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

মধ্য-ইউরোপে চিত্রকলার চরম উন্নতি সপ্তদশ শতাব্দীতে; ইটালী, ফ্লোরেন্স, ভেনিস্, য়্যার্কওয়ান, আমস্টারডাম, প্যারিস, মাড্রিড্, মায় লণ্ডনে পর্য্যন্ত এই সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটালীয় বাস্তব ধারায় চিত্রকলার রীতিমত কাল্‌চার চলতে থাকে। রেম্‌ব্রাণ্ট্, রুবেন্‌স্, ভ্যানডাইক্, ভেলাজকেজ্, টিশিয়ান প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীদের অভ্যুদয়ে য়ুরোপের চিত্রকলা বিশেষ উন্নতি লাভ করে। বৃটীশ জাতির শিল্পীরা

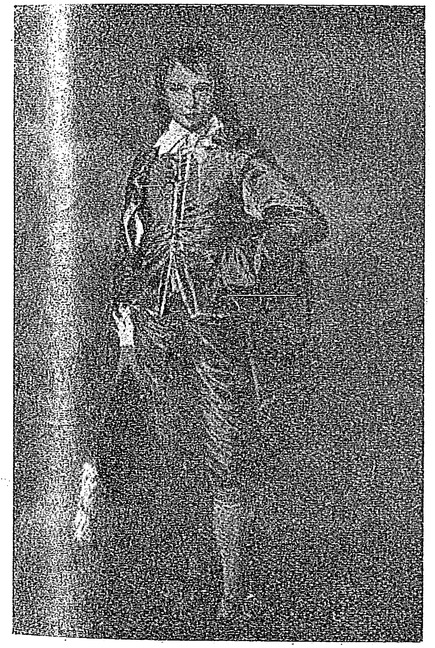

ব্লু বয়

ছিল পিছনে, কিন্তু লণ্ডনের রাজা চার্লস্ ছিলেন তেমনি কলারসিক এবং শিল্পপ্রিয়। রুবেন্‌স্ এবং ভ্যানডাইক্ তাঁর উৎসাহে লণ্ডনে এসে বাস করেন এবং সাধারণের মধ্যে চিত্রকলার আদর এই সময় হতেই আরম্ভ। ফ্লেমিশ্ আর্ট অর্থাৎ রুবেন্‌স্ ও ভ্যানডাইক্—এঁদের আর্ট লণ্ডন কেন ইংলণ্ডেই প্রথম উচ্চস্তরের চিত্রধারা প্রবর্ত্তন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটীশ শিল্প উন্নতিলাভ করে; তার পরিচয় হোগার্থ, উইলসন, রেনল্ড্‌স্, গেন্‌সব্রো, রোম্‌নে প্রভৃতি যশস্বী চিত্রশিল্পীদের আবির্ভাব। রাজপরিবারে এবং অবস্থাপন্ন ও সুখী সমাজে চিত্রের সমাদর করা একটা ফ্যাসন হয়ে দাঁড়ায়। রাজদরবারে একটু নাম করলেই নাইট্ হুড্ বাঁধা। ফটোর সৃষ্টি হয়নি সেজন্য পোট্রেট্ শিল্পীদের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। এই রকম ভাগ্য নিয়ে

ডাচেস্ অব ডেভন্‌সায়ার

জন্মেছিলেন সার যশুয়া রেনল্ড্‌স্। তাঁর এবং পূর্ব্বোক্ত শিল্পীদের এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আনুকূল্যে এই সময় লণ্ডনে প্রথম রয়েল একাডেমি স্থাপিত হয়—চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ সাধনে। সর্ব্বপ্রথম সভাপতি হলেন যশুয়া এবং ছত্রিশ জন মূল সদস্যের অন্যতম হলেন টমাস গেন্‌স্‌ব্রো। উইলসন (রিচার্ড) এবং গেন্‌স্‌ব্রো এঁরা দুজনে মূলত

ছিলেন প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রকর ; কিন্তু জীবিকা উপার্জ্জনের খাতিরে টমাস শেষ বয়সে অতি সুন্দর সুন্দর প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছবিগুলির মধ্যে ডাচেস্ অব্ ডেভন্সায়ার ও ব্লু বয় এই ছবি দুখানি এখানে দেওয়া গেল।

রেণল্ড্স্ ছিলেন খাঁটি পোর্ট্রেট্ চিত্রশিল্পী—জীবনের গোড়া থেকেই চিত্রাঙ্কন অভ্যাসের ফলে অভিজাত ধনী পরিবারে এবং সুধী সমাজে পসার সুরু করেন। কিন্তু যথার্থ মণীষা ছিল সমসাময়িক যশস্বী শিল্পী টমাস গেন্সব্রোর। ইনি বয়সে রেণল্ডসের চেয়ে মাত্র চার বৎসরের

হর্ণেক্ ভগ্নীদ্বয়—রেণল্ড্স্

ছোট ছিলেন—১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে এর জন্ম—সাফোকের একটী পল্লীগ্রামে (সাড্বেরী) ; পিতা সামান্য লোক—তাঁর নয়টী পুত্রসন্তানের কনিষ্ঠ ছিলেন টমাস। ১৪ বৎসর বয়স থেকে টমাস গাছপালা নদী বনানী প্রভৃতি আশে-পাশের পল্লীদৃশ্য প্রভৃতির স্কেচ্ করতেন। আটটী নীরস ভাইবোনের পর টমাস চিত্রকলায় যে রসের সন্ধান পেয়েছিলেন তা নিতান্ত আকস্মিক ভাবে। প্রকৃতিকে তিনি শিশুকাল হতে ভালবেসেছিলেন—তাই তিনি সঙ্গীত ও কবিতা রচনায় অল্প অল্প মনের ভাব প্রকাশ করতেন। চিত্রাঙ্কনে তাঁর ক্রমশ ঝোঁক বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত বাপের অনুমতি নিয়ে লণ্ডনে চিত্রবিদ্যা শিক্ষালাভ করতে আসেন।

শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফিরে এসে টমাস বিবাহ করেন। ইপসউইচে তাঁর গার্হস্থ জীবন তাঁর সুপ্ত প্রতিভাকে প্রথমে জাগিয়ে তুলেও জীবিকার্জ্জনের চাহিদা ব্যস্ত করে তোলে। কিন্তু এই সময়ে তিনি কতকগুলি এত সুন্দর ল্যাণ্ড্-স্কেপ্ এঁকেছিলেন যা খাঁটি ইংলিশ পল্লীচিত্রের প্রথম অপূর্ব্ব নিদর্শন।

শিল্পীর কন্যাদ্বয়

"He was among the first English artist who represented the scenery of their own native land, thus breaking with the tradition followed by his predecessors and contemporary painters of painting imaginery Italian scenery."

অর্থাৎ এতদিন পর্য্যন্ত শিল্পীরা কাল্পনিক ইটালীয় দৃশ্যকে ইটালীয় স্কুলের ধারায় রূপ দিয়ে আসছিলেন ; সেই

ধারাকে ব্রটীশ ছাঁচে ঢেলে গেন্সব্রো সর্বপ্রথম নিজস্ব দেশীয় চিত্রকে রূপ দিতে থাকেন।

গেন্স্ব্রোর "হার্ভেষ্ট্ ওয়াগন," "মার্কেট কার্ট," "দি ব্রিজ" চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। এগুলির মূল চিত্র আছে লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারীতে। বৃটীশ চিত্রশিল্পে ল্যাণ্ড্স্কেপ স্কুলের স্টার্ট্ দেন বলতে গেলে প্রথম উইলসন (রিচার্ড) এবং গেন্সব্রো* এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে। যেহেতু এর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে মণীষী রুবেন্স্ ভিন্ন কোন বড় চিত্রশিল্পী প্রকৃতিদৃশ্যাঙ্কনে (landscape) বিশেষ ভক্ত ছিলেন না। অতি দুঃখের বিষয় যে গেন্স্ব্রো নিজের কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, সম্ভবতঃ লণ্ডনে উপার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে

বিমল বয়স

বেশীর ভাগ পোর্ট্রেট্ আঁকতে হত বলে এবং আরও একটা কারণ যা শেষ পর্য্যন্ত টমাসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রেণল্ড্স্ও বলতে কুণ্ঠিত হন নি যে—ইংলণ্ডে যদি সত্যিকার চিত্রকলানুরক্ত ছেলে থাকত তাহলে এতদিনে গেন্সব্রোর স্কুল বলে একটী ধারা আজও বর্ত্তমান থাকত।

ইপ্স্উইচে বাস করার সময় উইলসনের ষ্টুডিওতে এবং স্থানীয় গবর্ণরের প্রাসাদে ভ্যান্ডাইকের ছবিগুলি টমাস বিশেষভাবে ষ্টাডি করেন এবং ক্রমশঃ সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত চিত্রকর স্যার অ্যাটনী ভ্যানডাইকের বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তারই ফলে গেন্সব্রোর প্রতিকৃতি অঙ্কনে হাত খুলিতে থাকে এবং পল্লীচিত্র-অভ্যস্ত তুলি পোর্ট্রেটগুলিতেও আকাশের নীল রং বা মাঠের ঘাসের সবুজ রংএর ছোঁয়াচ দেওয়াতে ছবিগুলি হয়ে উঠ্ত ডেলিসিয়াস্—যেমনতরো ব্লুবয় ছবিখানি। মাষ্টার বুটালের পোষাক আগাগোড়া নীল, তাতে মুখখানি যেন বেশী ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়। ছবিখানিতে গেন্সব্রোর যথেষ্ট খ্যাতিলাভ হয়। ভ্যান্ডাইকের ধারা হলেও

টমাস গেন্সব্রো

টমাসের নিজস্ব ষ্টাইল এবং রং চাপাবার মৌলিক ভঙ্গিমা এত সুন্দর ভাবে ছবিখানিকে প্রতিমূর্ত্ত করেছে যে চিরকাল এই ছবিটী শিল্পীকে অমর করে রেখেছে। মুখের ভাবখানি পর্য্যন্ত এমন বাস্তব, সজীব এবং অর্থপূর্ণ।

ডাচেস্ অব্ ডেভন্সায়ার এলিজাবেথ ছিলেন অসামান্য রূপসী—তাঁর চক্ষুঝল্সানো রূপ এবং সদানন্দময়ী ভাবকে টমাস গেন্সব্রো যেরূপভাবে ক্যানভাসের উপর রূপায়িত করেছিলেন সেরকমটী আর কেহ পারেনি—যদিও অনেক শিল্পীকেই ডাচেস্ সিটিং দিয়েছিলেন। ছবিখানি এত জীবন্ত এবং সুন্দর হয়েছিল যে রেণল্ডসেরও আঁকা এলিজাবেথ তার কাছে হার মেনে যায়। ছবিখানি টমাস

* " ...Wilson and Gainsborough laid the foundation of our school of landscape, their works are full of the truest nature and purest fancy"—Cunningham.

গেন্সব্রোর প্রবীণ বয়সে আঁকা। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এটী লণ্ডন আর্ট গ্যালারীতে প্রদর্শিত হয় এবং দশ হাজার গিনীতে বিক্রী হয়। কিন্তু এই বিখ্যাত চিত্রটীর সৌন্দর্য্য বোধ করি কোন অজানিত দর্শককে অতিমাত্রায় প্রলুব্ধ করে—যার ফলে ওই প্রদর্শনীতেই অতি অদ্ভুত ভাবে ছবিখানি ফ্রেম হতে বিচ্যুত অবস্থায় অপহৃত হয়। গেন্‌স্‌ব্রোর নাম বিশ্বজগতে ছড়িয়ে পড়ল—সৌভাগ্য-সূর্য্যও সুপ্রসন্ন হলেন। ২৫ বৎসর বাদে গোয়েন্দা লাগিয়ে ছবির উদ্ধার হয় আমেরিকা থেকে।

অর্থসংস্থানের জন্য যৌবনের শেষে টমাস পল্লীদেশ ত্যাগ

সার যশুয়া রেণল্ড্‌স্

করে লণ্ডনে এসে বাস করেন। প্রতিভা চিরদিন অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে না—আলোর মত ছড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল। রাজা হতে আরম্ভ করে গণমান্য ধনী অভিজাত সকলেই তাঁকে সমাজে টেনে নিল। এই হল রেণল্ড্‌সের হিংসা। কারণ সার যশুয়া এই সমাজে পূর্ব্ব হতেই প্রতিষ্ঠিত—তিনি দেখলেন তাঁর মত টমাসও রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণ পাচ্ছে—তৃতীয় জর্জ্জের, রাণীর এবং রাজ পরিবারের ছবি আঁকছে—শুধু তাই নয় রাজা তৃতীয় জর্জ্জ রীতিমত গেন্সব্রোর বন্ধু হয়ে উঠলেন। লণ্ডনের প্যাল্‌ম্যালে টমাস থাকিতেন বলে রেণল্ড্‌স্ হিংসাভরে টমাসকে that man of the Pallmall বলে পরিচয় দিতেন। এঁদের দুজনের মধ্যে আলাপ থাকলেও স্যার যশুয়া অতিশয় ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন, যদিও টমাসের প্রতিভাকে (genius) তিনি মনে মনে শ্রদ্ধা করতেন।

সার যশুয়া রেণল্ড্‌স্ গোড়া থেকেই লণ্ডনের বাসিন্দা; বহুদিন ইটালীতে ছবি আঁকা শিক্ষা করে লণ্ডনের অবস্থাপন্ন ঘরে ঘরে পোর্ট্রেট্ বা প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন করে অর্থোপার্জ্জন করতেন। বর্ণ্ জিনিয়াস না হলেও বৃটীশ পোর্ট্রেট্ চিত্রকরের মধ্যে রেণল্ড্‌স্ ছিলেন প্রথম শ্রেষ্ঠ পেণ্টার। টমাসের যেমন সঙ্গীত ও কবিতায় ভয়ানক taste ছিল সার যশুয়ার তেমনি অনুরাগ ছিল সাহিত্যে। তাঁর আড্ডা ছিল শেরিডান, বার্ক, জনসন্, ব্ল্যাকষ্টোন্, গোল্ড্‌স্মিথ ও গ্যারিক্ প্রভৃতি সাহিত্যমণ্ডলীতে। রয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা এবং পালনে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। রয়েল একাডেমিতে তিনি বহুবার লেক্‌চার দিয়েছিলেন; সেই সমস্ত লেক্‌চারে তাঁর চরিত্রের তিনটী গুণ প্রকাশ পায়—সাহিত্যিক, কলা-সমালোচক এবং কলা-শিক্ষক। বহুসংখ্যক চিত্র তিনি এঁকেছিলেন এবং বহু ছাত্রকে চিত্রশিল্পে শিক্ষা দিয়েছিলেন। রেণল্ড্‌সের ছবি বোধ হয় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, যদিও তার মধ্যে মাত্র কয়েকখানি বিশেষ নাম করতে পেরেছে। তার কারণ তিনি মোটেই ভাববাদী ছিলেন না এবং ইটালীয় পদ্ধতিতে বাস্তব শিল্পী ছিলেন; বিশেষ কোন মৌলিক জিনিষ দিয়ে যেতে পারেন নি। অনেক সময় তিনি লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি, র‍্যাফেল বা মাইকেল এঞ্জেলোর ছবির অনুকরণ করতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হতেন না। সেইজন্য অনেকের মতে প্রতিভাবান খাঁটী চিত্রশিল্পী বলতে রেণল্ড্‌সের নাম গেন্সব্রোর পরে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর্ট গ্যালারীতে এবং কলিকাতার কয়েকটী ধনী পরিবারের চিত্রসংগ্রহে সার যশুয়া রেণল্ড্‌সের ছবি চোখে পড়ে। নাইট্‌হুড্ পেয়েছিলেন বলেই অফিসিয়ালদের চিত্রই তিনি বেশী এঁকে থাকতেন। সার যশুয়া গেন্সব্রোর একখানি ছবি এঁকেছিলেন কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ করেন নি।

পান্থ

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

গ্রামের হরিশ মৈত্তির—

অনেক কাল আগে যখন তিনি এ গ্রামে আসেন, তখন যারা ছিল বৃদ্ধ আজ তারা হয়েছে গতায়ু, যারা ছিল শিশু তারা হয়েছে আজ সবল যুবক, তাদের ঘর ভরে গেছে আজ ছোট ছোট শিশুতে।

সে নেহাৎ আজকের কথা নয়, প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা যেদিন হরিশ মৈত্তির গ্রামে আসেন।

আর হরিশ মৈত্তির গাঁয়ের সবচিন লোক।

গ্রামে যখন প্রথম পোষ্ট অফিসটী স্থাপিত হয়, হরিশ মৈত্তির নিজেই তার ভার গ্রহণ করেন; আজও সেই পোষ্ট অফিসের ভার তাঁর 'পরে রয়েছে।

শুধু তাই নয়—তাঁর আছে ডাক্তারীতে একটু অভিজ্ঞতা, একটা হোমিওপ্যাথী বাক্স সর্ব্বদাই তাঁর কাছে থাকে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ঠিক পৌনে দশটায় তিনি পোষ্ট অফিসের দরজা খোলেন। হাতে থাকে ঔষধের বাক্সটা। চারটা পর্য্যন্ত পোষ্ট অফিস খোলা থাকে।

আজ তিরিশ বৎসরের পুরানো পোষ্ট অফিস। একটা চালা ঘর, চারিদিকে মাটির দেয়াল; ঘরের ভেতর একখানা বিবর্ণ টেবল, একখানা ভাঙ্গা চেয়ার। পাশে একখানা বেঞ্চ, সেখানা তিরিশ বৎসরে তবু দু তিনবার বদল হয়েছে, বদলায়নি টেবল, চেয়ার।

এই অফিস ঘরটা মৈত্তির মশায়ের যেন নিজের ঘর, এখানে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট।

কত দেশের কত চিঠিপত্র তাঁর হাতে আসে, ঠিকানাগুলো একবার দেখে নিয়ে সবগুলো গুছিয়ে ফেলে ডাক দেন—"ভোলা—"

ভোলাপিয়ন দরজাতেই বসে থাকে, এগিয়ে এসে গুণে-গুণে চিঠিগুলো ব্যাগে ফেলে।

চিঠিপত্র বিদায় করে মৈত্তির মশাই টেবলের পরে পা দুখানা তুলে দিয়ে চেয়ারে লম্বা হয়ে পড়ে আড়ামোড়া ছাড়েন।

বেতন মাত্র দশটাকা, ভোলার বেতন চৌদ্দ টাকা।

ভোলার কাজ আর মৈত্তির মশায়ের কাজে অনেক তফাৎ। ভোলাকে বাড়ী বাড়ী চিঠি বিলি করতে হয়, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে হয়, তার খাটনী বড় সোজা নয়।

(২)

পোষ্ট অফিসের গায়েই মৈত্তির মশায়ের থাকবার ঘর।

একখানি ঘর, একটী বারাণ্ডা। সেই বারাণ্ডারই এক কোনে মৈত্তির মশায়ের রান্না হয়। যোগাড় করে দেয় ভোলা। উনানটা ধরিয়ে মাজা এনামেলের হাঁড়িতে চাল জল দিয়ে বসিয়ে দেয়, ভাতটা হতে মৈত্তির মশাই নামিয়ে নেন।

ভোলাও আছে অনেককাল—আজ প্রায় পঁচিশ বছর।

বয়স তার অনেক হয়েছে, দেহটা তার সামনে ঝুঁকে পড়েছে। পত্রের উপরকার ঠিকানা পড়তে আজকাল তার ভুল হয়ে যায়, তাই রামের পত্র যায় শ্যামের বাড়ি, শ্যামের পত্র যায় উমেশের বাড়ি। এ নিয়ে আগে গোলমাল বাধতোনা, আজকাল গোলমাল বাধে।

গ্রামের লোকেরা এই ব্যাপার নিয়ে পোষ্ট মাষ্টারের কাছে আসে।

মৈত্তির মশাই মাথার টাকে হাত বুলান ও বলেন, "আচ্ছা, এবার হতে সাবধান করে দেব ভোলাকে।"

গ্রামের লোকেরা বলে, "ওর এখন ছুটি নেওয়া উচিত; অত বুড়ো হয়েছে চোখে দেখতে পায় না—"

ভোলা এর পর হতে সাবধান হয়ে চিঠি বিলি করে।

ভোলার নামে তবু ও সদরে পত্র যায়। সদর হতে পোষ্টমাষ্টারের নামে পত্র আসে—নূতন পিয়ন রাখতে হবে।

মৈত্তির মশাই ভোলাকে কাছে ডাকেন, শুষ্কহাসি হেসে

বলেন, "তোর এখানকার অন্ন উঠলো রে ভোলা, তোকে এখন সদরে গিয়ে কাজ করতে হবে।"

নির্ব্বোধ ভোলা হাউ হাউ করে কাঁদে।

তবু ও তাকে যেতে হল। তাকে বিদায় দিয়ে মৈত্তির মশাই শূন্য মনে শূন্য ঘরে ফিরে আসেন।

ভোলার পঁচিশ বছরের কাজ এককথায় চলে গেল, তাঁর ত্রিশ বৎসরের কাজ—সে ও তো বড় সোজা কথা নয়।

তা ছাড়া তিনিই এই পোষ্ট অফিস স্থাপন করেছেন, তাঁকে এখান হতে সরাবে কে? গাঁয়ের লোকে তো বলেই থাকে—তিনি গেলে পোষ্ট অফিস অচল হয়ে পড়বে, গাঁয়ের লোক মরবে কোন জায়গা হতে কারও খবর না পেয়ে।

মনের মধ্যে একটু অহঙ্কার হয় বই কি।

(৩)

সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীতে অনেক লোকজন আসে, গল্প চলে; আশ পাশের কৃষকেরা মাষ্টারবাবুর বড় বাধ্য, তাঁর গুণে একেবারে মুগ্ধ। এরা কেউ তাঁর অতীত জীবনের কথা জানে না, কেবল জানে তাঁর বর্ত্তমানকে।

তাদের অসুখ বিসুখ হলে মৈত্তির মশাই দেখাশোনা করেন, ওষুধ পত্র দেন, বিপদে সাহায্য করেন। গ্রামের প্রত্যেকের ভালোমন্দের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। ভোলাকে বাদ দেওয়া চলে, তাঁকে বাদ দেওয়া চলে না।

ষাট বৎসর বয়সেও তিনি কর্ম্ম তৎপর, পোষ্ট অফিসের কাজে এতটুকু ত্রুটী নাই; যে কোন রোগে ডাকলে দেখা-শোনা করা—বেছে বেছে ওষুধ দেওয়া—এরও ত্রুটী নাই।

তাঁর অতীত জীবন অতীতেই কেটে গেছে, কেউ কোনদিন সন্ধান পায় নি তিনি কোথায় ছিলেন, কোথা হতে এসেছেন। সর্ব্বদা সদানন্দ এই লোকটীর মধ্যে কোনও দুঃখময় অতীতের স্মৃতি যে থাকতে পারে, সে কথা লোকে বিশ্বাস করবে না, হেসে উড়িয়ে দেবে।

পঁচিশ বছর কাছে থেকে ভোলাও জানতে পারে নি, রাত্রের অন্ধকার যখন নিবিড় হয়ে গ্রামের বুকে ঘনিয়ে আসতো, সেই নিশীথে সকলে যখন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়তো, তখন একা বিনিদ্র মৈত্তির মশাই বিছানায় পড়ে ছটফট করতেন।

কত দণ্ড কত প্রহর কেটে যেত; তারপর কখন যে কত আরাধনার পর ঘুম আসতো, তাও কেউ জানতো না।

(৪)

গ্রামের বর্ত্তমান জমীদার এসেছেন—।

ক্ষুদ্র গ্রাম ওতোপ্রোত হয়ে উঠেছে। জনে জনে প্রজারা নূতন জমীদার সন্দর্শনে গেছে, যান নি কেবল বৃদ্ধ মৈত্তির মশাই।

কত লোক ডেকেছে; মৈত্তির মশাই হেসে বলেছেন "আমি না গেলেও এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না; কারও কিছু আসবে না, যাবে না। তোমরা দেশের মানুষ, তোমরা যাও।"

কথাটা নূতন জমীদার ব্রতীন্দ্রের কানে পৌঁছতে দেরী হল না।

সামান্য একটা পোষ্টমাষ্টার, তার অহঙ্কারও তো বড় কম নয়—

ব্রতীন্দ্রের পা হতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠলো।

সে আদেশ দিয়ে পাঠালে—হরিশ মৈত্তির যেন আজই বৈকালে তার সঙ্গে একবার অবশ্য দেখা করেন।

আদেশ শুনেও মৈত্তির মশাই চুপ করে রইলেন; যাবেন —কি যাবেন না কিছুই বললেন না।

সেদিন পোষ্ট অফিসে মণিঅর্ডার করতে চিঠি ফেলতে দুচার জন লোক যারা এসেছিল, তাদের সম্বোধন করে শুষ্কহাসি হেসে তিনি বললেন, "আমি এখানে আর কয়দিনই বা আছি। আজ কয়দিন ধরে মনে করছি আর কেন—অনেককাল সংসারে থাকা হল, এবার কাশী যাত্রা করা যাক। দু একদিনের মধ্যেই যাব মনে করছি।"

কথাটা চকিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, মৈত্তির মশাই কাশীবাস করতে যাচ্ছেন, নতুন পোষ্টমাষ্টার আসছে।

সকলেই ব্যগ্রভাবে ছুটে এলো, সবাই জানতে চায় কেন তিনি যাবেন। তাঁর তো যাওয়ার কথা ছিল না, তিনি তো চিরকালই এখানে থাকবেন কথা ছিল।

চিরকাল—

মৈত্তির মশায়ের মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো; তিনি বললেন, "মন টেনেছে বিশ্বেশ্বরের পায়ের দিকে, আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না।"

তিনি আগেই ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন। মাস শেষ হতে আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকি, এর মধ্যে নূতন পোষ্টমাষ্টার এলে তিনি সব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাবেন।

যাত্রার আয়োজনও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন।

(৫)

নূতন জমীদার ক্রোধে ফেটে পড়েন।

এত বড় স্পর্দ্ধা একটা সামান্য পোষ্ট মাষ্টারের, তাঁর আহ্বান শুনেও সে এলো না। নূতন জমিদারকে সবাই সেলাম দিয়ে গেল, এলো না এই লোকটা।

আবার জমীদারের আদেশ এলো—মৈত্তিরকে এখনই যেতে হবে। আদেশ নিয়ে এসেছে জমিদারের দ্বারোয়ান, তার সঙ্গেই যাওয়া চাই।

মৈত্তির মশাই দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "যাও, তুমি তোমার মনিবকে গিয়ে বল, আমি আমার অফিস ফেলে এখন এক মিনিটের জন্যেও কোথাও যেতে পারব না।"

পাড়ার নিমাইহরি ভয়ে ভয়ে বললে, "কিন্তু শুনেছি আমাদের নতুন জমীদার ভারি শক্ত লোক, আপনি তাঁকে চটিয়ে দিয়ে ভালো করছেন না মৈত্তির মশাই।"

মৈত্তির মশাই একটু হেসে বললেন, "আমার আর ভালোমন্দ কি নিমাইহরি; আমি তো চিরকালের মত এখান হতে চলেই যাব, জমীদার আমার কি ক্ষতি করতে পারবেন?"

এ কথাও সালঙ্কারে জমীদারের কানে গিয়ে পৌঁছলো।

যাত্রার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন এসে পৌঁছলো ভোলা। সহরে সে টিকতে পারে নি, ছুটি নিয়ে দেশে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে সে একবার তার অতদিনের পুরাণো গ্রাম আর চিরপরিচিত মাষ্টার মশাইকে দেখতে এসেছে।

গ্রামের বুকের পরিবর্ত্তন দেখে ভোলা অবাক হয়ে গেল।

মাত্র ছয়মাস হল সে গেছে, এই ছয়মাসে পুরাণো সব বদল হয়ে গেছে, নূতন পিয়ন এসেছে, নূতন পোষ্ট মাষ্টারও আজ সকালে পৌঁচেছেন। গ্রামের লোক দলে দলে এসে নূতন মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ করছে, যাওয়ার সময় পথে তারা বলাবলি করে যাচ্ছে—"এবার নতুন মাষ্টারবাবুর হাতে পোষ্টাফিসের চেহারা ফিরবে, কাজও ভালো চলবে।"

নূতন মাষ্টার মশাই ভ্রূ কুঞ্চিত করে চারিদিক দেখছেন, মৈত্তির মশাইকে জানাচ্ছেন—পোষ্ট অফিসটাকে ডাক্তারখানা করা কর্ত্তাদের ইচ্ছা নয়, সে জন্যে তাঁরা বেতন দিয়ে লোক রাখেন নি। এ ঘরটাকে এমন নোংরা করে রাখা হয়েছে যে ঘরে প্রবেশ করতে ঘৃণা হয়। ভাঙ্গা ও ছারপোকাভরা টেবল চেয়ারটাকে এতদিন বদলানো উচিত ছিল, মেঝেটায় সিমেণ্ট দিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, তাতে মৈত্তির মশাইকে কিছু ঘর হতে পয়সা খরচ করতে হতো না—ইত্যাদি।

মৈত্তির মশাই কেবল হাত দুখানা কচলাতে থাকেন।

তরুণ পোষ্ট মাষ্টারের আকৃতি এবং অবশেষে প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে তিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেছলেন।

জমীদার বাড়ী হতে প্রস্তাব এলো—নবাগত পোষ্ট-মাষ্টার যতদিন না নিজের থাকার সুবিধা করতে পারেন, ততদিন জমীদার বাড়ীতে থাকবেন।

মৈত্তির মশাই বিদায় নেওয়ার যোগাড় করতে লাগলেন।

(৬)

ব্রতীন্দ্রের হাতে এলো একখানা পত্র, পত্র লিখেছেন মৈত্তির মশাই নিজে।

মহামহিমময় গর্ব্বিত জমীদার—

তুমি আমায় বার বার ডেকে পাঠিয়েছ, আমি যাই নি। তোমার কাছে যাওয়ার প্রবৃত্তি আমার নেই, কারণ আমি নিজেকে নিজে বিশ্বাস করতে পারি নে। হয় তো উত্তেজিত হয়ে উঠব, হয় তো ক্ষতি করে ফেলব—কাজ নেই তাতে।

তুমি নূতন জমীদারি কিনেছ—আমি যেদিন শুনেছি সেইদিনই ছুটির দরখাস্ত করেছি। নূতন লোক এসেছে, তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। ভেবেছিলুম জীবনের বাকি কয়টা দিন এখানে—এই সব গ্রাম্যলোকের মধ্যে থেকে কাটিয়ে দেব। হতো ও তাই, যদি এ পর্য্যন্ত তোমরা আমায় না অনুসরণ করতে। আমায় এখানে—এতদূরেও তোমরা শান্তিতে থাকতে দিলে না, তাই আমি চললুম।

আমি পান্থ; পথই আমার সম্বল—পথ বেয়েই চলেছি, জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত পথ বেয়েই চলব। পথই আমায় দেবে আশ্রয়, শেষ। শয্যা বিছাব এই ধূলাময় পথের পরে।

হ্যাঁ, আমায় হয় তো তুমি জানো, নামটা হয় তো শুনেছ। তোমার বাপ অবনী ছিল আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, তাকে আমি বড় বিশ্বাস করতুম।

একদিন কোথায় ছিল তোমাদের এই অতুল ঐশ্বর্য্য, কোথায় ছিল নাম যশ, কোথায় ছিল ক্ষমতার অহঙ্কার? পথ হতে পীড়িত অবনীকে আমি কুড়িয়ে নিয়ে আসি, তাকে আশ্রয় দেই, আর দেই সহোদরাধিক ভালোবাসা।

তাই না সে আমার সর্ব্বনাশ করলে—

একদিন আমার না ছিল কি? সুখের সংসার, অগাধ অর্থ। যে অর্থে আজ এই জমীদারি তুমি কিনেছ, এ অর্থ ছিল আমার; এ অর্থ আমি আমার সুখ শান্তি, নাম যশের সঙ্গে দান করে এসেছি।

আমার স্ত্রীকে আমি হত্যা করেছি, কেন—তা আর তোমায় বলবার দরকার নেই। আমি নারীহত্যাকারী, আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এ জীবনে হবে না তা আমি জানি।

ফাঁসীর দড়ি হতে নিজেকে বাঁচালুম আমি পালিয়ে, ষ্টেশন হতে আঠারো মাইল দূরে এই পল্লীগ্রামে থেকে—নাম গোপন করে। আর আমার সম্পত্তি নিয়ে অবনী হল লক্ষপতি, সে আজ কাশীবাস করছে রাজার মত, তার ছেলে আজ জমীদার।

আর আমি—?

নারীহত্যাকারী, ফাঁসীর আসামী, হরিশ মৈত্তির আমার নাম, দশ টাকা বেতনে কাজ করি এই পল্লীতে।

আমি যাব তোমার কাছে করযোড়ে মাথা নত করে দাঁড়াতে, তার চেয়ে আমার আত্মহত্যা করাও ভালো।

আমি বিদায় নিলুম। নিঃশব্দে নীরবে যে পথে এসেছিলুম, সেই পথ বেয়ে চললুম। শত্রুপুত্র, তোমায় তবু যাওয়ার বেলায় আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি তোমার পিতার পাপ যেন তোমার না অর্শে।

বিদায়—

শ্রীজানকীনাথ মৈত্র।

হাঁফাতে হাঁফাতে ব্রতীন্দ্র যখন নদীর ঘাটে পৌঁছালো, তখন নৌকাখানা ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে চলে গেছে। নৌকার উপর দেখা গেল পলিত কেশ বৃদ্ধ মৈত্তির মশাইকে।

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন পেছনে ফেলে আসা গ্রামের দিকে।

চল্লিশ বৎসরের পরিচিত স্থান—

ওই ভাঙ্গা ঘাট, প্রকাণ্ড বড় বট গাছটা, সেবকদের পর্ণকুটীর; গ্রামের পথ, মাঠ, পাখী, আজ সবাই তাঁকে ডাকছে—"আয়, ওরে আয়—"

পান্থ চলেছে পথ বেয়ে; পথের ধূলায় রইলো তার পায়ের দাগ; পথ তাকে ধরে রাখতে পারলে না—রাখলে—সে এসেছিল সেই চিহ্নটুকু।

কবি ও কাব্য

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসাক

তমসাতীরের ক্রৌঞ্চ বধূর শোক
আজো রহে ভরে কবির মানসলোক,
নিষাদের চলা হত্যার অভিযানে
কালো যবনিকা নিতি নব রূপে টানে।
ব্যথা পেল রূপদ্বন্দ্বে, সুরের মাঝে,
কবির বীণায় বিরহের গান বাজে।

ছন্দে যখন অন্তর পেল সাড়া
কবিতার সুর অসীমের বুকে হারা,
বীণার তারেতে গান চাহিবে না শেষ
দিকে দিকে তাই জাগে মুক্তির রেশ।
ভাষার শায়ক লক্ষ্যে বিরাম চায়
কাব্য মাঝারে অসীমের সীমানায়॥

'শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান' সম্বন্ধে বক্তব্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতাবলম্বনে ষোড়শ শতাব্দী হইতে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গলার ন্যায় উড়িয়া, হিন্দী এবং অসমীয়া ভাষাতেও যে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহা এখন অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অবিদিত নহে। কিন্তু সেই সমস্ত চরিতগ্রন্থই কি শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান? অথবা তন্মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ বা তাহার কোন কোন অংশবিশেষই শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান? এখানে বলা আবশ্যক যে "উপাদান" শব্দটি সংস্কৃত। সংস্কৃত গ্রন্থে 'উপাদান' শব্দের যে যে অর্থে প্রয়োগ পাইয়াছি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু এখন বঙ্গভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতের যে উপাদান লিখিত হইতেছে সেই উপাদান কি? ইহাই আমার প্রশ্ন।

সেই সমস্ত চরিতগ্রন্থ অথবা তন্মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ অথবা তাহার কোন কোন অংশই শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান বলিলে উহার মূলভূত প্রমাণ কি, ইহাও বিচার-পূর্ব্বক বক্তব্য। ভারতের বেদাশ্রিত পূর্ব্বাচার্য্যগণ যখন বেদেরও প্রামাণ্য পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তাহা করিতে বিরুদ্ধবাদিগণের বহু পূর্ব্বপক্ষও সমর্থন করিয়া তাহার উত্তর বলিয়াছেন—তখন সেইরূপে নানা চরিতগ্রন্থের প্রামাণ্য পরীক্ষাও অকর্ত্তব্য হইতে পারে না।

অবশ্য শ্রীচৈতন্যচরিতের চর্চ্চায় আমরা বহুবিজ্ঞ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থই সাদরে আশ্রয় করিয়াছি। কারণ কবিরাজ গোস্বামী সংস্কৃত সাহিত্যে এবং অনেক শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে—বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ে শ্রীবৃন্দাবনধামে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত বহু অনুসন্ধান ও বহু প্রাচীন উপদেশ লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য-চরিত-প্রসঙ্গে সুবৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামীর 'চরিতামৃত' গ্রন্থ অপূর্ব্ব অতুলনীয়। তাই উহা এখন সর্ব্বত্র সমাদৃত।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী মুরারিগুপ্ত এবং সমসাময়িক কবিকর্ণপূর ও শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত-বর্ণনে যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও অবশ্য সাদরে পাঠ্য। আর ঐ সমস্ত গ্রন্থে পরস্পর-বিরুদ্ধ যে সমস্ত কথা পাওয়া যায় তাহারও নিরপেক্ষ সমালোচনার দ্বারা কোন সমাধান করিতে চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এখানে প্রথমে ইহার দৃষ্টান্তরূপে একটি বড় কথার উল্লেখ করিতেছি।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থে (যাহা পরে কোন কারণে "চৈতন্য-ভাগবত" নামে কথিত হইয়াছে) বর্ণন করিয়াছেন যে—শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক ৺পুরীধামে যাইয়া তত্রত্য বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন—

"জগন্নাথ দেখিতে যে আইনাঙ্ আমি।
উদ্দেশ্য আমার মূল এথা আছ তুমি।"
"তোমাতে যে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তুমি যে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি॥" ইত্যাদি
(—অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় পঃ)

পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের মস্তক মুণ্ডন-পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া সকলেরই যে দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই পরম কর্ত্তব্য ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছিলেন—

"সভার জীবন কৃষ্ণ জনক সভার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥"
"যদি বোল শঙ্করের মত সে হো নহে।
তাঁরও অভিপ্রায় দাস্য তারি মুখে কহে॥
(ঐ অন্ত্য)

বৃন্দাবনদাস পরে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—"তথা চাহ শঙ্করাচার্য্যঃ প্রভুঃ"—"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং" ইত্যাদি। অর্থাৎ উক্ত শ্লোকের দ্বারা শঙ্করাচার্য্যও নিজ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই সকলের কর্ত্তব্য। বৃন্দাবনদাস উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া পরে বলিয়াছেন—

"এই শঙ্করের শ্লোক এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়॥"

অবশ্য আরও কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে উক্ত শ্লোকটি শঙ্করাচার্য্যের শ্লোক বলিয়াই কথিত হইয়াছে। 'বৃহদ্-ভাগবতামৃতে'র (২য় অঃ ১৮১ শ্লোকের) টীকায় সনাতন গোস্বামী উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত প্রসিদ্ধ শ্লোকটি যে বেদান্ত-ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যেরই রচিত, এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ আছে। আর তাহা হইলেও বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় উক্ত শ্লোকের দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের যেরূপ মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। শারীরক ভাষ্যাদি গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য বিচার-পূর্ব্বক যেরূপ মতের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভৃতিও বিশেষরূপেই জানিতেন এবং তাঁহারা নিজ গ্রন্থে তাহাও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, মূল কথা বৃন্দাবনদাসের মতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা বা কোন বিচার করেন নাই।

কিন্তু পরে কবিরাজ গোস্বামী 'চরিতামৃত' গ্রন্থের মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণন করিয়াছেন যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবকে সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য বেদান্ত শ্রবণ করাইতে নিজ গৃহে তাঁহার নিকটে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যানুসারে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পরে অষ্টম দিনে শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নোত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
পরিণামবাদ ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥"

পরে তিনি তাঁহার নিজসম্মত পরিণামবাদ অনুসারে বেদান্ত মত ব্যাখ্যা করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের 'বিতণ্ডা' প্রভৃতিরও খণ্ডন পূর্ব্বক নিজ মত সংস্থাপন করিলে—

"শুনি ভট্টাচার্য্য হইল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত॥"

পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকের নানারূপ অতিগূঢ় অর্থ শ্রবণ করিয়া—তখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই বিশ্বাস করেন। পরে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে কৃপা করিবার ইচ্ছায়—

"দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশী মুখ স্বকীয় স্বরূপ॥১৮৩
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর জুড়ি॥"১৮৪

বৃন্দাবনদাস বর্ণন করিয়াছেন—

"অপূর্ব্ব ষড়্ভুজ মূর্ত্তি কোটি সূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেল সার্ব্বভৌম মহাশয়॥" অন্ত্য ৩য়

কিন্তু কবিকর্ণপূরও "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গে বর্ণন করিয়াছেন, "প্রদর্শয়ামাস চতুর্ভুজত্বং দিবাকরাণাং শতকোটিভাস্বৎ" অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে শতকোটি সূর্য্যসম তেজঃপূর্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন।

কাঁচনাপাড়ার ভক্ত শিবানন্দ সেন মহাশয়ের পুত্র পরমানন্দই কবিকর্ণপূর নাম লাভ করেন। তিনি শিশুকালে পিতার সহিত ৺পুরীধামে গিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের পরেই অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তি লাভ করেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের শেষে "যস্যোচ্ছিষ্ট-প্রসাদাদয়-মজনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী" ইত্যাদি শ্লোকেও ঐ কথা পাওয়া যায়।

কবিকর্ণপুর চৈতন্যদেবের তিরোধানের নয় বৎসর পরে ১৪৬৪ শকাব্দে প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় যে 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' মহাকাব্য রচনা করেন—তাহার দ্বাদশ সর্গে তিনি শ্রীচৈতন্যদেব ও সার্ব্বভৌমের শাস্ত্রবিচার ও পরে সার্ব্বভৌমের পরাভবের বর্ণন করিয়াছেন। চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী উক্ত স্থলে কবিকর্ণপূরের নাম না করিলেও উক্ত বিষয়ে তিনি তাঁহার কথাই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়।

কবিরাজ গোস্বামী বহু স্থলে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রতি অসামান্য ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি চরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদেও লিখিয়াছেন—

"চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাহার আজ্ঞায় করো তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥
ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষ লীলার সূত্র এ বে করিবে বর্ণন॥"

কিন্তু পরে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'সার্ব্বভৌমোদ্ধার' বর্ণনে তিনি তাঁহার মহামান্য বেদব্যাসকেও মান্য করেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিকর্ণপূরও বৃন্দাবনদাসকে বেদব্যাস বলিয়া বহু সম্মান করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরে "গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়" বৃন্দাবনদাসকেও গৌরগণের মধ্যেই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন —"বেদব্যাসো যত্র বাসীদ্দাসোবৃন্দাবনোঽধুনা" ইত্যাদি। এইরূপ শ্রীচৈতন্যচরিত প্রসঙ্গে নানা চরিতগ্রন্থে আরও অনেক কথা পাওয়া যায়—যাহা পরস্পরবিরুদ্ধ। অতএব তাহাও অবশ্য বিচার্য্য।

শ্রীচৈতন্যচরিত প্রসঙ্গে অনেক দিন হইতে অনেক বিষয়ে অনেক বহুদর্শী সমালোচকের নানারূপ সমালোচনা ও মন্তব্য পাঠ করিয়াও আমি আরও অনেক বিচার্য্য জানিতে পারিয়াছি। কিছুদিন হইল,—'**শ্রীচৈতন্যচরিতের** উপাদান' নামে এক নূতন বৃহৎ পুস্তক কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে উপহাররূপে প্রাপ্ত হইয়া এখন তাহাও মধ্যে মধ্যে সাগ্রহে পাঠ করিতেছি। পাটনা বি-এন কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম-এ ভাগবতরত্ন মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গভাষায় এই নিবন্ধ রচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহা আমাদিগের মাতৃভাষা ও বাঙ্গালীর বড় গৌরবের কথা।

বিমানবাবুর এই নিবন্ধ যিনি কিছু পাঠ করিবেন, তিনিও আলোচ্য বিষয়ে বিমানবাবুর বহু অধ্যয়ন ও অতি কঠোর পরিশ্রমের পরিচয় পাইবেন। তিনি এই নিবন্ধে কত বিষয়ে কিরূপভাবে কত আলোচনা করিয়াছেন এবং সেজন্য তিনি কতকাল হইতে কতস্থানে গিয়া কত গ্রন্থ পাঠ ও কত মাসিকপত্রের কত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, ইহাও এই নিবন্ধের সূচীপত্র, পরিশিষ্ট এবং নির্ঘণ্ট-পত্র পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। শ্রীচৈতন্যচরিত প্রসঙ্গে বঙ্গভাষায় একই গ্রন্থে বহু বিষয়ে এইরূপ নূতনভাবে এইরূপ বহু আলোচনা আমি আর কোন গ্রন্থে পাই নাই। বিচারশীল পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক এই নিবন্ধ পাঠ করিলে শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান সম্বন্ধে বহু সংবাদ পাইবেন, যাহা অনেকের অচিন্তিত বা অজ্ঞাত।

কিন্তু এই নিবন্ধ পাঠকালে মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থের ব্যাখ্যা-পুস্তক নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাখ্যাপুস্তকও নহে। কিন্তু নানা চরিত গ্রন্থে অনেক বিষয়ে যে নানারূপ কথা পাওয়া যায়, তাহার তুলনামূলক সমালোচনার দ্বারা যথামতি সত্য নির্ণয়ই এই নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই ইহাতে অনেক চরিতগ্রন্থের কালনির্ণয় এবং প্রামাণ্য-পরীক্ষার জন্যও অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে 'সহজিয়া' ছিলেন না, এই মহাসত্যের ঘোষণার জন্য নির্ভয়ে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। আর কোন কোন বিষয়ে অনেক খ্যাতনামা বিশিষ্ট সমালোচকের মন্তব্যের উল্লেখ ও তন্মধ্যে কোন কোন মন্তব্যের সমালোচনা পূর্ব্বক প্রতিবাদ করিয়া সে বিষয়ে যথামতি নিজ মন্তব্যেরও সমর্থন করা হইয়াছে।

বিচারশীল বিমানবাবু পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে আধুনিক রীতিতে তুলনামূলক সমালোচনার দ্বারা তাঁহার আলোচ্য বিষয়ে যথামতি সত্য নির্দ্ধারণ করিতে অনেক সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণিক চরিতগ্রন্থকেও সর্ব্বাংশে প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারেন নাই। কারণ পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা কথার সমন্বয় অসম্ভব হইলে সকল কথারই সত্যতা স্বীকার করা যায় না। সেই সমস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা কথার বিরোধ ভঞ্জনের জন্য অগত্যা কল্পভেদকে আশ্রয় করিলে এখন শিক্ষিত সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু বিমানবাবু কোন কোন স্থলে বিভিন্ন গ্রন্থকারের কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াও বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন।

অবশ্য বিমানবাবুর সমস্ত বিচার ও মন্তব্যই যে সর্ব্বসম্মত হইবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। বিমানবাবু নিজেও তাহার আশা করেন না। তিনি নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া পরমবৈষ্ণব অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজীর দৌহিত্র।

তাই তিনি প্রথমে বৈষ্ণবভাবেই তাঁহার প্রাণের কথা লিখিয়াছেন—

'বৃন্দাবনদাস, লোচন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রেমিক কবিজন শ্রীচৈতন্যের যে চরিতসুধা পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহা পান করিয়া বহু সাধুহৃদয় ভক্ত বৈষ্ণব ও সাহিত্যরসিক যুগ যুগ ধরিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেছেন। আর আমি শুষ্ক ঐতিহাসিক, অরসজ্ঞ কাকের ন্যায় শ্রীচৈতন্যের বহিরঙ্গ জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনারূপ নিষ্ফল আস্বাদন করিয়া বলিতেছি—এ ঘটনা এইরূপে ঘটে নাই, ও ঘটনা একেবারেই ঘটে নাই।'

বিমানবাবু পরেও তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "এইরূপ তুলনামূলক ঐতিহাসিক প্রণালী ধরিয়া শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনা করিতে হইলে যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের ও সমাজ-বিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা প্রয়োজন, আমার তাহা নাই। আর বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস লিখিতে হইলে লেখকের ব্যক্তিগত সংস্কার ও আবেষ্টনীর প্রভাব হইতে যেরূপ মুক্ত হওয়া প্রয়োজন, সেরূপ নৈর্ব্যক্তিক ভাবও আমি সর্ব্বত্র অনুসরণ করিতে পারি নাই। সুতরাং আমি এরূপ প্রণালীতে যদি বিচারে অগ্রসর হই, তাহা হইলে আমার ভুল ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহা জানিয়াও এপথে অগ্রসর হইতে চাই; কেন না, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীর এরূপ আলোচনা এ পর্য্যন্ত আর কেহই করেন নাই। **শ্রীচৈতন্যদেব আমার উপাস্য দেবতা** বলিয়া তাঁহার কথা আলোচনা করিতে আমার ভাল লাগে।" ১৬ পৃঃ।

আরও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিমানবাবু অনেক স্থলে বিচারপূর্ব্বক অনেক বিষয়ে নিশ্চিতরূপে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। অনেক বিষয়ে সংশয় বা সম্ভাবনাই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত বিচারই যে সম্পূর্ণ এবং সমস্ত সংস্কারই যে বিশুদ্ধ, ইহা আমিও বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার অনেক মন্তব্য ও অনেক কথায় আমারও অনেক বক্তব্য আছে। এই প্রসঙ্গে তাহাও কিছু বলা আবশ্যক—যদিও তাঁহার গ্রন্থ-সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু কোন কোন বিচার্য্য বিষয়ে যথামতি আলোচনাই উদ্দেশ্য।

বিমানবাবু 'সার্ব্বভৌম উদ্ধার কাহিনীর বিচার' করিতে প্রথমে লিখিয়াছেন—(১) "সার্ব্বভৌম উদ্ধার বর্ণনায় কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা একেবারেই গ্রাহ্য করেন নাই। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় সার্ব্বভৌম উদ্ধার একদিনেই হইয়াছিল। চরিতামৃত অনুসারে উহা অন্ততঃ ১২ দিনের ঘটনা। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইবার পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌম ভক্ত এবং ঈশ্বরে দাস্যবুদ্ধি-সম্পন্ন"। ইত্যাদি (৩৫৮ পৃঃ)। পরে বিমানবাবু উক্ত বিষয়ে তাঁহার নিশ্চিত মন্তব্যের প্রকাশও সমর্থন করিতে লিখিয়াছেন—

"বৃন্দাবনদাসের প্রদত্ত এই বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রহণ না করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম যদি পূর্ব্ব হইতেই ভক্তি পথের পথিক হইবেন, তবে আর তাঁহাকে ভক্ত করায় শ্রীচৈতন্যের মহিমা কোথায়? একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মত-পরিবর্ত্তন করার পক্ষে এক দিনের ঘটনা যথেষ্ট নহে। সার্ব্বভৌম উদ্ধারের সময় নিত্যানন্দ প্রভু কাছে বসিয়া ছিলেন না। সুতরাং এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।" ৩৫৯ পৃঃ।

দেখিতেছি, বিমানবাবু পূর্ব্বে বৃন্দাবনদাসের কথা লিখিতে সর্ব্বত্রই কেবল 'সার্ব্বভৌম' লিখিয়া পরে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে "নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম" লিখিয়াছেন। সুতরাং পরে সার্ব্বভৌমের নৈয়ায়িকত্ব প্রকাশে তাঁহার প্রয়োজন আছে। তবে কি তাঁহার মতেও নৈয়ায়িক পণ্ডিত স্বভাবতঃ "ভক্তি পথের পথিক" হন না? অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও ন্যায় শাস্ত্র এবং নৈয়ায়িক পণ্ডিত সম্বন্ধে ঐরূপ অনেক দৃঢ় সংস্কার আছে ইহা আমি জানি, কিন্তু তাহা হইলে দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক সম্প্রদায় সাধন-রাজ্যে কোন্ পথ গ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহারা কি সকলেই চিরজীবন কেবল তর্করাজ্যেই যে-কোন পথে সিংহবিক্রমে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন? নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও প্রাচীন সাধনপদ্ধতির সংবাদ না জানিলে এ বিষয়ে কোন কথা বলা যায় না।

বস্তুতঃ নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ও ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে পরমেশ্বরে দাস্যভাবসম্পন্ন। খৃঃ দশম শতকে সুপ্রসিদ্ধ মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের পঞ্চম স্তবকের শেষে ভগবদ্‌গীতার "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী

মাং নমস্কুরু" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ভক্তি পথের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। পরে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক দাস্যভাবে জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকটে করুণাপ্রার্থী হইয়া বলিয়াছেন—"অস্মাকন্তু নিসর্গ সুন্দর! চিরাচ্চেতো নিমগ্নং ত্বয়ি"...তন্নাথ! ত্বরিতং বিধেহি করুণাং।"

পরন্তু কুসুমাঞ্জলি-ব্যাখ্যাকার নবদ্বীপের নৈয়ায়িক হরিদাস তর্কাচার্য্য গ্রন্থারম্ভে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার করিতে বলিয়াছেন..."কোঽপি গোপতনয়ো নমস্যতে।" তাঁহার ঐ গ্রন্থের টীকাকার মহানৈয়ায়িক রাধামোহন বিদ্যা-বাচস্পতি গ্রন্থারম্ভে সুন্দরভাবে লিখিয়াছেন, "শিশুরসি দুগ্ধমুখঃ স্মরসি মুরলীংকুতোঽতিচিত্রং। ইতি গোপীস্মিত-বচনৈঃ সুস্মিতবদনো হরিঃ পাতু।" নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ মহানৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ গ্রন্থারম্ভে লিখিয়া দেন "নত্বা কৃষ্ণপাদদ্বন্দ্বং।" আর নবদ্বীপের বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের "ভাষা পরিচ্ছেদ" যাহা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত, প্রথম পাঠ্য গ্রন্থ—তাহার প্রথমে তিনি মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন, "গোপ-বধূটী দুকূলচৌরায় তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায়।"

পূর্ব্বে ন্যায়শাস্ত্র পাঠারম্ভে অধ্যাপকগণ প্রথম দিনেই ছাত্রদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধামে মধুর লীলার রহস্য বুঝাইতেন। নচেৎ বিশ্বনাথের উক্ত শ্লোকে "গোপবধূটী-দুকূলচৌরায়" এই পদের প্রয়োজন বুঝা যায় না। বিশ্বনাথ পরে "ন্যায়সূত্রবৃত্তি"র প্রারম্ভে প্রথম শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবধূসঙ্গে মধুর লীলার স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে প্রেম-ভক্তির প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন,—"স কোঽপি প্রেমানং প্রথয়তু মনোমন্দিরচরস্ত্রিলোকীলোকানাং সজলজলদশ্যামল-তনুঃ।" এইরূপ আরও কত নৈয়ায়িক গ্রন্থকার যে নিজ গ্রন্থে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার বর্ণন করা এখানে সম্ভব নহে।

বস্তুতঃ চিরকাল হইতেই বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক। প্রেমাবতার ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির প্রচারের পূর্ব্বেও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সুবিখ্যাত শিষ্য নব্যন্যায়-প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলায় গিয়া কোন কারণে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক কৃষ্ণভক্তির গর্ব্ব প্রকাশ করিতে বলিয়া-ছিলেন—"**কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে।**"

যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ে বিমানবাবুর অনুমানের পরীক্ষা করা আবশ্যক। বিমানবাবুর অনুমান আমি এইরূপ বুঝিয়াছি যে, যেহেতু শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে ভক্ত করিয়া ছিলেন—অতএব তিনি পূর্ব্বে ভক্তি পথের পথিক ছিলেন না। কারণ ভক্তকে ভক্ত করায় শ্রীচৈতন্যের মহিমা কোথায়? অতএব বৃন্দাবনদাস যে সার্ব্বভৌমকে পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরমবৈষ্ণব বলিয়াছেন, উহা সত্য হইতে পারে না।

এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে বিমানবাবু চরিতা-মৃতকার কবিরাজ গোস্বামীর কথা মানিয়া লইয়াই তাঁহার কথার সত্যতা সমর্থন করিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার উক্তরূপ অনুমানের হেতু সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ শ্রীচৈতন্য-দেবই যে প্রথমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ভক্তি পথের পথিক করিয়াছিলেন, ইহা বৃন্দাবনদাস বলেন নাই। বৃন্দাবন-দাসের কথাই সত্য? অথবা, কবিরাজ গোস্বামীর কথাই সত্য? এইরূপ সংশয়ই বিচারের অঙ্গ। সুতরাং ঐ রূপ সংশয় মূলক বিচারে পূর্ব্বেই কবিরাজ গোস্বামীর কথা মানিয়া লইয়া ঐরূপ কথা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে ফলে ইহাই বলা হয় যে, যেহেতু চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে ভক্ত করিয়াছিলেন, অতএব বৃন্দাবনদাসের কথা সত্য হইতে পারে না।

এইরূপ বিমানবাবু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত-পরিবর্ত্তনের কথা লিখিয়া তাঁহার অনুমানের যে হেতুর সূচনা করিয়াছেন, সেই হেতু সিদ্ধ করিতেও পূর্ব্বেই কবিরাজ গোস্বামীর কথাই মানিয়া লইতে হইবে। কারণ বৃন্দাবনদাসের মতে ঐ হেতু সিদ্ধ নহে। অতএব উক্ত বিচারে বৃন্দাবনদাসের পক্ষগ্রাহী প্রতিবাদী বলিবেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব বেদান্ত বিচারের দ্বারা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত-পরিবর্ত্তন করেন নাই। কারণ তাহা আবশ্যকই হয় নাই। সার্ব্বভৌম পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি মায়াবাদী বৈদান্তিক ছিলেন না। পরে তিনি শ্রীচৈতন্য-দেবের ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরক্ষণেই তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন। তাহাতে একদিনের ঐ ঘটনাই যথেষ্ট।

ফল কথা, অনুমান স্থলে বাদীর কথিত যে হেতু প্রতিবাদীর মতে অসিদ্ধ বা বিবাদগ্রস্ত, তাহাও প্রকৃত হেতু

হয় না। উহা "অন্যতরাসিদ্ধ" নামক হেত্বাভাস। আর যেহেতু সন্দিগ্ধ, তাহাও "সন্দিগ্ধাসিদ্ধ" নামক হেত্বাভাস।

পরন্তু নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে অভক্ত থাকিলে তিনি কিরূপ অভক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার অভক্তের লক্ষণ কি, ইহাও বিচার করা আবশ্যক। তিনি কি পূর্ব্বে বৈষ্ণববিদ্বেষী ছিলেন, অথবা, তিনি কি ভক্তি শাস্ত্রের কোন কথাই জানিতেন না বা মানিতেন না? অথবা তিনি ৺জগন্নাথ বিগ্রহও মানিতেন না?

কিন্তু "চরিতামৃত"কার কবিরাজ গোস্বামীই মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রথমে বর্ণন করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব ৺পুরীধামে গিয়া জগন্নাথ মন্দিরে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তৎকালে জগন্নাথ দর্শনার্থ উপস্থিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার ঐ অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত ও বিস্মিত হন। তখন—

"বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণ প্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ॥১০
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক এই—নাম যে প্রলয়।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সুদীপ্ত ভাব হয় ॥১১
অধিরূঢ় ভাব যার তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার ॥"১২

উদ্ধৃত পয়ারে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণিত কৃষ্ণ-প্রেমের সাত্ত্বিক বিকার এবং তাহাতে 'সুদীপ্ত', 'প্রলয়' ও অধিরূঢ় ভাব—যাহা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ববেত্তা না হইলে বলা যায় না। পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবকে সেই অবস্থাতেই সাদরে নিজগৃহে লইয়া যান। পরে—

"উচ্চ করি করে সভে নাম সংকীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হৈল চেতন ॥৩৬
হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরি হরি' বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম লৈল তাঁর পদধূলি ॥"৩৭

পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বহু ভক্তি ও সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করাইয়া তাঁহার সঙ্গী ও নিজের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্যকে নবীন সন্ন্যাসীর পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইনি নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র এবং নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র। ইহাঁর পূর্ব্বাশ্রমের নাম বিশ্বম্ভর। তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলেন যে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী এবং মিশ্র পুরন্দরও (জগন্নাথ মিশ্রও) আমার পিতার মান্য ছিলেন। অতএব পিতার সম্বন্ধে তাঁহারা উভয়েই আমার পূজ্য। পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপের সম্বন্ধবশতঃ পরম সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে বলিয়াছিলেন—

"সহজেই পূজ্য তুমি আরে ত সন্ন্যাস।
অতএব জান হ তুমি আমি নিজ দাস ॥"৫৫

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি প্রথমেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ঐরূপ উক্তি কি তাঁহার পরমবৈষ্ণবোচিত দীনভাবের পরিচায়ক নহে? বৈষ্ণব ভক্তগণই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—"তদ্দাসদাসদাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পরেও বলিয়াছেন—"মহাভাগবত হও চৈতন্য গোসাঞি।" কিন্তু যিনি অবৈষ্ণব, তিনি কি ঐরূপ 'মহাভাগবতে'র লক্ষণ বুঝিতে পারেন? আর বৈষ্ণব বিদ্বেষী হইলে তিনি কি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে পারেন? আর সার্ব্বভৌম মায়াবাদী বৈদান্তিক হইলে প্রথমেই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর ঐরূপ পূজা করিতে পারেন কি না, ইহাও চিন্তনীয়।

সত্য বটে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাই যদি তাহার অভক্তের লক্ষণ বলিতে হয়, তাহা হইলে বৃন্দাবনদাসের মতেও তিনি পূর্ব্বে অভক্তই ছিলেন। পরে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাসপূর্ব্বক তখন হইতে সেইভাবেই তাঁহার ভক্ত হইয়াছিলেন। অতএব বিমানবাবুর ঐ হেতুর দ্বারাও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার অসত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ ঐ হেতু বৃন্দাবনদাসের কথারও বিরুদ্ধ হয় না। অবশ্য যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের তৎকালে ষড়্ভুজ বা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ বিশ্বাস করিবেন না, তাঁহাদিগের নিকটে ঐ সমস্ত কথা বলা যায় না। কিন্তু বিমানবাবু সে কথার কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

পরন্তু পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিবার প্রকৃত হেতু কি, ইহাও বিচার করা আবশ্যক। কবিকর্ণপুর বর্ণন

করিয়াছেন যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রবিচারে পরাভবের পরেই তজ্জন্য অতি বিস্ময়প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তদেষ কৃষ্ণঃ খলু নান্যথৈব।" (মহাকাব্য—১২।৩১) কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কি তখন ইহাও মনে করিতে পারেন না যে, এই সন্ন্যাসী কোন বাক্‌স্তম্ভন মন্ত্রপ্রয়োগে আমাকেও নির্ব্বাক্ ও স্তম্ভিত করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ভারতে কত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত কত স্থানে কত তার্কিকসিংহকে পরাস্ত করিলেও তাঁহারা ত তখন সেই দিগ্‌বিজয়ীকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মনে করেন নাই।

কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনানুসারে বুঝা যায় যে, সার্ব্বভৌম পরে শ্রীচৈতন্যদেবের মুখে "আত্মারামাশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকের বহু প্রকার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল উক্ত শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াই যে তখনই সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়াই নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ইহা সকলে বিশ্বাস করিতে পারেন না। বৃন্দাবনদাসও কিন্তু তখনও সার্ব্বভৌমের সংশয় ব্যক্ত করিয়াই বর্ণন করিয়াছেন—

"আখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত।
মনে গণে এই কিবা ঈশ্বর বিদিত ॥" অন্ত্যখণ্ড ৩য় অঃ

বিমানবাবুর শেষ কথা এই যে, "সার্ব্বভৌম উদ্ধারের সময় নিত্যানন্দ প্রভু কাছে বসিয়া ছিলেন না।" কিন্তু তিনি তখন কোথায় ছিলেন, ইহাও ত বলা আবশ্যক। তিনি কি তখন দূর দেশেই চলিয়া গিয়াছিলেন? কিন্তু আমরা জানি, তিনি তখন মহাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যান নাই। আর যাঁহারা তখন সার্ব্বভৌমের গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ যে পরে কবিকর্ণপুরের নিকটে সেই বেদান্ত-বিবাদাদির কথা যথাযথ বর্ণন করিয়াছিলেন, এ বিষয়েও ত কোন প্রমাণ নাই। তাহা হইলে কবিকর্ণপুর তাহা লিখিয়া যাইবেন না কেন? নিজের কথার মূলভূত প্রমাণের স্পষ্ট উল্লেখ না করিবার হেতু কি? "চরিতামৃত" গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামীও ত উক্ত স্থলে তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ করেন নাই।

কিন্তু বৃন্দাবনদাস আদিকাণ্ডে (৫ম পঃ) লিখিয়া গিয়াছেন,—"আপনে কহিয়া আছেন, ষড়্ভুজ দর্শনে।" অর্থাৎ নিত্যানন্দ প্রভু যে কোন সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পরে তিনি নিজেই তাঁহার প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনদাসকে বলিয়াছিলেন। তাহা হইলে তিনি ৺পুরীধামে শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরমবৈষ্ণব সার্ব্বভৌমের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের মিলনকালের সেই সমস্ত বার্ত্তাও নিত্যানন্দদাসকে বলিতে পারেন—যাহা পরে নিত্যানন্দ-দাস পূর্ব্বোক্তরূপে লিখিয়া গিয়াছেন।

পরন্তু উক্ত বিষয়ে অনুমান দ্বারা কবিকর্ণপুর ও কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনাকেই সত্য বলিয়া নির্ণয় করিতে হইলে এইরূপ অনুমানকেও আশ্রয় করিতে হইবে যে, ৺পুরীধামে সার্ব্বভৌম গৃহে কয়েক দিন পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে শঙ্করমতানুসারে সার্ব্বভৌমের বেদান্ত ব্যাখ্যা ও পরে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার তুমুল বিচার ও পরে তাঁহার পরাভব প্রভৃতি যে গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা নিত্যানন্দ প্রভু কাহারও নিকটে কিছুমাত্র শুনেন নাই, অথবা শুনিলেও তিনি পরে কখনও তাঁহার প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনদাসকেও তাহা বলেন নাই। কিন্তু ঐরূপ অনুমানেও বিশুদ্ধ হেতু আবশ্যক।

ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে বিমানবাবুর অনুমান, অনুমান-প্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হয় না। আর ঐভাবে অনুমান করিলে অনেকে অন্যরূপ অনুমানও করিতে পারেন। বিমানবাবু যেমন অনেক স্থলে বিচারপূর্ব্বক কবিরাজ গোস্বামীর কথাও গ্রহণ করেন নাই; তদ্রূপ অনেকে তাঁহার কথা গ্রহণ না করিয়া স্বাধীনভাবে এইরূপও অনুমান করিতে পারেন যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রবিচারে শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইতে পারেন না। যেহেতু তিনি তৎকালে অপরাজয়ী মহানৈয়ায়িক ও মহাবৈদান্তিক ছিলেন। শঙ্করের মতানুসারে 'বিবর্ত্তবাদ' সমর্থনে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের নানা গ্রন্থের সমস্ত কথাই তিনি অবশ্য জানিতেন। অদ্বৈতবাদী শ্রীহর্ষের "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে"ও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল সন্দেহ নাই। পরন্তু বেদান্ত-বিচারে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের কোন্ কথার প্রতিবাদ করিতে কি বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ উভয়পক্ষে যথানিয়মে কিরূপ বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল, ইহা কবিরাজ গোস্বামীও কিছুই বলে নাই। কিন্তু উভয়পক্ষের সমস্ত কথা না জানিলে সে বিচারে কাহারও জয়-পরাজয় নির্ণয় করা যায় না।

আর সাত্ত্বিকবুদ্ধিসম্পন্ন অনেকে এইরূপ অনুমান করিতে পারেন যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত কোন বিচারই করেন নাই। যেহেতু শ্রীচৈতন্যদেবের সেই মনোমোহিনী প্রেমমূর্ত্তি দর্শন করিলে তখন তাঁহাকে বিচার দ্বারা পরাভূত করিবার ইচ্ছা কাহারই জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বেই তাঁহার দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পদধূলিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ দীন বৈষ্ণবসেবক পরে শ্রীচৈতন্যদেবকে নিজগৃহে 'বিতণ্ডা'র দ্বারা আক্রমণ করিতে পারেন না। পরন্তু প্রেমাবতার ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবেরও তৎকালে কাহাকেও পরাভূত করিবার ইচ্ছাই জন্মিত না। তাই তিনি ৺পুরীধামে গোবর্দ্ধন মঠে এবং ৺কাশীধামে শঙ্কর সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদিগের সহিত যথানিয়মে শাস্ত্রবিচার করেন নাই এবং শঙ্করাচার্য্য ও মাধ্বাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় নিজ মত সমর্থক গ্রন্থ রচনাও করেন নাই।

এইরূপ অনেকে স্বাধীনভাবে আরও অনেক প্রকার অনুমান করিতে পারেন এবং কবিকর্ণপূর ও কবিরাজ গোস্বামী কেন ঐরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহারও উদ্দেশ্য-বিশেষের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু উক্তরূপে কোন অনুমানের দ্বারা যে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে প্রকৃত সত্য নির্ণয় হইতে পারে, ইহা আমি বুঝি না। আমি বুঝি যে বিমান-বাবু অনুমানদ্বারা সত্যনির্ণয়ের যে পথ দেখাইয়াছেন, সেই পথ ধরিয়া কিছু দূরে গেলে সহসা কোন অনুমান করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া আসা যায়। কিন্তু ঐ পথ ধরিয়া বহু দূরে গেলে পরে অজ্ঞানের ঘনান্ধকারে দিশেহারা হইয়া সেখানেই বসিয়া পড়িতে হয়। কিন্তু সেই সুদূর বহু দূরে অনেকেই যাইতে চাহেন না। (ক্রমশঃ)

আনন্দ

শ্রীমানকুমারী বসু

তুমি যে আনন্দময়ী ওমা বিশ্ব জননি !
যতই পেয়েছি ব্যথা ও কথা যে ভুলিনি !
কতই আনন্দ মাগো, দিয়েছ এ ধরাতে,
হোক শত নিরানন্দ—অভাগার বরাতে !
যখন জলদ আসে সাথে নিয়ে বিজলী,
ঘুমানো আনন্দ ওঠে হিয়া মাঝে উছলি !
ঝম্ ঝম্ বারি পড়ে দিশাহারা অবনী,
আকুল আনন্দ-ধারা ছোটে যেন অমনি !
"বউ কথা কও" ডাকে নীলাকাশে ঘুরিয়া,
অজানা আনন্দ রহে সে ব্যথায় ভরিয়া !
উষার অরুণ-রথে উদিলে তরুণ রবি,
আনন্দের শিহরণে মরতে যে জাগে সবি।
শরত-আকাশে রহে তারা শশী ফুটিয়া
জ্যোছনা আনন্দ-বন্যা, বিশ্ব যায় ভাসিয়া !
বসন্তের ফুলবন মধু মাখা অনিলে,
আনন্দ উথলে—আরো কলকণ্ঠ গাহিলে।
সমুদ্র ভূধর ভীম, নিরজন কান্তারে,
আনন্দ জাগাতে নিতি প্রকৃতির বাহারে ?
অনাথ বালক ডাকে 'মা' বলিয়া দুয়ারে
ব্যথীর আনন্দ সে যে—আয় আয় বাছারে !
রোগী, শোকী, ক্ষুধাতুর, পিপাসীর পিপাসা
জুড়াইতে কি আনন্দ, দরিদ্রের দুরাশা !
যে আমারে ছেড়ে গেছে—দেখা যদি দেবে না,
শান্তির আনন্দ সে তো ভব-জ্বালা পাবে না !
হারিয়েছি সোনামুখ পাই যদি ফিরিয়া
সে দিনে আনন্দভরে বুক যাবে ছিঁড়িয়া !

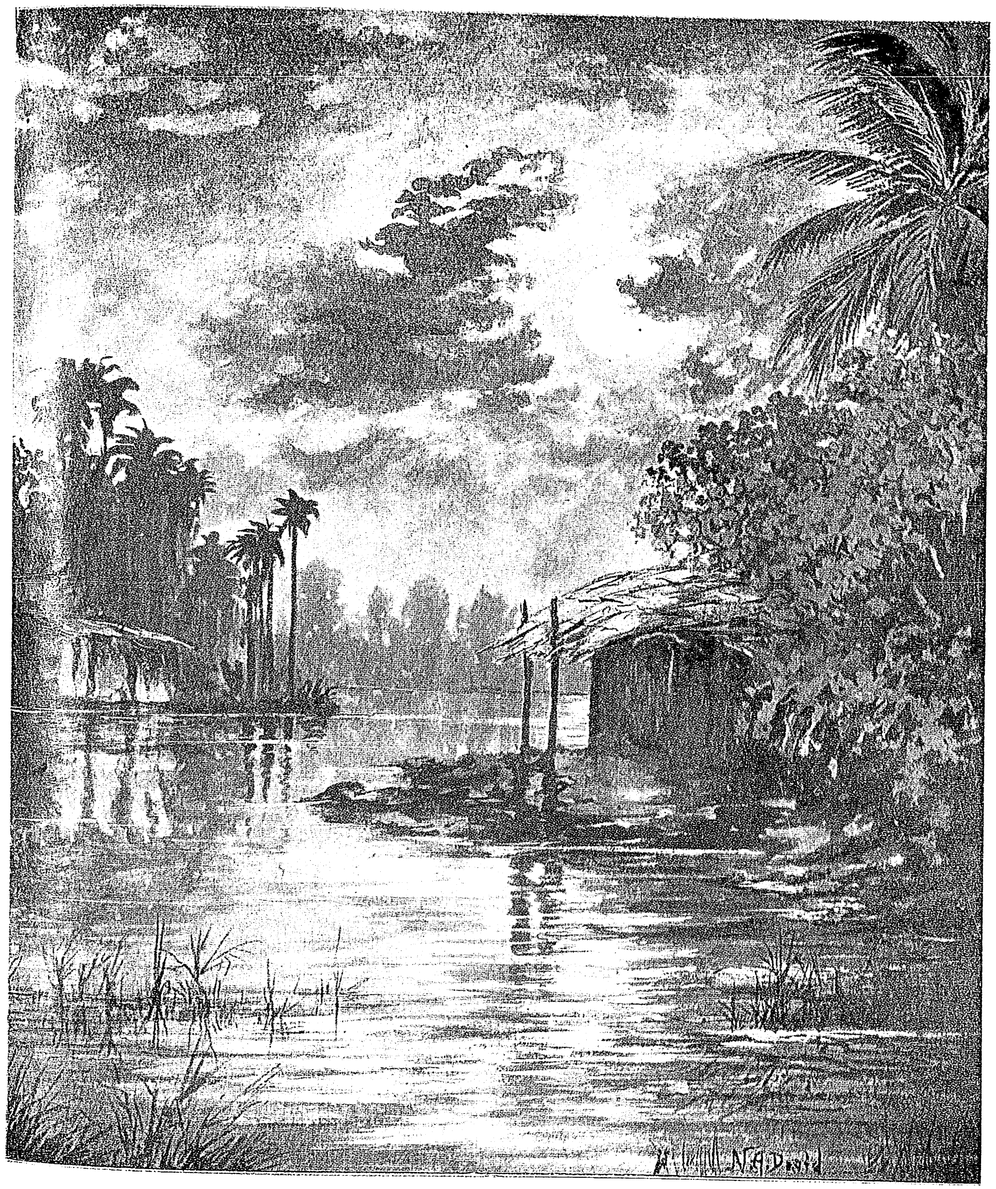

বর্ষার চাঁদিনী

পরিকল্পনা—শ্রীযুক্ত মিহিরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী—মিষ্টার এন এ ডেভিড

জঙ্গম

'বনফুল'

৬

সেদিন সকালে শঙ্কর যখন বোস সাহেবের বাড়ি গেল তখন সবে সাতটা বাজিয়াছে।

বোস সাহেব লোকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—তিনি রেলে চাকরি করেন, শঙ্করের বাল্যসখী শৈলর স্বামী এবং সাহেবিভাবাপন্ন। সাহেবিয়ানার নানা বাধা সত্ত্বেও তিনি সাহেবিয়ানা পরিত্যাগ করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব যুক্তিবান মতামত আছে এবং সে মতামতগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে অসঙ্গত বলিয়াও মনে হয় না। বোস সাহেব বাড়িতেও সাহেবি পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন, আহারাদিও সাহেবি কেতায় টেবিল চেয়ারে প্লেট-কাঁটা-চামচ-সহযোগে সম্পন্ন হয়, তাঁহার খাস বাবুর্চি তাঁহার জন্য বাহিরে পৃথকভাবে সাহেবি খানা প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং তাঁহার আহারাদি বাহিরের ঘরেই নিষ্পন্ন হয়। বোস সাহেবের অন্দর মহলের সহিত সম্পর্ক কম। তাঁহার নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি তিনি বাহিরের ঘরে বিভিন্ন আলমারিতে নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়াছেন। স্নান করিবার সময় সাবান বা জামা পরিবার সময় বোতামের জন্য হাঁকাহাঁকি করিয়া তিনি বাড়িসুদ্ধ সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা পছন্দ করেন না। এ সকল বিষয়ে তিনি স্বাবলম্বী ও স্বাধীন।

শঙ্কর গিয়া শুনিল তিনি প্রাতরাশে বসিয়াছেন। বাহিরে দণ্ডায়মান চাপরাশির মারফত নিজের আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিতেই বোস সাহেব তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বোস সাহেবের ধপধপে ফরসা রঙ। শক্ত কফ-কলারওয়ালা ঘোর নীল রঙের শার্টটি তাঁহাকে মানাইয়াছিল ভালো। কোলের উপর একটি সাদা ন্যাপকিন প্রসারিত, খাবার পড়িয়া পরিচ্ছদ যাহাতে নষ্ট না হইয়া যায়। শঙ্করকে দেখিয়া তিনি স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন, এই যে, এত সকালে কি মনে করে? বসুন বসুন!

তাঁহার প্রত্যেক কথাটি প্রয়োজন মাফিক ওজন করা। এত কৃত্রিমতা পূর্ণ যে মনে হয়, যেন প্রত্যেক কথাটি কহিবার পূর্ব্বে সেগুলির মুখ মুছাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেছেন। পুনরায় স্মিতমুখে বলিলেন, বসুন না ওই সামনের চেয়ারটাতে!

আসন গ্রহণ করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, একটু দরকার আছে আপনার সঙ্গে—

অর্থাৎ?

পাঁউরুটির একখানা টোস্ট্ বাঁ হাতে ধরিয়া কামড়াইতে কামড়াইতে বোস সাহেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন।

অর্থাৎ ভন্টুর মেজকাকার জন্যে এসেছি। পারেন ত তার চাকরিটা আবার করে দিন। বেচারিদের বড় কষ্ট! ভন্টুকে সংসারের জন্যে লেখাপড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে!

এই বলিয়া শঙ্কর ভন্টুদের দুর্দ্দশা, ভন্টুর দাদার অসুখ প্রভৃতির যথাযথ বর্ণনা করিয়া বোস সাহেবের করুণা উদ্রেক করিবার প্রয়াস পাইল।

ভন্টুর মেজকাকার কথা শুনিয়া বোস সাহেব চা-পাঁউরুটি-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, এক্স্‌কিউজ মি, হি ইজ এ হোপলেস্ চ্যাপ্!

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ।

তাহার পর বোস সাহেব বলিলেন, নিন এক কাপ চা খান—বলিয়া তিনি নিজেই উঠিয়া দেওয়াল আলমারি হইতে একটি পেয়ালা বাহির করিলেন এবং টি পট্ হইতে চা ঢালিয়া শঙ্করকে দিলেন।

আর কিছু খাবেন? টোস্ট কি বিস্কুট? ডিম খাবেন?

না।

শঙ্কর নীরবে চা-পান করিতে লাগিল।

একটি হাফ্‌বয়েল্ড ডিম নিপুণভাবে ভাঙিতে ভাঙিতে বোস সাহেব বলিলেন, দেখুন শঙ্করবাবু, পারসোনালি স্পিকিং, ভন্টুর মেজকাকার মত লোকের উপর আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই! আই উড্ লাইক্ টু কিক্ আউট্ সাচ্ ফেলোজ্ ফ্রম মাই অফিস। আই অ্যাম্ স্পিকিং ফ্র্যাঙ্কলি, এক্স্‌কিউজ্ মি!

বলিয়া তিনি সাহেবি কায়দায় স্কন্ধযুগলকে ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইলেন।

শঙ্কর কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিল।

বোস সাহেব আবার বলিলেন, আপনাকে আমি যতদূর জানি তাতে ওরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের ওপর সিম্‌প্যাথি হওয়ার কথা ত নয় আপনার!

শঙ্কর চায়ে একটা চুমুক দিয়া মৃদু হাসিল এবং বলিল সত্যিকার সিম্‌প্যাথি হতভাগাদেরই ওপর হওয়া উচিত!

বাধা দিয়া বোস সাহেব বলিলেন, এ ত হতভাগা ঠিক নয়, এ একটা 'রোগ্'—

বিশেষ তফাৎ ত চোখে পড়ছে না!

বলিয়া শঙ্কর একটু মিনতির কণ্ঠেই বলিল, আমার নিজের বড্ড কষ্ট হয় ভন্টুটার জন্যে! ওদের বাড়ির সব অবস্থা জানি কি না আমি, ওর দাদা হাফ্ পে-তে ছুটি নিয়ে চেঞ্জে গেছেন—সংসার চলা দায়। আপনি যদি ভন্টুর মেজকাকার চাকরিটা করে দেন তাহলে ভন্টুর লেখাপড়াটা হয়!

এই বলিয়া সে নীরব হইল। যদিও পরের জন্য তথাপি ইহা লইয়া আর বেশী অনুরোধ করিতে শঙ্করের কেমন যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল। তাহার কেমন যেন সহসা মনে হইল, নিজের উচ্চপদের সুযোগ লইয়া বোস সাহেব যেন তাহাকে একটু কৃপামিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। মনে হইবামাত্র শঙ্করের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। বোস সাহেব বলিলেন, এখন দেবার মত কোন চাকরিও আমার হাতে নেই!

শঙ্কর নীরবেই রহিল। তাহার পর সহসা বলিল, আমার যা বলবার তা ত বললাম এখন আপনার যদি কিছু করবার থাকে করুন।

বোস সাহেব আর এক পেয়ালা চা ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, কিছুদিন পরে একটা কম্‌পিটিটিভ্ পরীক্ষা করে কতকগুলি লোক নেওয়ার কথা আছে। ভন্টুর মেজ-কাকাকে বলুন না তাতেই য়্যাপ্লাই করতে! আই মে সিলেক্ট হিম্, লেট্ হিম্ টেক্ এ চান্স!

আচ্ছা, বোলব তাই। ধন্যবাদ! চলি তাহলে? নমস্কার!

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। দ্বারের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় বাচ্চা গোছের একটা চাকর ভিতর দিক হইতে আসিয়া বলিল, মাঈজি একবার ডাকছেন আপনাকে ভেতরে!

এখন আমার সময় নেই, পরে আসব।

অকারণে রাগ করিয়া শঙ্কর হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রতীক্ষমানা শৈল চাকরের মুখে এই বার্তা শুনিয়া সামান্য একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ও—আচ্ছা!

৭

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভন্টু আসিয়া হাজির হইল।

তাহার সহিত দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ পাতলা ছিপছিপে আর একটি ভদ্রলোকও ছিলেন। শঙ্কর ইঁহাকে পূর্ব্বে দেখে নাই। দেখিবামাত্র কিন্তু আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তীক্ষ্ণ নাসা, ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রশস্ত উন্নত ললাট, ধপধপে ফরসা রঙ্। মাথার চুলগুলা পর্য্যন্ত ঈষৎ কটা। দেখিলেই মনে হয় যেন একটা শিখা। ভন্টু পরিচয় করাইয়া দিল।

ইনি হচ্ছেন ক্যান্‌ড্‌ল্ অর্থাৎ মোমবাতি—আর ইনি হচ্ছেন চাম লদ্, চাম গ্যান্‌ডও বলতে পার!

শঙ্কর প্রতিনমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিল, মোমবাতি?

আগন্তুক ভদ্রলোক মৃদু হাস্য সহকারে বলিল, ভন্টুর কথা ছেড়ে দিন, মোমবাতি আমার নাম নয়, আমার নাম মৃন্ময়—মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়।

ভন্টু অকারণে মুখ বিকৃতি করিয়া তাহার দিকে তাকাইল।

শঙ্কর বলিল, অমন করে তাকাচ্ছিস্ কেন? গাধা কোথাকার!

ভন্টুর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার পর মৃন্ময়কে বলিল, তুই যেখানে যাচ্ছিলি যা, আমার এখানে দেরি হবে এখন একটু। বোস্ না একটু লদ্‌কালদ্‌কি করা যাক—

মৃন্ময় হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিল, না আমায় যেতে হবে, এমনিই দেরি হয়ে গেছে দেখছি—

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, আমি যাই তাহলে। পরে আলাপ হবে। আপনার নামটা নিশ্চয়ই চামলদ্ নয়—

ভন্টু পুনরায় মুখবিকৃতি করিল।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, না আমার নাম শঙ্কর-সেবক রায়।

আচ্ছা, নমস্কার!

মোমবাতি চলিয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, অদ্ভুত চেহারা ভদ্রলোকের! যেন জ্বলছে।

ওই জন্যেই ত ওর নাম আমরা দিয়েছি মোমবাতি! সাংঘাতিক চাম গ্যান্‌ডঅ—

এমন সময় হস্টেলের চাকরটা কিছু জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল। শঙ্কর বলিল, তুই আপিস থেকে আসচিস্ ত? খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই খুব! নে, খা—

ভন্টু তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া শঙ্করের পায়ের ধূলা লইয়া ফেলিল। শঙ্কর পা-টা সরাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—চা খাবি, না, কোকো?

ভন্টু সোৎসাহে বলিল—দুইই খাব।

চাকরটা খাবার রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শঙ্কর তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, দু কাপ চা আর এক কাপ কোকো দিয়ে যা চট্ ক'রে।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

ভন্টু আহারে প্রবৃত্ত হইল—

সিঙাড়ায় একটা কামড় দিয়া ভন্টু বলিল, বাবাজীর সম্বন্ধে কি ডেটেল্ করলি, বল সব! বোস সাহেবের ওখানে গিয়েছিলি? হ'ল কিছু?

পরে বলব এখন, অনেক কথা আছে!

মানে?

শঙ্কর কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল এমন সময় "শঙ্কর-দা, আপনিই বলুন ত, ট্র্যাজেডি বড় না কমেডি বড়" বলিয়া একটি ছোকরা চটি ফট্‌ফট্ করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একজন। উভয়েরই হস্তে চায়ের পেয়ালা।

হস্টেলে শঙ্করের একটি দল আছে। যুবকদ্বয় সেই দলভুক্ত। ইহাদের মধ্যে একজন ভন্টুকে দেখিয়া বলিল "এই যে ভন্টু-দা, আপনাকে আজকাল কলেজে ত দেখি না।

সিঙাড়া চিবাইতে চিবাইতে ভন্টু উত্তরে শুধু একটু হাসিল।

শঙ্কর বলিল, হঠাৎ এখন ট্র্যাজেডি-কমেডির কথা কেন?

একজন যুবক বলিল, কুমুদবাবু নীচের ঘরে খুব লেকচার ঝাড়ছেন যে কমেডিই হল শ্রেষ্ঠ জিনিষ!

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, তাই নাকি?

যুবকটি বলিল, ওঃ, নীচে মহা আস্ফালন লাগিয়েছেন কুমুদবাবু। তিনি বলছেন ট্র্যাজেডি হচ্ছে নগ্ন সত্য। সাহিত্যে নগ্ন সত্যের স্থান নীচে। সাহিত্যে আমরা চাই আনন্দ—কমেডিই নির্ম্মল আনন্দ দিতে পারে। ট্র্যাজেডি তা পারে না।

শঙ্কর ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিল, কে বললে পারে না! তবে ট্র্যাজেডির মধ্যে আনন্দ পেতে হলে মনটাও সেই রকম হওয়া দরকার। উঁচু দরের রসিক না হলে ট্র্যাজেডির রসাস্বাদন করতে পারে না।

আসুন না আপনি একবার নীচে—

ভন্টু, তুই একটু বোস্—আমি আসছি এক্ষুনি।

শঙ্কর চলিয়া গেল। ভন্টু সাহিত্যরসের ধার ধারে না। তাহার ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে গোগ্রাসে খাইতে লাগিল। ভৃত্য যথাসময়ে চা ও কোকো আনিল। শঙ্কর কুমুদবাবুর ঘরে গিয়াছে শুনিয়া তাহার চা-টা সেখানেই সে লইয়া গেল।

শঙ্কর ফিরিয়া আসিল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। আসিয়া দেখিল ভন্টু অকাতরে ঘুমাইতেছে। জুতাসুদ্ধ পা চেয়ারের হাতলের উপর তুলিয়া দিয়া, গুটানো বিছানা-স্তূপের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া ভন্টু নিদ্রিত। দক্ষিণ বাহু দিয়া মুদিত চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যেও ভন্টু ঘুমাইতেছে!

শঙ্কর খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। বেচারা! আপিসের সারাদিন-ব্যাপী হাড়ভাঙা খাটুনিতে বেচারি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অত্যন্ত ক্লান্ত না হইলে এমনভাবে কেহ ঘুমাইতে পারে না।

এই ভন্টু ওঠ্—ওঠ্! ঘুমুচ্ছিস কেন এই অসময়ে!

ভন্টু জুতাসুদ্ধ পা টা মৃদু মৃদু নাচাইতে লাগিল। তাহার পর চোখ হইতে হাতটা সরাইয়া বলিল—খেপেচিস্? ঘুমোব কেন? থিঙ্ক্ করছিলাম!

চল বেরোনো যাক্—

চল। বাবাজীর সম্বন্ধে কি সেট্‌ল্ করলি ?

চল রাস্তায় সব বলছি।

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল।

৮

কীর্ত্তন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল।

ভন্টুর মেজকাকা অর্থাৎ বাবাজী খোল বাজাইতেছিলেন। মুদিতনেত্র, তন্ময়, বিহ্বলভাব। পরিধানে গৈরিক আল্‌খাল্লা, মাথায় অবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশভার, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুগুম্ফসমাচ্ছন্ন। কীর্ত্তন জমিয়াছিল বাবাজীরই এক বন্ধুর বাড়ীতে। তিনি বড়লোক এবং ভন্টুর মেজকাকাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। পুরাকালে অর্থাৎ যখন তাঁহার রক্তের তেজ ছিল তখন এই বাড়ির এই হলেই বহুবার বাঈনাচ হইয়া গিয়াছে। এখন কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মে মতি হইয়াছে এবং ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া যতপ্রকারে সঙ্গীত-উৎসব করা সঙ্গত তাহাই তিনি ইদানিং করিতেছেন। অর্থাৎ আসলে ভদ্রলোক সঙ্গীত-অনুরাগী। গীতবাদ্যে পারদর্শিতার জন্যই সম্ভবত তিনি ভন্টুর মেজকাকাকে স্নেহ করেন। যাই হোক—কীর্ত্তন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। কীর্ত্তনিয়া পুরুষ হইলেও সুদর্শন ও সুকণ্ঠ। গৌর ললাটে চন্দনের তিলক, গলায় বেলফুলের শুভ্র মালা, পরিধানে পট্টবস্ত্র—ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। সুরসমারোহে সকলেই সম্মোহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে কীর্ত্তনিয়ার মুখের পানে চাহিয়াছিলেন। হলের মধ্যে ভীষণ ভিড়। ভন্টু ও শঙ্কর হলের বাহিরে বারান্দায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কীর্ত্তনের সুরে শঙ্করও কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দার একধারে স্বল্প অন্ধকারে একটি বেঞ্চি পাতা আছে দেখিয়া শঙ্কর ধীরে ধীরে গিয়া তাহারই উপর উপবেশন করিল। তাহা দেখিয়া ভন্টু মৃদুহাস্য করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—তুইও বসে পড়লি যে রে !

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

ভন্টু কোন জবাব না পাইয়া হাস্যদীপ্তচক্ষে শঙ্করের পানে চাহিয়া পুনরায় বলিল, কি রে, তুইও লদ্‌কে গেলি না কি ?

চুপ কর্—কথা বলিস্ না !

ভন্টু কপাল কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি তাহলে ততক্ষণ পেছনের চাকাটায় একটু পাম্প করে নি ! এইখানে কার একটা বাইকে পাম্প রয়েছে দেখছি, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়, কি বলিস্ !

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

ভন্টু গিয়া অসঙ্কোচে নিকটে দেওয়ালে ঠেসানো অপর একটি বাইকের পাম্পটি খুলিয়া লইল ও একটি থামের গায়ে নিজের বাইকটিকে দাঁড় করাইয়া উবু হইয়া বসিয়া পাম্প করিতে লাগিয়া গেল।

সেই স্বল্পান্ধকারে বেঞ্চির উপর বসিয়া বসিয়াই শঙ্কর কিন্তু স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। অদ্ভুত সে অনুভূতি ! তাহার মনে হইতে লাগিল যেন অশ্রুর বিরাট সাগর সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। তরঙ্গসমাকুল ফেনিল সমুদ্র। তাহাতে যেন কোটি কোটি রক্তকমল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কি সুন্দর কমলগুলি। এক একটি দল যেন আগুনের শিখা; ফেনিল নীল জলে গাঢ় রক্তবর্ণ অগ্নিকমলদল ফুটিয়া রহিয়াছে। মদির গন্ধে ও নিরুদ্ধ উত্তাপে বিশাল সমুদ্র উদ্বেলিত।

দেখিতে দেখিতে সমুদ্র মিলাইয়া গেল।···দিগন্তপ্রসারী জনহীন প্রান্তর। মৃদু জ্যোৎস্নায় গভীর রাত্রি স্বপ্নাতুর। প্রান্তরে কে যেন একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন কি খুঁজিতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী গভীর নিশীথিনীর অন্তরলোকে অসম্ভবের সম্ভাবনা আশায় কল্পনামুগ্ধ মূঢ় একা একাকে যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কে সে ! চেনা যায় না। প্রান্তরও অদৃশ্য হইল।···চতুর্দ্দিক অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে সঙ্কীর্ণ একটা গলি দেখা যাইতেছে। সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলি। দুই পার্শ্বে বড় বড় অট্টালিকা প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রহরীপরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গলিটি আঁকিয়া বাঁকিয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে কে জানে। সহসা অন্ধকার শিহরিয়া উঠিল। গলিটা কাঁদিতেছে। তাহার অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে অন্ধকার গুমরিয়া উঠিতেছে, নক্ষত্রকুল স্পন্দিত হইতেছে। কীর্ত্তনিয়া আবেগভরে গাহিয়া চলিয়াছে—"পাষাণ হইলে ফাটিয়া যেত !"

ভন্টুর কণ্ঠস্বরে শঙ্করের স্বপ্নভঙ্গ হইল।

পেছনের চাকাটা একেবারে দক্‌চে গেছে, হু হু শব্দে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে ! টায়ারটাই জখম হয়েছে, বুঝলি ?

শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, তাই নাকি, তাহলে উপায় !

প্রোটোটাইপের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই ! অরিজিনাল সম্ভবত এখন বাড়ি গেছে। এই ফাঁকে প্রোটোটাইপকে তিলিয়ে যদি কিছু হয় ! চল, তাই করা যাক, কেত্তনের এখন ঢের দেরি, বাবাজির নাগাল পাওয়া শক্ত !

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, প্রোটোটাইপ কে ?

আয় না তুই—

শঙ্করের মন তখনও স্বপ্নের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে নাই। তথাপি কিম্বা হয়ত সেইজন্যই বিনা বাক্যব্যয়ে সে ভন্টুর অনুসরণ করিল। তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এই লইয়া অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেও তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। তাই সে নীরবে অনেকটা যন্ত্রচালিতবৎ ভন্টুর পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল এবং এই চলমান অবস্থাতেও তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার শরীর যেন অত্যন্ত লঘু হইয়া গিয়াছে, সে যেন বাতাসে ভর করিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর সহসা ভন্টুর কনুইএর আঘাতে তাহাকে আবার কঠিন মাটিতে নামিয়া পড়িতে হইল।

তাহারা একটা গলিতে ঢুকিয়াছিল।

ভন্টু বলিল, দেখ্ দেখ্, ওরিজিনাল বসে আছে, মাটি করলে, দাঁড়া এইখানে একটু—

শঙ্কর ভন্টুর তর্জ্জনীনির্দ্দিষ্ট স্থানটায় দেখিল একটা সাইকেলের দোকান রহিয়াছে এবং দোকানের সম্মুখভাগে এককোণে চেয়ারে একব্যক্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ভদ্রলোকের পরিধানে একটি টাইট ফিটিং গলাবন্ধ চকোলেট্ রঙের সোয়েটার এবং খাকি হাফ্ প্যাণ্ট। পায়ে আজানু কপিশবর্ণের গরম মোজা এবং মস্তকে কানঢাকা কালো টুপি। ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া গড়গড়া হইতে ধূম্রপান করিতেছিলেন। ভন্টু চুপি চুপি বলিল, ইনিই হচ্ছেন ওরিজিনাল মিষ্টার ফাইভ্ !

মিষ্টার ফাইভ ? সায়েব না কি ?

সোনার বেনে ! থাম একটু বসা যাক এখানে কোথাও, ওরিজিনাল বাড়ি না গেলে সুবিধে হবে না। প্রোটোটাইপ্ এলেই ওরিজিনাল খসবে—আসবার সময় হয়ে গেছে অলরেডি !

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

ভন্টু পুনরায় বলিল, প্রোটোটাইপ আসে নি বলে ওরিজিনাল রেগে টং হয়ে রসে তামাক খাচ্ছে। কি রকম নাক দিয়ে ভর ভর করে ধোঁয়া ছাড়ছে—দেখ্—দেখ্—

শঙ্কর দেখিল।

ভন্টু আবার বলিল, দেরি আছে দেখছি, প্রোটোটাইপ্ ডুব মেরেছে আজ। একটু বসতে হবে এখানে কোথাও—নিকটেই একটি চায়ের দোকান ছিল। ভন্টু বাইকটা ঠেলিয়া লইয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইল। শঙ্করও পিছনে পিছনে গেল। চায়ের দোকানে খরিদ্দার কেহ ছিল না। যিনি দোকানের মালিক তিনি এককোণে চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া অপর একজন ওয়েস্টকোট-পরিহিত ব্যক্তির সহিত তন্ময় হইয়া পাশা খেলিতেছিলেন। দুইজনের মধ্যে একটি অয়েলক্লথ-পাতা টেবিল প্রসারিত। ভন্টু রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিল, তাহার পর বলিল, আসতে পারি দাদা ?

কোন উত্তর আসিল না।

ভন্টু তখন বাইকের ঘণ্টা বাজাইয়া তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

'কচে বারো—' বলিয়া ভদ্রলোক ভন্টুর দিকে তাকাইলেন। তাকাইবামাত্র ভন্টু সহাস্য মুখে আবার বলিল, আসতে পারি দাদা ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন আসুন—কি চান আপনারা ?

এই যে আসি, এসে বলছি—

ভন্টু বাইকটি সযত্নে দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিল এবং শঙ্করকে চোখের ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া বলিল, চল্, একটু বসা যাক্ ?

ভন্টু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভদ্রলোকের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। ভদ্রলোক ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

করেন কি, করেন কি মশায় আপনি !

ভন্টু হাত দুইটি জোড় করিয়া সহাস্য মুখে বলিল, অগ্রজ আপনি—বসুন, বসুন, কি চান আপনারা ?

একটু বসতে চাই শুধু দাদা, চা কিন্তু খাব না, পয়সা নেই ! একজনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে খানিকক্ষণ, যদি বসতে দেন একটু দয়া করে'—

ছতিন্ নয়!

ওয়েস্টকোট-পরা ভদ্রলোকটি দান ফেলিলেন এবং চকিতে এই আগন্তুকদ্বয়কে একনজর দেখিয়া লইয়া আবার পাশার ছকে মন দিলেন।

বেশ ত, বসুন না ওধারের বেঞ্চিটায়!

শঙ্কর বলিল, চা-ই দিন আমাদের, আমার কাছে পয়সা আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ খান না চা, পয়সার জন্যে কিছু আসছে যাচ্ছে না। এই চায়ের জন্যেই সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি মশয়, পয়সার দিকে দেখলে আজ এমন আবস্তা হত না আমার, কি বল মাস্টের!

ওয়েস্টকোট-পরিহিত ভদ্রলোক এতদুত্তরে কেবল বলিলেন—হ্যাঃ!

ওরে কেলো, চা দিয়ে যা, তুমি খাবে না কি আর এক কাপ মাস্টের—

মাস্টার দক্ষিণ তর্জ্জনীটি দক্ষিণ কর্ণে ঢুকাইয়া মুখ বিকৃতি করিয়া সজোরে বেশ খানিকক্ষণ কর্ণ-কণ্ডুয়ন করিয়া লইলেন। তাহার পর ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, দাও, আর একবার ইস্‌টিম্ করে নেওয়াই যাক্—

ভন্টু ও শঙ্কর একটু দূরে একটি বেঞ্চিতে উপবেশন করিয়াছিল। ভন্টু এমন স্থানটিতে বসিয়াছিল যেখান হইতে ওরিজিনালকে বেশ দেখা যায়।

দোকানের মালিক আবার হাঁকিলেন, ওরে কেলো, তিন কাপ্ চা দিয়ে যা—আচ্ছা চার কাপই আন্, আমিও খাই আর এক কাপ্, কি বল মাস্টের?

মাস্টার নীরবে সম্মুখের দন্তগুলি বিকশিত করিলেন।

এই চায়ের জন্যেই সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি মশয়, বুঝলেন, চা-কে আমি খেয়েছি, চা-ও আমাকে খেয়েছে!

ভন্টু এই কথা শুনিয়া সস্মিতমুখে তাঁহার পানে চাহিয়া তাহার পর বলিল, এ আর নতুন কথা কি শোনালেন দাদা। ভাললোকের দুর্দ্দশা চিরকালই! মহাভারতের আমল থেকে এ ঘটনা ঘটে আসছে। হাতটা একবার দেখাবেন দাদা দয়া করে?

হাত দেখতে জানেন নাকি আপনি?

যৎসামান্য।

তবে আপনি ত গুণী লোক মশয়!

পাশা ফেলিয়া দোকানের মালিক করতল প্রসারিত করিয়া ভন্টুর নিকট আসিয়া বসিলেন। ওয়েস্টকোট-পরিহিত মাস্টার জমাটি খেলাটা এইভাবে পণ্ড হইয়া যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং বলিলেন, তুমি আবার নতুন হুজুগে মাতলে দেখছি! আশ্চর্য্য লোক বটে তুমি!

কেহ ইহার কোন উত্তর দিল না। ভন্টু ভদ্রলোকের দক্ষিণ করতলটি লইয়া তাহাতে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়াছিল। কেলো নামক ভৃত্যটি ভিতরের একটি ঘর হইতে বাহির হইয়া চা দিয়া গেল।

সকলেই নীরবে চা পান করিতে লাগিলেন। ভন্টু ও দোকানের মালিক ভদ্রলোক বাঁ হাতে চায়ের পেয়ালা ধরিয়া মাঝে মাঝে চুমুক দিতে দিতে করকোষ্ঠি ব্যাপারে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। ওয়েস্টকোট-পরিহিত মাস্টার ডিশে ঢালিয়া ঢালিয়া অল্প সময়েই চা-টুকু নিঃশেষ করিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একটি মরিচা ধরা কৌটা বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটি অতি নিপুণতার সহিত ধরাইয়া বেশ জুৎ করিয়া বসিলেন এবং মুখের এমন একটা ভাব করিয়া ভন্টু ও দোকানের মালিক ভদ্রলোকের দিকে তাকাইতে লাগিলেন যে, যেন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি দুই জন শিশুর ছেলেমানুষি কাণ্ডকারখানা নিরুপায় হইয়া সহ্য করিতেছে এবং উপভোগও করিতেছে।

কীর্ত্তন শুনিয়া অবধি শঙ্করের মনটা কেমন যেন হইয়া গিয়াছিল। সে এসব কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না। সে অন্যমনস্কভাবে চা খাইতে খাইতে বাহিরে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভন্টু অবশেষে দোকানের মালিক ভদ্রলোকের করতলটি ছাড়িয়া দিল এবং বামহস্তধৃত পেয়ালা হইতে বাকি চাটুকু পান করিয়া ফেলিল।

কি দেখলেন মশয়?

ভন্টু কোন উত্তর না দিয়া পকেট হইতে একটি অত্যন্ত মলিন রুমাল বাহির করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে মুখটি মুছিল এবং তাহার পর বলিল, যা দেখলাম তাতে আপনার পায়ের ধূলো আর একবার নিতে হবে—এর বেশী আর কিছু বলব না এখন।

বলিয়া সে সত্য সত্যই আর একবার চট্ করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইলেন।

আরে, কি যে করেন আপনি খালি খালি! কি দেখলেন তাই বলুন!

কিছু বলব না দাদা, খালি পায়ের ধূলো নেব। শঙ্কর, পায়ের ধুলো নে এঁর—সঙীন ব্যাপার!

শঙ্কর মৃদু হাসিল। দোকানের মালিক ভদ্রলোক ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আচ্ছা লোক ত আপনি মশয়।

ভন্টু স্মিত মুখে বলিল, কিছু বলতে হবে না, হদিস্ পেয়ে গেছি দাদা আপনার! এখন মাঝে মাঝে এসে জ্বালাতন করব আপনাকে! আজ সময় কম।

ভন্টু দাঁড়াইয়া উঠিল এবং মৃদুস্বরে শঙ্করকে বলিল, প্রোটোটাইপ এসে গেছে, ওঠ্।

শঙ্কর চায়ের দাম বাহির করিয়া দিতে গেলে দোকানী ভদ্রলোক নমস্কার করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, মাপ করবেন, আপনাদের চা ত আমি বিক্রি করিনি। মনে রাখবেন অধীনকে, তাহলেই যথেষ্ট!

ভন্টু হাসিয়া বলিল, হাত দেখেই সে বুঝেছি!

ভন্টু ও শঙ্কর দোকান হইতে নামিয়া পড়িল। ভন্টু স্মিতমুখে ওয়েস্ট-কোট-পরিহিত ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া বলিল, আপনাকে আর একদিন এসে চাঙ্গাব দাদা, আজ সময় বড় কম!

নিশ্চয়, নিশ্চয়—তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন।

শঙ্কর ও ভন্টু বাইকের দোকানের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ভন্টু বলিল—থাম্!

বাইকের দোকানের সন্নিহিত একটি স্বল্পান্ধকার স্থানে উভয়ে থামিল। শঙ্কর দেখিল একটি যুবক দোকানে আসিয়াছে এবং ভন্টু যাহাকে ওরিজিনাল নামে অভিহিত করিয়াছিল তিনি যুবকটিকে উচ্চকণ্ঠে ভৎর্সনা করিতেছেন।

সমস্ত বিকেলটা পার করে দিয়ে এলে অথচ একটি পয়সা আদায় হয়নি কি রকম? তাগাদায় বেরিয়েছিলে, না আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছিলে! পাশের বাড়ির এক গাইয়ে মেয়ে জুটেছে সে ত তোমার মাথাটি খেলে দেখছি! মৃগেনবাবুর ওখানে কি বললে? আজ ত তার দেবার কথা!

যুবক অপ্রতিভ হইয়া আড়চোখে চাহিতে চাহিতে উত্তর দিল, বাড়ি ছিলেন না!

বাড়িতে জনপ্রাণী কেউ ছিল না!

কেউ সাড়া ত দিলে না, অনেকক্ষণ কড়া নাড়ানাড়ি করলাম।

ভূতের কাছে মামদোবাজি! দাও বিলটা আমাকে দাও, ফেরবার মুখে দেখি যদি ধরতে পারি! পষ্ট কথাটি হচ্ছে, কোন কাজেরই তুমি নও বাবা, বি-এ পাশ করলে কি হবে! ফিন্‌ফিনে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়েছ কেন এই শীতে? সোয়েটার কোথা, ঠাণ্ডা লাগিয়ে আবার একটা অসুখ বাধাও, কিছু টাকা লম্বা হয়ে যাক আমার! সোয়েটার কোথা?

এখানেই আছে।

গায়ে দাও দয়া করে সোয়েটারটি, আর এই নাও এই টুপিটাও পর, বেশ করে কান-টান ঢেকেঢুকে ব'স। দশটার আগে দোকান বন্ধ ক'র না যেন।

এই বলিয়া ওরিজিনাল মঙ্কি ক্যাপটি খুলিয়া ফেলিলেন।

ভন্টু শঙ্করের কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল, ঘোর জালে পড়েছে প্রোটোটাইপ্। দেখ্ দেখ্ মিস্টার ফাইভকে দেখ্ এইবার!

শঙ্কর দেখিল টুপি খুলিয়া ফেলাতে ওরিজিনালের অনাবৃত মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে। মুখখানির বিশেষত্ব আছে, দেখিতে ঠিক বাঙলা পাঁচের মত। কিছু গোঁফদাড়িও আছে। শঙ্কর ইহাও লক্ষ্য করিল যে, যুবকটির মুখও ওরিজিনালের অনুরূপ, কেবল গোঁফদাড়ি নাই।

ভন্টু চুপি চুপি আবার বলিল—মিলিয়ে দেখ, ওরিজিনাল আর প্রোটোটাইপ্ পাশাপাশি রয়েছে—দেখ্ দেখ্ ভাল করে দেখ্ না রাসকেল্!

ভন্টু শঙ্করকে একটা খোঁচা মারিল।

অরিজিনাল বলিতেছে শোনা গেল—দাও আমার সাইকেলটা দাও, মৃগেনবাবুর বিলটাও দাও, দেখি যদি ব্যাটার নাগাল পাই!

প্রোটোটাইপ একটি সেকেলে ধরণের বাইক বাহির করিল এবং তদুপরি আরোহণ করিতে করিতে ওরিজিনাল পুনর্ব্বার প্রোটোটাইপকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলেন।

তোমার একে কোফো ধাত, ঠাণ্ডা লাগিও না যেন,

সোয়েটার আর টুপিটা পরে ফেল। যাই দেখি, মৃগেন-বাবুকে যদি ধরতে পারি।

ওরিজিনাল চলিয়া গেলে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, প্রোটোটাইপ ওরিজিনালের কে হয়?

ছেলে। আয় এইবার যাওয়া যাক্—কোস্ট ইজ ক্লিয়ার!

উভয়ে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া বাইকের দোকানের সম্মুখবর্ত্তী হইল। ভন্টুকে দেখিবামাত্র প্রোটো-টাইপ নমস্কার করিলেন এবং হাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন, সেদিন আপনি কোথায় চলে গেলেন ভন্টুবাবু! আমি রাশি-চক্রের ছকটা টুকে নিয়ে এসে প্রায় রাত দশটা পর্য্যন্ত আপনার অপেক্ষায় বসে ছিলাম! কোথায় গেলেন বলুন ত, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে!

ভন্টু হাস্যস্নিগ্ধ মুখে কেবল তাহার দিকে একবার চাহিয়া বাইকটা ঠেসাইয়া রাখিল।

প্রোটোটাইপ আবার বলিলেন, কোথা গেলেন সেদিন বলুন দেখি, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে।

সব বলছি। ওই টিনের চেয়ারটা নাবান ত আগে!

বলিয়া ভন্টু দোকানের অভ্যন্তরস্থ একটি টিনের চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

হ্যাঁ—এই যে—

প্রোটোটাইপ নানাভাবে-জখম নানাবিধ বাইকের জঙ্গলের ভিতর হইতে টিনের চেয়ারটি বাহির করিয়া ভন্টুর হাতে দিলেন। ভন্টু সেটি ফুটপাথে পাতিয়া দিয়া শঙ্করকে বলিল, ব'স্ তুই! শঙ্কর বসিল। দোকানের ভিতর এক কোণে একটা ময়লা চট্ পাতা ছিল, ভন্টু তাহাতেই গিয়া বেশ জমায়েত হইয়া বসিল এবং তাহার বুক খোলা জামার ভিতরের পকেট হইতে একটি ছোট নোট বুক বাহির করিয়া বলিল, কই দেখি রাশি চক্রটা?

প্রোটোটাইপ কোমর হইতে চাবি বাহির করিয়া একটি টিনের বাক্স খুলিল এবং এক টুক্‌রা কাগজ বাহির করিয়া ভন্টুর হাতে দিলেন। উহাতেই রাশিচক্র টোকা ছিল। ভন্টু কাগজখানি লইয়া একাগ্র দৃষ্টিতে সেটির দিকে তাকাইয়া রহিল এবং তৎপরে তাহা নোট বুকে টুকিয়া লইয়া বলিল, জটিল ব্যাপার দেখছি। এ বক্‌সি মশায়ের কাছে না গেলে হবে না। আমি বক্‌সি মশায়ের কাছে যাব ভাবছিলাম আজই, কিন্তু বাইকের পেছনের চাকাটা একেবারে দক্‌চে গেছে। রাম দক্‌চান্ দক্‌চেছে।

বাইক ঠিক করে দিচ্ছি আপনার ভয় কি! কি হল বাইকের?

ভন্টু হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমাকে ঠ্যাঙালেও আর পয়সা বেরুবে না।

প্রোটোটাইপ আহত আত্মমর্য্যাদার সুরে বলিলেন—আপনার সঙ্গে কি আমার খদ্দের-দোকানী সম্পর্ক! কেবল দেখবেন, বাবা না জানতে পারেন—বাস্। জানেন ত সবই!

ভন্টু কিছু না বলিয়া সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া প্রোটোটাইপের দিকে চাহিয়া রহিল।

দাঁড়ান সোয়েটারটা পরে নি আগে। তারপর আপনার বাইক ঠিক ক'রে দিচ্ছি এক্ষুনি। ওরে মটরা, বাইকটা তোল্ ত।

আড়ময়লা ফতুয়া ও লুঙ্গী-পরা একটি ছোকরা বিড়ি টানিতে টানিতে পিছনের একটা ঘর হইতে বাহির হইল এবং ভন্টুর প্রতি একটা অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, এসব মেরামতি কাজ সকালের দিকে আনলেই সুবিধে হয় বাবু বুঝলেন, মিসিনারির কাজ—

ভন্টু কিছু না বলিয়া কেবল স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

প্রোটোটাইপ ধমক দিয়া উঠিলেন।

তুই বাজে কথা ছেড়ে যা বলছি কর্ দিকিন্—তোল্ বাইকটা।

বিড়িটাকে শেষ টান দিয়া মটরা সেটা দূরে ফেলিয়া দিল এবং অস্ফুট স্বরে গজর গজর করিতে করিতে বাইকটা তুলিয়া ফেলিল। প্রোটোটাইপ বাইকটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

শঙ্কর বলিল, আমরা চল্ না ততক্ষণ মেজকাকার ব্যাপারটা সেরে আসি। কীর্ত্তন শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণ।

ভন্টু প্রোটোটাইপের দিকে মিটি মিটি চাহিয়া বলিল, লক্ষণবাবু রাজি হলেই যেতে পারি, উনিই এখন মালিক!

লক্ষণবাবু অর্থাৎ প্রোটোটাইপ এই কথায় অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন ও বলিলেন, কি যে বলেন আপনি ভন্টুবাবু! কোথা যাবেন এখন আবার, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে—

ইহাতে ভন্টু এমন একটা মুখভাব করিয়া শঙ্করের দিকে

চাহিল যেন মেজকাকার সহিত দেখা করাটা শঙ্করেরই প্রয়োজন এবং ভন্টুকে বাধ্য হইয়া তাহার সহিত যাইতে হইবে।

শঙ্কর লক্ষণবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল—আমরা এক্ষুনি ফিরে আসছি, বাইকটা ততক্ষণ সারা হোক! আয় ভন্টু।

ভন্টু করজোড়ে লক্ষণবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, অনুমতি দিচ্ছেন ত, এ ছোকরা কিছুতে ছাড়বে না!

সম্পূর্ণরূপে অপ্রতিভ হইয়া লক্ষণবাবু বলিলেন, মানে, নিশ্চয়! তবে সেদিনকার মতন আবার করবেন না যেন, আসা চাই।

বাইক জামিন রইল।

একবার ত বাইক ফেলেই পালিয়েছিলেন। বাবার কাছে নানারকম মিথ্যে কথা ব'লে শেষটা নিস্তার পাই সেদিন!

না ঠিক আসব।

ভন্টু ও শঙ্কর মেজকাকার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। পথে যাইতে যাইতে ভন্টু অযাচিতভাবেই ওরিজিনাল ও প্রোটোটাইপের কাহিনী শঙ্করকে শুনাইতে লাগিল। ওরিজিনালের নাম দশরথ। দশরথের দুই পুত্র, রাম ও লক্ষণ। রাম মারা গিয়াছে, নিউমোনিয়া হইয়াছিল। স্ত্রীও বহু আগে মারা গিয়াছেন। লক্ষণই এখন ওরিজিনালের সর্ব্বস্ব-ধন নীলমণি। ওরিজিনাল টাকার কুম্ভীর। বাইকের দোকান আছে, মহাজনি কারবার আছে, কলিকাতায় দুইখানা বাড়ি আছে, ব্যাঙ্কে বেশ কিছু নগদ টাকাও আছে। তথাপি ওরিজিনালের এক পয়সা বাপ-মা! এদিকে প্রোটোটাইপ অন্য প্রকৃতির। কৃপণ ত নয়ই—রসিক। পাশের বাড়ির একটি মেয়ের প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে। কিন্তু জ্যোতিষে অগাধ বিশ্বাস থাকায় গোপনে মেয়েটির কোষ্ঠি সংগ্রহ করিয়াছে। মেয়েটির কোষ্ঠির সহিত যদি প্রোটোটাইপের কোষ্ঠির মিল হয় তাহা হইলে প্রণয়ব্যাপারে নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইবে এবং ওরিজিনালের নিকট কাহারও মারফত প্রস্তাবটা করিবে। ওরিজিনালও কোষ্ঠি-পাগল লোক। সুতরাং কোষ্ঠির মিল সর্ব্বাগ্রে দরকার। কোষ্ঠির মিল না হইলেই সর্ব্বনাশ। তখন যে প্রোটোটাইপ কি করিবে তাহা ভন্টুর কল্পনাতীত।

গলিটা হইতে বাহির হইয়া তাহারা শুনিতে পাইল কীর্ত্তন চলিতেছে। একটু কাছাকাছি হইতেই শঙ্কর শুনিতে পাইল—রসভরে দুঁহুঁ তনু, থরথর কাঁপই—। আর একটু কাছে যাইতেই তাহারা দেখিতে পাইল ভন্টুর মেজকাকা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, অপর আর একজন খোল ধরিয়াছেন।

ভন্টু কাছে গিয়া বলিল, মেজকাকা, শঙ্কর এসেছে।

শঙ্কর? কই, এই যে এস এস এস।

মেজকাকা শঙ্করকে দুই হাত দিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর বলিলেন, ভেতরে বসবে না কি তোমরা? বসিয়ে দেব?

শঙ্কর বলিল, না থাক। আমাকে আবার এখুনি হস্টেলে ফিরতে হবে। তার চেয়ে আপনার সঙ্গে চলুন একটু গল্প করা যাক, অনেক ঘুরে এলেন আপনি!

বেশ, বেশ, বেশ—চল, তাই চল! ওদিককার ঘরটায় যাওয়া যাক, চল তাহলে—

শঙ্কর ও ভন্টুকে সঙ্গে লইয়া তিনি পিছনের দিকে একটা ঘরে গেলেন। ঘরের ভিতর একটি প্রকাণ্ড চৌকিতে ফরসা চাদর বিছানো ছিল। তিনজনে গিয়া তাহাতেই বসিলেন। ভন্টু কপাটটা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল।

মেজকাকা সহাস্য সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই ভন্টুও হাসি-মুখে বলিল, আসুন নিরিবিলিতে একটু লদকা-লদকি করা যাক! শঙ্কর এসেছে—

মেজকাকা শঙ্করের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, ভন্টুটা চিরকালই একরকম রইলো! ওর শিশুত্ব আর ঘুচল না, কি বল?

শঙ্কর বলিল, কিন্তু ও হঠাৎ পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, এটা ত ঠিক নয়।

না, না, না, পড়তে হবে ওকে! আমরা অর্থাভাবে পড়তে পাইনি ভন্টুকে কিন্তু পড়তে হবে, সেটি হবে না!

এই বলিয়া মেজকাকা চক্ষু বুজিয়া কি যেন প্রণিধান করিতে লাগিলেন। 'অর্থাভাবে পড়তে পাই নি' কথাটা অবশ্য সত্য নয়—মেজকাকা খেয়ালবশত পড়াশোনা ছাড়িয়া-ছিলেন। সে যাই হোক খানিক চক্ষু বুজিয়া থাকিবার পর পুনরায় মেজকাকা চাহিলেন এবং বলিলেন, ঠাকুর বলেন অশিক্ষিত পুরুষ এবং বিধবা নারী সমান দুর্ভাগা। দুজনেরই জীবনের সম্ভাবনা ছিল অনেক, কিন্তু হল না কিছুই। এ যেন প্রদীপে তেল সলতে সবই রয়েছে কেবল শিখাটি কেউ

জ্বালিয়ে দিলে না। নাঃ, ওসব কাজের কথা নয়, ভন্টুকে পড়তে হবে। ভন্টু, কালই তুমি কলেজে ভরতি হয়ে যাও।

ভন্টু সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিল, কিন্তু রুধির ?

ওসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে কেন? সে দায়িত্ব আমাদের ; কি বল শঙ্কর ?

শঙ্কর সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

তাহার পর বলিল, আপনি কি তাহলে আবার চাকরি নেবেন ?

দেখি, তাই বোধ হয় নিতে হবে শেষ পর্য্যন্ত! কর্ম্মের বন্ধন ইচ্ছে করলেই ত আর ছিন্ন করা যায় না। বিস্টুর অসুখ হয়েই মুস্কিল হয়ে পড়েছে! অসুখ হবে না? ব্রহ্মচর্য্যই হল স্বাস্থ্যের ভিত্তি। বৌমাই অন্তঃসারশূন্য করে ফেললেন বিস্টুকে!" বলিয়া মেজকাকা সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন এবং চক্ষু বুজিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত শ্মশ্রুরাজির মধ্যে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। শঙ্কর ও ভন্টু নীরব হইয়া রহিল। ভন্টু পিছনের দিকে বসিয়াছিল, সে একবার ওষ্ঠ-ভঙ্গী করিয়া মেজকাকাকে ভ্যাঙাইল।

কিছুক্ষণ পরে মেজকাকা চক্ষু খুলিয়া চাহিলেন এবং বলিলেন, নাঃ, ভন্টুর জন্যেই আমাকে শেষকালে চাকরি নিতে হবে! ওর পড়া বন্ধ হতে দিতে পারি না আমি। আবার তিনি চক্ষু বুজিলেন ও দাড়ির ভিতর আঙুল চালাইতে লাগিলেন। শঙ্কর বলিল, আমি আজ বোস সায়েবের বাড়ি গিয়েছিলাম। কথায় কথায় আপনার চাকরির কথা উঠল, বোস সায়েব বললেন, কিছুদিন পরে কয়েকজনকে নেওয়া হবে। কিন্তু তার জন্যে একটা কম্‌পিটিটিভ্‌ পরীক্ষা দিতে হবে। সে কি সুবিধে হবে আপনার ?

ভন্টু সহাস্যে বলিল, শুনলেন মেজকাকা, শঙ্করের কথা! ও আপনাকে পরীক্ষার ভয় দেখাতে চায়!

মেজকাকা কিছু না বলিয়া দাড়িতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন, পরীক্ষার জন্য ভাবি না, পরীক্ষা অনেক দিয়েছি, আরও দিতে হবে—সমস্ত জীবনটাই পরীক্ষার ফলাফল ঠাকুরের হাতে! না, আমি পরীক্ষার জন্যে ভাবছি না, আমি ভাবছি ঠাকুরের কথা! চাকরি যদি নিতে হয় তাহলে ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে নিতে হবে। তিনি এখন অনুমতি দেবেন কি-না সেইটে হ'ল সমস্যা। এমনিই ত তাঁর বিনা অনুমতিতে এখানে এসেছি—থাকবার কথা আমার কাশীতে!

শঙ্কর বলিল, চিঠি লিখুন না একটা তাঁকে, কোথায় আছেন তিনি আজকাল ?

ভন্টু বলিল, শুনছেন মেজকাকা, শঙ্করের কথা! ঠাকুরকে চিঠি লিখে অনুমতি নিতে বলছে। ষাঁড়ের গোবর কি গাছে ফলে! ঠাকুর কি আপিসের বড়বাবু না কি, যে করেসপন্‌ডেন্স করলে জবাব পাওয়া যাবে! কি সুডোল গাড়োল রে তুই!

মেজকাকা একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া বলিলেন, আহা সে শঙ্কর জানবে কি করে!

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, না ভাই, চিঠিপত্র লিখলে কাজ হবে না। তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, কোথায় পাবেন কাগজ দোয়াত কলম—তাঁর কাছে নিজেই যেতে হবে। কিন্তু তাঁকে ধরাই শক্ত। চল না সবাই মিলে যাই একদিন—আলাপও হয়ে যাবে। ভন্টুও ঠাকুরকে দেখে নি এখনও। ভন্টুকে দেখলে আর ভন্টুর কথা শুনলে ঠিক অনুমতি দেবেন উনি।

ভন্টু বলিল, আসচে শনিবার চলুন তাহলে—সোমবারটাও ছুটি আছে। কোথা আছেন তিনি ?

মেজকাকা উত্তর দিলেন, ভাগলপুরে।

ভন্টু বলিল, শঙ্কর যাবি ? চল না ঘুরে আসি!

এমন সময় হঠাৎ কে বাহির হইতে কপাটে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগিল। কপাট খুলিয়া দিতেই একজন ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্তভাবে প্রবেশ করিয়া মেজকাকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একবার আসুন ত, মৃন্ময়বাবু মূর্চ্ছা গেছেন হঠাৎ কীর্ত্তন শুনতে শুনতে!

ভন্টু বলিয়া উঠিল, কে, মোমবাতি ? সে কি কেত্তন শুনছিল নাকি এখানে বসে ?

মেজকাকা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বলিলেন, হ্যাঁ সে ত সন্ধে থেকেই এসে বসেছে!

সকলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ভন্টু দেখিল মোমবাতিই মূর্চ্ছা গিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, দৃঢ়নিবদ্ধ অধর দুইটিও মাঝে মাঝে কাঁপিতেছে। চক্ষু দুইটি মুদিত।

মেজকাকা বলিলেন—ও কিছু নয়, ভাব লেগেছে, মুখে চোখে জল দিলেই এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।

তাহাই করা হইতে লাগিল।

একটু পরে শঙ্কর বলিল, আমাকে এইবার ফিরতে হবে, আটটা বেজে গেছে।

প্রোটোটাইপের ওখানে যাবি না ?

না ভাই, আজ আর সময় নেই।

আমাকে কিন্তু যেতে হবে, তার আগে মোমবাতিটার একটা ফিল্লে করতে হবে আবার! রাস্‌কেলটার কাণ্ড দেখেছিস ; আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসে বসে কেত্তন শুনছিল ; চল্ তোকে একটু এগিয়ে দি।

পথে বাহির হইয়া ভন্টু আবার বলিল, বাবাজিকে আর ঠাকুরের কাছে যেতে দেওয়া নয়, দেখা হ'লেই আবার ডুব মারবে—খেপেচিস তুই! অনুমতি-টনুমতি বাজে ওজর!

শঙ্কর কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল।

বলিল, আমি চলি ভাই এখন।

আচ্ছা যা।

যদিও হস্টেলে ফিরিবার সময় হইয়াছিল কিন্তু কিছু দূর গিয়াই শঙ্কর ঠিক করিয়া ফেলিল যে, এখন তাহার হস্টেলে ফেরা চলিবে না। তাহাকে একবার শৈলর সহিত দেখা করিতেই হইবে। সকালে অমন করিয়া চলিয়া আসাটা ঠিক হয় নাই। সে দ্রুতবেগে বোস সায়েবের বাড়ির দিকে চলিল। অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর বোস সায়েবের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এই অসময়েও সে গিয়া শৈলকে প্রথমেই এককাপ চা করিতে ফরমাস করিবে। দোকানের চা-টা তেমন সুবিধার হয় নাই। তাহা ছাড়া শৈলকে খুশি করিবার সহজ উপায়ই হইতেছে ওই—তাহাকে নানা ফরমাসে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা। শৈল গন্‌গন্ করিবে, উপদেশ দিবে, নানা অসুবিধার উল্লেখ করিবে—কিন্তু চা-টুকু শেষ পর্য্যন্ত করিয়া দিয়া মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিবে। ইহাই তাহার স্বভাব। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল, শুধু চা নয়, শৈলকে দিয়া প্রস্তুত করাইয়া কিছু খাবারও তাহাকে খাইতে হইবে। ছেলেবেলার কথা তাহার মনে পড়িল। মিত্তির বাড়ির উঠানে একটা ভাল পেয়ারা গাছ ছিল। মিত্তির বাড়িতে শৈলর যতটা অবাধ গতিবিধি ছিল, অপর কাহারও ততটা ছিল না। শৈলর মধ্যস্থতায় অনেকেই সেই পেয়ারা ভক্ষণ করিত। শৈলকে মিত্তির বাড়ির পেয়ারা আনিয়া দিতে বলিলে সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিত বটে, কিন্তু মনে মনে খুশি হইত এবং নানা কৌশলে পেয়ারা চুরি করিয়া আনিয়া দিত। শৈলর সেই স্বভাব আজও বদলায় নাই। তাহাকে গিয়াই চা এবং মোহনভোগের ফরমাস করিতে হইবে।

হঠাৎ একটা মোটর-হর্নের চীৎকারে শঙ্কর সচকিত হইয়া উঠিল। দেখিল বোস সাহেবেরই মোটর। মোটরখানা তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর দেখিল বোস সাহেব নিজেই ড্রাইভ করিতেছেন, পাশে সুসজ্জিতা শৈল বসিয়া আছে। শঙ্কর বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

হস্টেলে ফিরিয়া শঙ্কর তিনখানি পত্র পাইল।

একখানি বাবার, মায়ের পাগলামি অত্যন্ত বাড়িয়াছে।

একখানি মিষ্টিদিদির, আবার নিমন্ত্রণ। আর একখানি সুরমা বম্বে হইতে লিখিয়াছে। রহস্যময় পত্র।

(ক্রমশ)

দেবগড়

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশাল মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায়, যখন বিভিন্ন মহারাষ্ট্র সর্দ্দার স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্বাধীনতা অবলম্বন

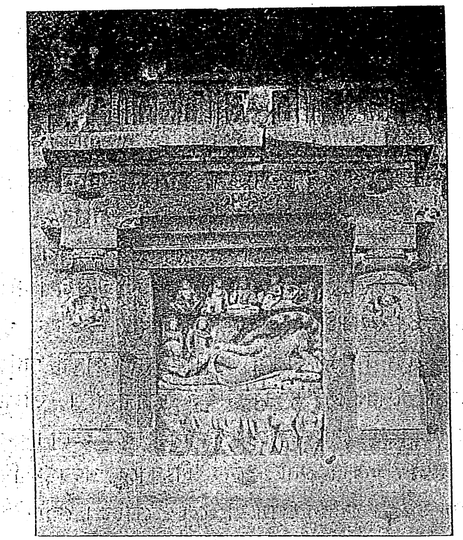

গর্ভগৃহের অভ্যন্তরীণ মূর্ত্তি—দেবগড়—অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণু

করিয়া রাজত্ব করিলেন, তখন সুপ্রাচীন মালবদেশ বহুধা বিভক্ত হইয়া গেল। এই বিস্তীর্ণ দেশের অংশবিশেষ লইয়া বর্ত্তমান ইন্দোর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি করদ রাজ্যের অবস্থিতি। মালবের যে অংশ যুক্তপ্রদেশের সন্নিকট, তাহা লইয়া পর্ব্বতসঙ্কুল উপত্যকাময় প্রদেশে আরও একটি ক্ষুদ্র রাজত্ব ছিল। ইহার নাম ঝান্সি। সিপাহীবিদ্রোহের রুদ্র নৃত্য থামিয়া যাইবার পর এই ক্ষুদ্র রাজত্ব ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া গেল। প্রথমে এই প্রদেশটিকে ঝান্সি ও ললিতপুর এই দুই জেলায় বিভক্ত করা হয়। পরে ললিতপুরকে ঝান্সি জেলার একটি মহকুমায় পরিণত করা হইয়াছে।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে মালব প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। সাঁচীতে, কাকপুরে, মান্দাশোরে ও উজ্জয়িনীতে ইহার বহু কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এই মালবের অংশবিশেষে যে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ললিতপুরের অনতিদূরেই ইতিহাস-বিশ্রুত চান্দেরি দুর্গ অবস্থিত। ললিতপুরের মহকুমার দক্ষিণাংশ পর্ব্বতসঙ্কুল ও জঙ্গলাকীর্ণ। এই স্থানে লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়া প্রাচীন যুগের বহু ধ্বংসাবশেষ মানুষ ও কালের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া এখনও দণ্ডায়মান আছে। দেবগড় পর্ব্বত তাহাদের অন্যতম। দেবগড় যাইতে হইলে দুই পথে যাওয়া যায়। প্রথমে ঝাকলুল ষ্টেশন হইতে যাওয়া যায়, কিন্তু এস্থানে যানবাহনাদি পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় ঝান্সি রোড হইতে একটি কাঁচা শড়ক দ্বারা।

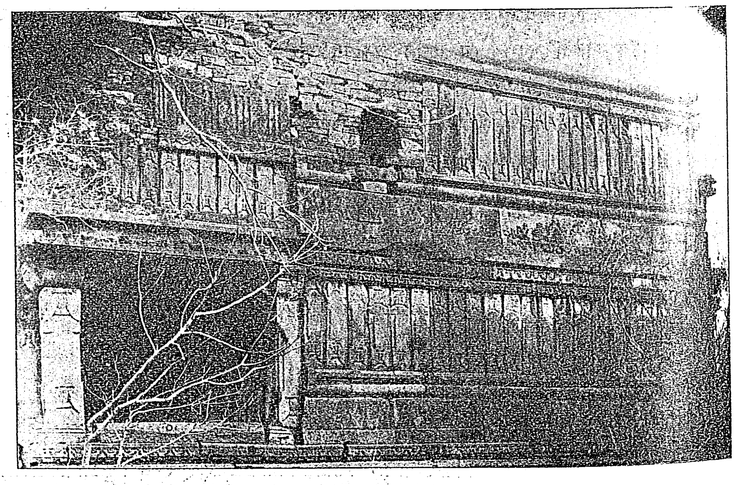

আর একটি দ্বিতল মন্দির, দেবগড়

দেবগড় পর্ব্বতের ঠিক তলায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত একটি বিষ্ণুমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র মন্দিরটি মধ্যযুগের দেবালয় হইতে একটু বিভিন্ন। কেবলমাত্র

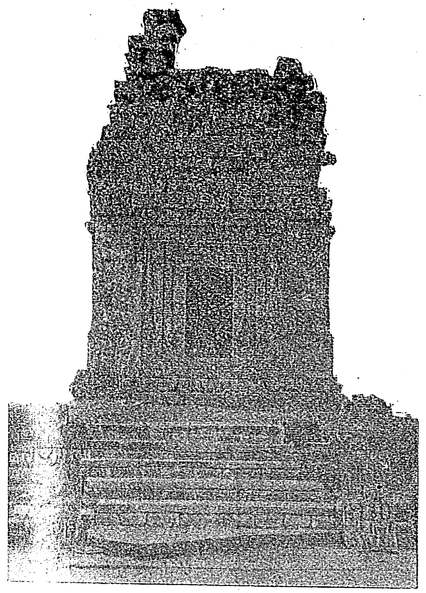

দশাবতার মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ—দেবগড়

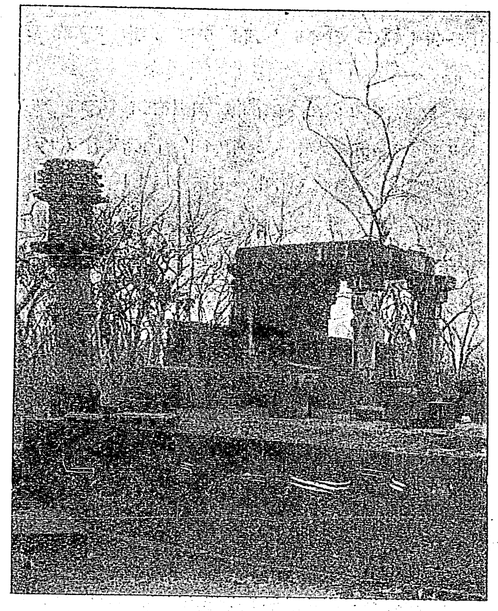

দেবগড় পর্ব্বতের মধ্যস্থলের জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

গর্ভগৃহ ছিল—মণ্ডপ নাই। গর্ভগৃহের চতুর্দ্দিকে আচ্ছাদিত প্রদক্ষিণ-পথ ছিল। কালের প্রভুত্বে এই প্রদক্ষিণ-পথ বহুদিন ধরাশায়ী হওয়াতে গর্ভগৃহের প্রাচীর এখন মানবের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। গর্ভগৃহের তিনদিকের প্রাচীরের ভাস্কর্য্যও দ্বারের উপরস্থ অনন্ত নাগের উপর উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়া অনুমিত হয় যে, মন্দির নির্ম্মাতাগণ ইহাতে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যে শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা

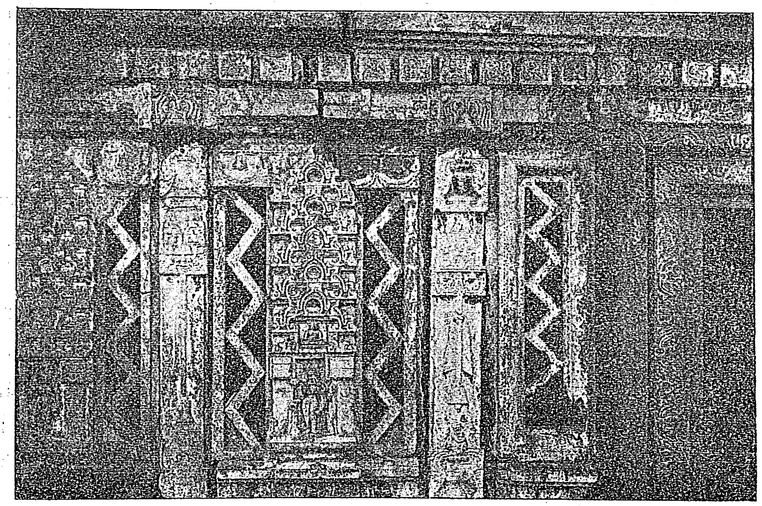

দেবগড় উপত্যকার বৃহৎ মন্দিরের পাষাণ নির্ম্মিত বাতায়ন

মন্দির প্রাচীরে তিনটি প্রতিলিপি পাওয়া যায়, তাহার একটি অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণু নাগদেহের উপর নিদ্রামগ্ন। নীচে অসুরগণ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত এবং শূন্যে নারায়ণের নাভি-দেশ হইতে উত্থিত পদ্মের উপর ব্রহ্মা, ময়ূরের উপর উপবিষ্ট কার্ত্তিকেয় এবং বৃষভারূঢ় শিবদুর্গার মূর্ত্তি প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এই প্রতিলিপিটি অনায়াসে বিষ্ণুর অনন্ত-শায়ীন মূর্ত্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। লিঙ্গের পশ্চাদভাগস্থ প্রাচীরের মূর্ত্তি বৈষ্ণব বলিয়া অনুমিত হয়। একটি হস্তী সর্প দ্বারা সম্মুখস্থ কুর্ম্মের সহিত বদ্ধ অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয় এবং উপরের অংশে গরুড়ের উপর উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। পার্শ্বস্থিত প্রাচীরে দুইটি দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে। অপূর্ব্ব

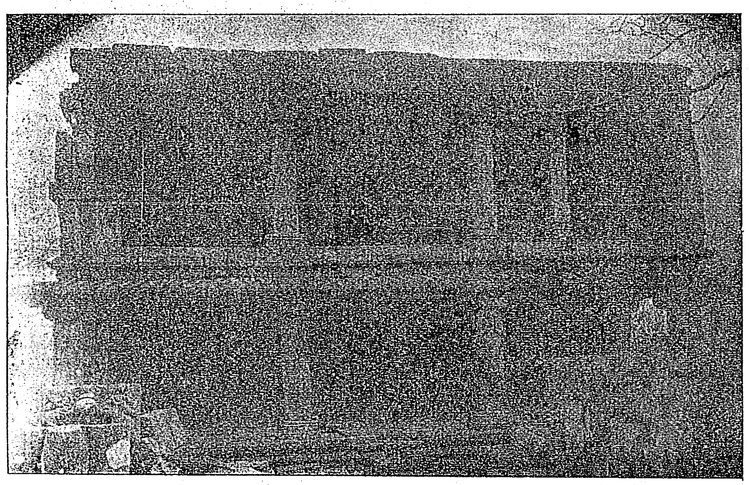

দেবগড় উপত্যকার উপরস্থ দ্বিতল একটী মন্দির

কারুকার্য্য মণ্ডিত একটি দ্বারের দ্বারা গর্ভগৃহে প্রবেশ করা যায়। দেবালয়ের প্রাঙ্গণে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকা গর্ভ হইতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছে। দশাবতার মন্দিরের প্রায় এক মাইল দূরে একটি নির্ঝরিণীর উপর পাষাণ নির্ম্মিত বাঁধ আছে। বাঁধের পরপারে একটি প্রস্তরাচ্ছাদিত পার্ব্বত্য পথের দ্বারা প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত একটি গিরি-দুর্গে উপস্থিত হওয়া যায়। এই পর্ব্বতের শিখরস্থ উপত্যকার নাম দেবগড়। এই দুর্গম উপত্যকায় ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে নির্ম্মিত বহু জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ কালের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আজিও বিদ্যমান আছে। সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটি বোধ হয় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে সেই সময়ে ও পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেবগড় উপত্যকার গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়।

দুর্গ হইতে উপত্যকায় যাইবার পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বৃহৎ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। মন্দিরের ছাদ বহুদিন পূর্ব্বে অদৃশ্য হইয়াছে কেবল তাহার দীর্ঘদেহ স্তম্ভগুলি বিকটাকার দৈত্যের ন্যায় নীল নভঃস্থলের দিকে তাকাইয়া আছে। মন্দিরের ভিত্তির মধ্যস্থলে একটি সুউচ্চ বেদী দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার উপরে চতুর্ব্বিংশতি জৈন তীর্থঙ্করের ও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে জিন উপদেবতাদের মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। দেবগড় উপত্যকায় পৌঁছিলে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত সুবৃহৎ দেবালয়টি আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করে। বৃহৎ মন্দিরের সম্মুখে একটি উন্মুক্ত মণ্ডপ, তাহার পরে অন্তরাল। অন্তরালের পার্শ্বস্থ প্রাচীর জালি বাতায়নযুক্ত। এইরূপ জালি বাতায়নযুক্ত অন্তরাল সুদূর দাক্ষিণাত্যে আইহোলি এবং পটকদলের মন্দিরে দৃষ্টিগোচর হয়। অন্তরাল মধ্যে প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থান আছে, সূর্য্যালোক এস্থলে প্রবেশ করিতে পারে না। স্থানটিতে পরবর্ত্তীকালে আর একটি প্রাচীর তুলিয়া দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রথম ভাগে দুইটি নারী-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটি অম্বিকা বা অরিলা নামক যক্ষিণী মূর্ত্তি, তাহার বাম অঙ্কে একটি শিশু ও পদের নিকট তাঁহার বাহন সিংহ উপবিষ্ট। দ্বিতীয় ভাগে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ১৫´ হইতে ২০´ ফিট উচ্চ

একটি তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি আছে। বৃহৎ মন্দিরের সর্ব্বাংশেই বহু মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। চক্রমণের আচ্ছাদিত পথে বৃহৎ ক্ষুদ্র বহু মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। অনুমান হয় যে যখন বৃহৎ মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয়গুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছিল, তখন সেই সকল স্থান হইতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এই মূর্ত্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত মন্দিরগাত্রে বহু খোদিতলিপি দৃষ্টিগোচর হয়। এই লিপিগুলি মূর্ত্তির পাদপীঠে, ভগ্ন প্রস্তর ও স্তম্ভগাত্রে এবং মন্দিরের প্রাচীরে খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কতকাংশ আধুনিক এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তীর্থযাত্রীদের দ্বারা খোদিত হইয়াছিল।

এই মন্দিরের বামভাগে এক নূতন রকমের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরগুলি শিখর-বিহীন এবং একতল কিম্বা দ্বিতল। পশ্চাৎভাগে তাহাদের একটি কিম্বা দুইটি গৃহ থাকে এবং সম্মুখভাগে স্তম্ভ সমন্বিত মণ্ডপের ন্যায় আছে। দ্বিতল মন্দির আমাদের দেশে প্রাচীনকালে বড় বিরল। অন্যান্য মন্দিরগুলি শিখরযুক্ত।

স্থানটির প্রাচীনত্বের বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। গুপ্ত যুগের শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুপ্রাচীন মালবের একাংশে অবস্থিত পার্ব্বত্যময় শ্যামল বনভূমি এক সময়ে হিন্দু ও জৈনদের পবিত্র তীর্থ ছিল। যুগে যুগে মানবের অন্তর্নিহিত ভক্তিধারা ইহার পাষাণ বক্ষ প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। এখন তাহার গৌরব রবি অস্তমিত হইয়াছে। পড়িয়া আছে, জীর্ণ পাষাণ স্তূপ, অতীতের স্তিমিত সাক্ষীরূপে—মানুষকে সচেতন করিবার জন্য।

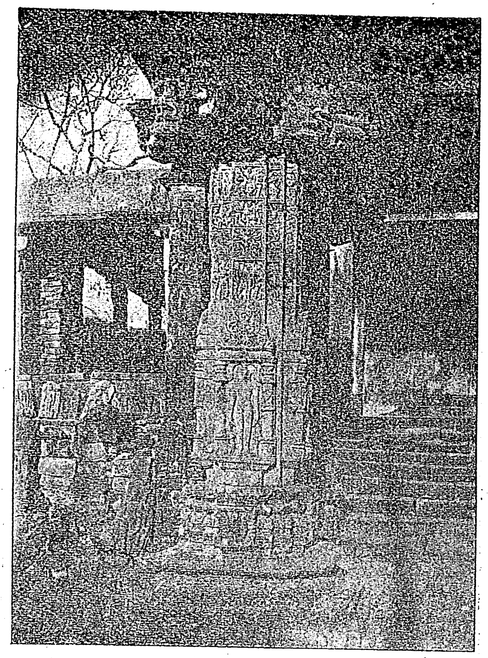

বৃহৎ মন্দিরের সভামণ্ডপ

স্বপ্ন

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বপ্ন আমার ভগ্ন প্রাণের সুপ্ত রাতের কল্পনা,
অন্ধ চোখের দৃষ্টি সে যে, নীরব মুখের জল্পনা।

নীরব বীণার শান্ত হিয়ার কোন্ তারে
সেই ত' তোলে আনন্দ-সুর ঝঙ্কারে,

কুন্দ-চাঁপার শুভ্র বুকের মন ভুলানো গন্ধ না!
নীল আকাশের বিশাল বুকের গুপ্ত কথার ছন্দ না,

শ্বেত কুমুদের স্নিগ্ধ চাঁদের সোহাগ রাশির গল্প না;
নিরাশ প্রাণের বুক ভাঙ্গা সেই গুঞ্জরণ—

পুষ্প কলির গুপ্ত ভাষার প্রস্ফুরণ,
গভীর রাতের লুকিয়ে থাকা অন্ধকারের মন্ত্রণা॥

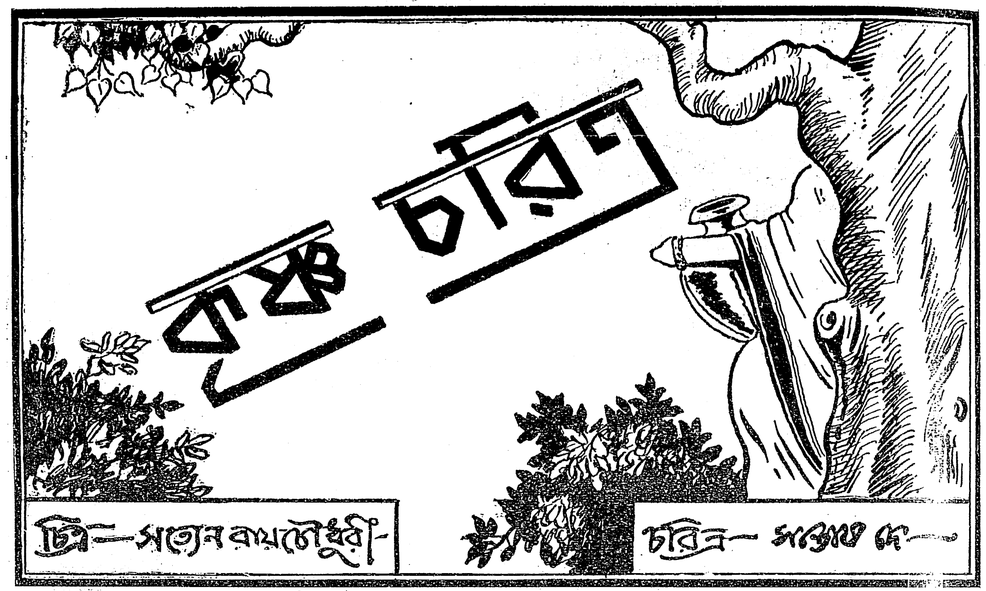

মা-বাপের দেওয়া নাম কৃষ্ণচরণ—গ্রামের লোকে ডাকিত কেষ্টা। আমরা বলিতাম 'কেষ্ট কুটুম-টু'-ইষ্ট অকুটুম'। আর বলিতে হইত না, কেষ্ট তাহার খেলাধূলা ফেলিয়া বাঁশরী না খুঁজিয়া সোজা বাঁশ লইয়া তাড়া করিত এবং আমরা অগত্যা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতাম।

শুনা যায়, এখন যেখানে কলিকাতা শহর বসিয়াছে পূর্ব্বে সেখানে কোথায় গোবিন্দপুর নামে একটি গ্রাম ছিল। গোবিন্দপুর থাকুক না-থাকুক, কলিকাতাকে গোকুল বলিতে আপত্তি করা চলে না। কারণ কেষ্ট তাহার মাসিমার কাছে কলিকাতার গোকুলে আসিয়া বাড়িতে লাগিল। মেশোমশাই নন্দলাল ঘোষ শ্রীযুক্ত এবং সম্পত্তি-শালী প্রফেসর বা অধ্যাপক, জীবিকা গো-চারণ বা ছেলে চরাণ। কেষ্ট দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যের ঘৃত ননী ছানায় পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহার দৌরাত্ম্যে কলিকাতার পাঠ্য অপাঠ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বৈ-ত্রৈ যাণ্মাসিক এবং বার্ষিক পত্র পত্রিকাগুলি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। সম্পাদককুল নাকের জলে চোখের জলে হইতে লাগিলেন—তবু কেষ্টকে শায়েস্তা করিতে পারা গেল না।

বলা বাহুল্য, কলিকাতায় আসিয়া কেষ্ট আর কৃষ্ণের চরণ শরণ করিয়া থাকিতে রাজি হইল না এবং অতিবিনয়ে নিজেকেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জাহির করিল। নন্দের আলয়ে শ্রীকৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন।

মাসিমা কেষ্টকে অত্যন্ত ভালো বাসিতেন—কারণ তিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং বোনপোটিকে পুত্ররূপে লালন করিতেছিলেন। মেয়ে-মহলে তাহার সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং নিজে শতমুখে কেষ্টর গুণ সকলের মধ্যে প্রচার করিতেন। কেষ্ট ভালো বাঁশী বাজাইতে জানে, শ্লীল অশ্লীল সাহিত্য রচনা করিতে জানে, স্নানের ঘাটে বান্ধবীদের স্নাপ নিতে জানে, হাসিতে জানে, গাহিতে জানে, এমন কি, সভ্যসমাজে মিশিতে অর্থাৎ পরিচিত অপরিচিত মেয়েদের সঙ্গে সহজে খাতির জমাইয়া লেক সিনেমায় বোটানিকালে লইয়া যাইতে জানে—ইত্যাকার অনেকানেক এবং অশেষ গুণ ছিল। মাসিমা সমস্তই উজ্জ্বল বর্ণনায় প্রকাশ করিয়া করিয়া কেষ্টকে এতই যশস্বী করিয়া তুলিলেন যে তাহাকে কেষ্টর মা যশোদা বলিয়া কাহারও আর সন্দেহ রহিল না।

কেষ্ট গোচারণে যাইত। কোশ্চেন আউট করিতে, মার্ক জানিয়া লইতে, নিদেন শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্যে

অক্ষয় কলেজ-জীবন লাভ করিতে শ্রীদাম সুদাম তো জুটিয়া ছিলই—অধিকন্তু একদল অবলা জীববিশেষও জুটিয়া গিয়াছিল। কেষ্ট তাহাদের যে মাঠে চরাইত সেই মাঠেই চরিত—কিছু বিচার করিত না, বিরোধ করিত না। সময় অসময়ে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে জমায়েত হইয়া রাখাল-রাজাকে সম্বর্দ্ধনা করিত। তাহার পর হেদো, গোলদীঘি, লালদীঘি, লেক, শিবপুর, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, মেট্রো, নাইট-হাউস, চিত্রা, রূপবাণী, ছায়া সর্বত্র চরিয়া বেড়াইত।

কেষ্টর দৌরাত্ম্যে জ্বালাতন হইয়া এতদিন পুরুষ-সমাজ নন্দ ঘোষকে জানাইতেছিলেন, কালক্রমে মা যশোদার নিকটেও অভিযোগ আসিতে লাগিল। আজ অভিযোগ আসে, বন্ধুদের বীণা ক্লাস পলাইয়া কেষ্টর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিল। সোনাবুড়ী পূজা দিতে গিয়াছিল—তাহার সঙ্গে দেখা হইতেই কেষ্ট সরিয়া গেল। কাল অভিযোগ আসে—রায়েদের অনিমার দেরাজে কেষ্টর কবিতা দেখা গিয়াছে। পরশু অভিযোগ আসে—মুখার্জ্জিদের মায়া নাকি কেষ্টর নামে চিঠি লিখিয়া রাখিয়াছিল—ইত্যাদি। এইরূপে পাড়া বে-পাড়ায় যে ঘরে ক্ষীর, ননী, ছানা, ঘি যাহাই থাকুক সেইদিকে কেষ্টর দৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

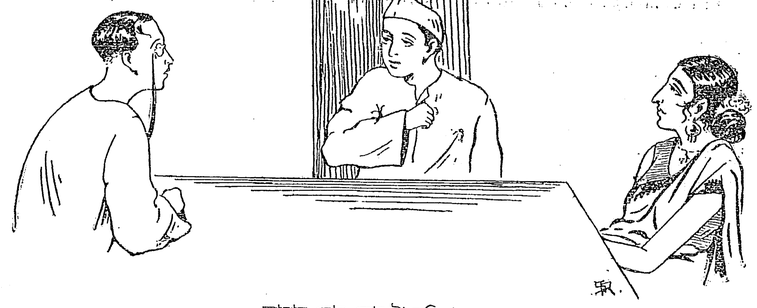

আয়ান ঘোষ লোকটা সুবিধার নহে

কেষ্ট কাহারও কথা গ্রাহ্য করে না। যা খুশী তাই লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাম জাহির করিতেছে। পার্কে, কমন-রুমে, ট্রামে, বাসে তাহার পালিত অবলা জীবগুলি সেই সব জানোয়ার কাটে। শ্রীদাম সুদাম শতমুখে রাখালরাজের জয়গান গায়। যেহুদল না বুঝিয়া সুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে হাম্বা হাম্বা রব করে।

এইবার আয়ান ঘোষের আবির্ভাব সম্ভাবনা দেখা গেল।

শ্রীমতী অর্থাৎ মিস্ রাধিকা দেবী বি-এ পোস্ট গ্রাজুয়েট ঘাটে তাহার ডিগ্রির কলসী পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন।

আসিয়া শুনিলেন মোহন বংশী বাজিতেছে। বাঁশী বন-মাঝে কি মন-মাঝে তাহা স্থির করিতে না করিতেই তাহা কানের ভিতর দিয়া একেবারে মরমে পশিয়া গেল।

স্থান—য়ুনিভার্সিটি হল, বিষয়—ছাত্রছাত্রী সম্মেলন। সময়—সায়ংসন্ধ্যা, অল্‌টারে ম্লান আলো জ্বলিতেছে—কেষ্ট তাহার বাঁশীতে পূরবী ধরিয়াছে। সমস্ত হলটি নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া শুনিতেছে। কি সুরের গমক—কি লীলায়িত লহরী—রাধিকা দেবী বি-এ আত্মহারা হইলেন। যখন নিজেকে কুড়াইয়া পাইলেন—দেখিলেন কি তাহার চক্ষু, কি মনোরম চশমা। নাম শুনিলেন শ্রীকৃষ্ণ—বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এটা যে কলিযুগ—তাহে রূঢ় কলিকাতা, হায়—হায়—হায়। কোথায় সেই শান্ত মধুর যমুনা-পুলিন, আকাশে ময়ূরকণ্ঠী মেঘ, দূর গ্রামে বনানী-শীর্ষে সন্ধ্যা নামিতেছে। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি উঠিল। এমন সন্ধ্যায় রাধা জল লইতে আসিয়াছে—আর বাঁশী বাজিয়া উঠিল। কলসী ভরা হইল না, ভরা হইলেও উঠা গেল না, উঠিলেও পা চলে না, চলিলেও কদম্বমূলে আসিয়া থামিয়া গেল। ত্রিভঙ্গিমঠামে শ্যাম দাঁড়াইয়া আছে—হাতের মধুর মুরলী বন্ধ হইয়াছে।

রাধিকা দেবী বি-এর চমক ভাঙ্গিল, দেখিল অল্‌টারে কেহ নাই। মিঃ আয়ান ঘোষ হাতে চাপ দিয়া বলিলেন—চল, ওঠা যাক্।

উঠিতে হইল, কিন্তু পা চলিলেও মন যে চলে না।

পরদিন। সুপ্রভাত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ

নাই, কারণ রাধিকা দেবী পরিষ্কার দেখিলেন—সেই শ্যাম, সেই কানাইয়ালাল, সেই বাঁশরীওয়ালে। হাতে একটা লেদার বাউণ্ড খাতা লইয়া লিফট্ দিয়া নামিতেছে। কলসী নাই যে বগ্‌বগ্ করিয়া শব্দ করিবে। অগত্যা হাতের ভারী পেন্‌সন্‌খানা সে মেজেতে ফেলিয়া দিল। শব্দে শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া তাকাইল—চোখোচোখি হইয়া গেল। বিদ্যুৎ নয়, শরীরের ভিতর দিয়া যেন একটা লজ্জার তরঙ্গ বহিয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ আগাইয়া আসিয়া বইটা তুলিয়া দিল। কোন সুযোগ সে অপব্যয় করে না। বলিল—ইকনমিক্‌স্ পড়েন বুঝি?

রাধিকা দেবী বলিলেন—হ্যাঁ, আপনি?

আমি? শ্রীকৃষ্ণ কি উত্তর দিবে? ফোর্থ ইয়ারে এই চার বছর হইল। মেশোমশাই বলেন—তুই বরং আমার বদলি চেয়ারে বসা আরম্ভ কর্। ও ক্লাসটায় আমার চেয়ে তোর বেশী অধিকার জন্মেছে। কেষ্ট মাথা চুলকাইয়া বলিল—মানে, ইয়ে—আমি বি-এ পরীক্ষা দিয়ে থাকি। মা যশোদা বলেন—কানু আমার কক্ষণো মিথ্যে কথা বলে না।

রাধিকা দেবীর মনে হইল—ইকনমিক্‌স্ ক্লাস ছাড়িয়া দিবেন। কয়েক দিন ক্লাসে না যাইয়া অস্বস্তি বাড়িল এবং অবশেষে আবার বাহির হইতে লাগিলেন।

ইহার পর কেষ্টকে যখন তখন য়ুনিভার্সিটির কাছাকাছি পাওয়া যাইতে লাগিল। শ্রীদাম সুদামের দল কেষ্টর নাগাল পায় না। দেখা হইলে কেষ্ট বলে—এ বছরটাও মাটি করিস নে—এখন থেকে পড়াশুনা আরম্ভ কর। মুখে যে এত দীর্ঘচ্ছন্দী উপদেশ দিতে পারে ক্লাসে তার পাত্তা পাওয়া যায় না কেন? কেষ্ট অবশ্য বলে—নোটস্ সবই আমার নেওয়া আছে, ঘরে বসে স্টাডি করি। কিন্তু ঘরেও দেখা না, মেলায় খোঁজাখুঁজিতে সব রহস্য বাহির হইয়া পড়িল।

মা যশোদা সত্যই বলেন—কানু কক্ষণো মিথ্যা বলে না। কেষ্ট স্টাডিই করিতেছিল। রাধিকা দেবী বি-এর সঙ্গে সে এইরূপ চুক্তি করিয়াছে যে, সে তাহাকে আধুনিক কবিতা লিখিতে শিখাইবে এবং বাঁশী শুনাইবে। রাধিকা দেবী বি-এ কেষ্টকে পলিটিক্‌স্ পড়াইবেন। ইহাকেই বলে ভবিতব্য—ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাণ্ড রাজনৈতিক সমস্যার টাল সামলাইতে হইবে তাই বুঝি পলিটিক্‌স্‌টা এখনই ঝালানো সুরু হইল।

দিনের পর দিন যায়—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকুঞ্জে যাতায়াত করেন। পলিটিক্‌স্ পড়েন, রাধিকা দেবীর সঙ্গীত শুনেন। চা চলে, বাঁশী চলে; হাসি চলে। মাসি কিছুটা শুনেন, কিছুটা শুনেন না। দশজনের কথা তিনি কানে তোলেন না। শেষে কি-না মাসি সঙ্গী পাইয়া কাশী গয়া শ্রীক্ষেত্র ভ্রমণে বাহির হইলেন। কেষ্টকে আর পায় কে!

কিন্তু আয়ান ঘোষ লোকটা সুবিধার নহে। উৎকট পুরুষ—না আছে রসজ্ঞান, না আছে স্তুতিবাদ। যাহা বলে একেবারে পরিষ্কার সোজা কথা। কচিৎ কখনও আসে—আসে একেবারে ঝড়ের মত। যতক্ষণ থাকে যেন জ্বলন্ত বহ্নি, তাহার কাছে এতটুকু শীতল কোমলতা নাই। অমন বিরাট পৌরুষ চেহারা—যেন শতমুখে শাণিত। তাহার কাছে কোন কারুণ্য নাই, নির্দয় কঠিন বিচারে সমস্তই বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। কেষ্ট তাহার সামনে যেন কেঁচো হইয়া যায়, বাঁশী লুকাইয়া রাখে, কবিতার খাতা বন্ধ করে, পলিটিক্সের পাতা এলোমেলো উল্টাইয়া যায়। এত চতুর, এত মুখর শ্রীকৃষ্ণ যেন পাথরের ঠাকুর বনিয়া যায়। রাধিকা দেবী আয়ানের সঙ্গে আলাপ করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দেন। আয়ান শুধু কথায় কথায় বলে—'এক্‌জাক্‌ট্‌লি', বলার ভঙ্গিতে মনে হয়, এক একটা বুলেট বাহির হইতেছে। এক কথায় কেষ্ট আয়ান ঘোষকে পছন্দ করে না। তবু রাধিকা দেবীর নিকট তাহার অনেক তত্ত্বই শুনিয়াছে। নাম ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ—অর্থাৎ মিঃ আই-এন-ঘোষ। আই-এন মুখে মুখে আয়ান হইয়াছে। আইন কলেজে নাম আছে—কিন্তু যাহা করিয়া বেড়ায় প্রায় সবই বে-আইনি। কিন্তু যেজন্য সে কাহাকেও ভয় করিয়া চলে না। ভাবে ভঙ্গিতে বুঝা যায়, রাধিকা দেবী তাহার অনুরক্তা শিষ্যা—মুখ্যত এবং গৌণত—সর্ববিষয়ে।

সূর্যবতী বসু বর্দ্ধমানের মেয়ে—কলিকাতায় আসিয়া নৃত্যকুশলা বলিয়া নাম অর্জন করিয়াছেন। তাহারই বোন চন্দ্রাবতীর বেথুনে বি-এ ফোর্থ ইয়ার। য়ুনিভার্সিটি জলসায় তিনি নাচিতেন—দিদির কাছে শেখা নাচ। চন্দ্রাবতী

নাচিল—কেষ্ট বাঁশী বাজাইল। গ্রীনরুমে ফিরিয়া চন্দ্রা বলে—চমৎকার আপনার বাঁশী, আমার নাচ খুলে দিয়েছেন। কেষ্ট বলে—আপনার নাচের তালেই আমার বাঁশীর সুর ফুটেছে। পরদিন কাগজে কাগজে চন্দ্রার নৃত্যচপলামূর্তির পাশে বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের ফোটো ছাপা হইল। চন্দ্রাবতী এবং শ্রীকৃষ্ণ-পরিচয় নীচে লেখা। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবতী কুঞ্জে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন—চায়ের নিমন্ত্রণ লঙ্ঘন করিতে নাই।

রাধিকা দেবী সব দেখিলেন—শুনিলেন। ছাত্রটি যে প্রায়ই অনুপস্থিত হইতেছেন তাহাতে তিরস্কার অভিমানও করিলেন। অবশেষে একদিন ললিতা আসিয়া সংবাদ দিল—শ্রীকৃষ্ণ আর এক পাঠ সুরু করিয়াছেন। চন্দ্রাবতীর নিকট মোটর ষ্টিয়ারিং ধরিতে শিখিতেছে। কে জানে ভবিষ্যতে গাণ্ডীবীর সারথ্য করিবার ইহাই ভূমিকা কি-না।

কয়েক দিন পরের ঘটনা। কাগজে কাগজে রাষ্ট্র হইয়া গেল—ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রাজদ্রোহীরূপে বন্দী হইয়াছে। ইন্দ্রনারায়ণ অর্থাৎ আমাদের পূর্বপরিচিত আয়ান। শ্রীকৃষ্ণ সুযোগ বুঝিয়া রাধিকা দেবীর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখে সর্বনাশ। এ আর অভিনয় নয়, অভিমান নয়, তিরস্কার নয়, রাধিকা দেবী গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পলিটিক্‌সের কথা তুলিল—রাধিকা দেবী মার্ক্‌স্‌বাদ বুঝাইলেন। বলিতে বলিতে সবহারাদের বেদনায় তাহার চিত্ত উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ চমকিয়া গেল—কবিতা নাই, বাঁশী নাই—রাধিকা দেবী যেন সহসা কত কঠিন, কঠোর এবং দুরধিগম্য হইয়া পড়িয়াছেন। আয়ানের অনুপস্থিতিতে তাহার সত্তাটাই যেন রাধিকা দেবীতে বর্তাইয়াছে। কেষ্টর মনে হইল—এখনি বুঝি তিনি আয়ানের মত 'একজাক্‌টলির' বুলেট ছাড়িতে আরম্ভ করিবেন। গতিক সুবিধার নয় বুঝিয়া কেষ্ট সরিয়া পড়িল।

কিছুকাল পরের ঘটনা। এবারও যথা সময়ে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল, চন্দ্রাবতী ইংরেজীতে অনার্স পাইল, তাহার দিদির সঙ্গে য়ুরোপ গেল—শ্রীকৃষ্ণ জাহাজ ঘাটে রুমাল নাড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, শ্রীদাম সুদামের দলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও ক্রস লিস্টে উঠিয়াছেন। এইবার ধরিয়া পাঁচবার হইল। মাসিমা সেই যে গিয়াছেন

চন্দ্রার নৃত্যচপলা মূর্তির পাশে বংশীবদন
শ্রীকৃষ্ণের ফোটো ছাপা হইল

আর এখনও ফিরে নাই, মেশোমশাই একদিন ডাকিয়া বলিলেন—পঞ্চাঙ্ক নাটক এখানেই শেষ হ'ল। বি-এ পাশ করেও তো কোন লাভ নেই। তার চেয়ে বরং পাইলট্ হ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণকে দেখা গেল, মাস্টার বুইকে দম্‌দমায় উড়িতে যাইতেছেন। এখন আর আমাদের সন্দেহ নাই যে, ভবিষ্যৎ কুরুক্ষেত্রে তাঁহাকেই অর্জ্জুনের সারথ্য করিতে হইবে।

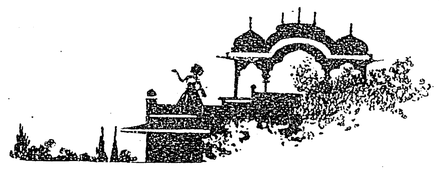

বঙ্গভাস্কর্য্যে সূর্য্যমূর্ত্তি

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সান্যাল

মানবমন স্বভাবতই সৌন্দর্য্যপ্রিয়। ভারতের অগণ্য মূর্ত্তি-শিল্পের নিদর্শনে ভারতবাসীর স্বভাব-সৌন্দর্য্যই প্রতিভাত হয়। আজ রসবিদ্‌দের সম্মুখে এক নূতন শিল্পজগৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালীর শিল্পজগৎ, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন দেবদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তিনিচয় বাংলার কারুশিল্পের পরিচায়ক। বাঙ্গালীর গৌরব-গরিমা-মণ্ডিত অতীত বিস্মৃত বিদ্যার দ্যুতিচ্ছটা আজ অনুসন্ধিৎসু সুধীসমাজের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রকাশ পাইয়াছে। ধীমানের ধীশক্তির প্রভা, বীতপালের নির্ম্মাণচাতুর্য্য পাষাণ প্রতিমায় খাঁটি নিভাঁজ বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে।

সূর্য্যপ্রতিমা ভাস্করের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কৃষ্ণ প্রস্তরে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত অলোকসাধারণ মনোহর দেবপ্রতিমা। দিন-মণির মুখেচোখেওষ্ঠেনয়নেনাসিকায় সর্ব্ব অবয়বে কিশোরের কোমলতা, জীবনের সাড়া যেন ফুটিয়া উঠিতেছে।

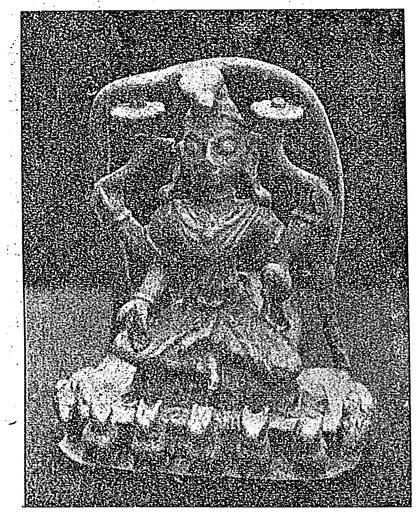

চতুর্ভুজ সূর্য্যমূর্ত্তি—মঙ্গলবাড়ী (দিনাজপুর)

সূর্য্যপূজা বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। সূর্য্য-মূর্ত্তির সর্ব্বপ্রথম পরিকল্পনার নিদর্শন আমরা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে দাক্ষিণাত্যের ভাজা বিহারের ভিত্তি-গাত্রে খোদিত মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। তথায় সূর্য্যদেব চতুরশ্ব সংযোজিত একচক্র রথে সমাসীন। অনন্ত গুম্ফা ও লাহুলের সূর্য্যমূর্ত্তি যদিও ভাজার সমসাময়িক, তথাপি এখানে সূর্য্যের উভয়পার্শ্বে ধনুর্ব্বাণ হস্তে ঊষা ও প্রত্যূষাকে দেখিতে পাই। তৎপরবর্ত্তী যুগে মথুরার শক-কুষাণ শিল্পীগণ-

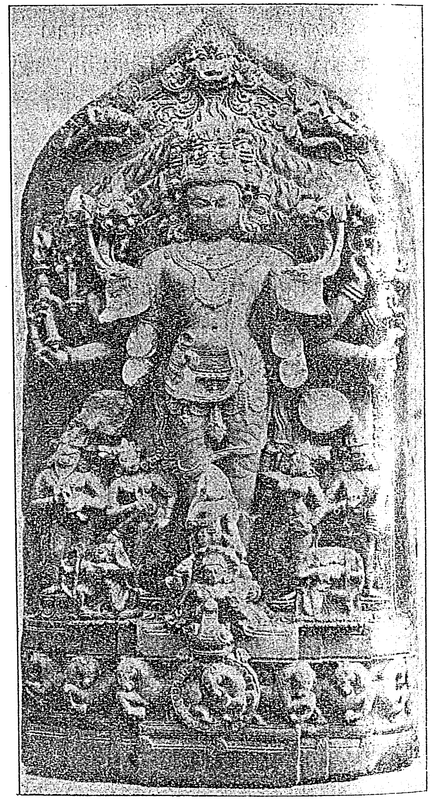

মার্ত্তণ্ড ভৈরব 'মান্দা' (রাজসাহী)

কৃত সূর্য্য প্রতিমায় বহু পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। কখনও

উপবিষ্ট। তাঁহার বামহস্তে অসি এবং দক্ষিণ হস্তে গদা—পরিচ্ছদ উদীচ্যরীতির, যথা—সুদীর্ঘ শিরোভূষণ, আজানুলম্বিত গাত্রাবরণ ও পদদ্বয়ে বুট জুতা। পরবর্ত্তী গুপ্ত যুগের শিল্পীগণ এবম্প্রকার পাষাণ প্রতিমাই নির্ম্মাণ করিতেন বটে, তবে তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব অঙ্গলালিত্য ও ভাবের অনবদ্য অভিব্যক্তি ফুটাইয়া তুলেন। তারপরে পাল যুগের শিল্পীগণ তাঁহাদিগের অনন্য প্রতিভা দ্বারা সূর্য্যমূর্ত্তির আমূল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধন করেন। বৈদেশিক উদীচ্য বেশের পরিবর্ত্তে নূতন দেশী আবরণ প্রচলন করেন। সূর্য্যদেবের পরিধানে সাধারণ ধুতি, উত্তরীয় উরুদেশ হইতে উঠিয়া গলদেশে স্থান পাইয়াছে। যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে এবং মস্তকে ষট্-কোণবিশিষ্ট কিরীট মুকুট। উদীচ্য বেশের শেষ চিহ্ন-স্বরূপ শুধু বুট জুতা রহিয়া গিয়াছে।

পাল-শিল্পী সূর্য্যমূর্ত্তি নূতন সাজে সাজাইলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের পাষাণ প্রতিমায় যে ভাববৈশিষ্ট্য ও অঙ্গলালিত্য পরিলক্ষিত হইত তাহা আর ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেন না। অলঙ্কারপ্রাচুর্য্য পাল-শিল্পীগণের বৈশিষ্ট্য, বোধ হয় ভাবের অভিব্যক্তি ও অঙ্গলালিত্যের অভাব পরিপূরণের জন্যই পাল-শিল্পী অলঙ্কারপারিপাট্যে অধিকতর মনোযোগী হইলেন। উপরন্তু সূর্য্যপ্রতিমায় আরও তিনটি স্ত্রী-মূর্ত্তির পরিকল্পনা করিলেন। ইঁহারা সূর্য্যদেবের তিন নারী : রাজ্ঞী বা সুরেলু, নিক্ষুভা বা ছায়া এবং পৃথিবী বা মহাশ্বেতা।

সূর্য্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণের নির্দ্দেশ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই। খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে মুসলমান আগমন পর্য্যন্ত বাংলা দেশে বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজার পর সূর্য্যমূর্ত্তি পূজা যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তাহা উক্ত মূর্ত্তিনিচয়ের সংখ্যাধিক্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। অধুনা যদ্যপি সূর্য্যমূর্ত্তি পূজা বিশেষ দেখা যায় না, তথাপি আমাদের অন্তপুরিকারা এখনও নানা ব্রতানুষ্ঠানে সূর্য্য পূজা করিয়া থাকেন। (মাঘমণ্ডল ব্রত) বাংলা দেশে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সূর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রথম উপবিষ্ট, দ্বিতীয় দণ্ডায়মান। এক্ষণে আমরা এই বিভিন্ন শ্রেণীর মূর্ত্তির পরিচয় একে একে বিবৃত করিবে।

উপবিষ্ট সূর্য্যমূর্ত্তি চতুর্ভুজ ও দ্বিহস্তবিশিষ্ট পাওয়া গিয়াছে। দ্বিহস্ত সমন্বিত পাষাণে খোদিত সূর্য্যমূর্ত্তিখানি এখন কলিকাতা যাদুঘরে রহিয়াছে। সপ্তাশ্ব সংযোজিত একচক্র রথে দিনমণি পদ্মোপরি বজ্রপর্য্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট। পদদ্বয়ে বুট জুতা, পরিধানে কটিদেশ বেষ্টন করিয়া ধুতি, তৎসহিত সকোষ অসি সংরক্ষিত, গলায় হার, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে বলয় ও বাহুবন্ধ এবং শিরে কিরীট মুকুট। উভয়হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম। সূর্য্যদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে লেখনী ও মসীর

ষড়্‌ভুজ সূর্য্যমূর্ত্তি মহেন্দ্র (দিনাজপুর)

আধার, হস্তে পিঙ্গল বা ধাতা এবং বামে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে দণ্ড বা দণ্ডী। উভয়পার্শ্বে তাঁহার পত্নীদ্বয় রাজ্ঞী বা সুরেলু ও নিক্ষুভা বা ছায়া। পশ্চাৎ শিলায় সূর্য্যদেবের উভয়পার্শ্বে নবগ্রহের অষ্ট মূর্ত্তি বিরাজমান। মস্তকের উপর পশ্চাৎ শিলায় অগ্নিশিখা ও দুইটি প্রতীক্ রহিয়াছে।

অপরখানি তাম্রে খোদিত। এক্ষণে উহা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহাগারে রহিয়াছে। ধুতি ও উত্তরীয় সজ্জিত চতুর্ভুজ সূর্য্যদেব সপ্তাশ্ব চালিত রথে উপবিষ্ট। উপরের দুই হস্তে পদ্ম এবং নীচের দুই হস্তে বরদ (বাম) এবং অভয় (দক্ষিণ) মুদ্রা। সূর্য্যদেবের পশ্চাতে পদবিহীন সূর্য্য-সারথি অরুণ রশ্মিহস্তে রহিয়াছে। তন্ত্রসারে এবম্প্রকার সূর্য্যমূর্ত্তির এইরূপ ধ্যান পাওয়া যায় ঃ

রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়া ভয়বরান্ দধত করাব্জৈ
মাণিক্য মৌলিমরুণাঙ্গ রুচিনং নমামি।

দণ্ডায়মান মূর্ত্তি তিন প্রকারের পাওয়া যায়। প্রথম, দ্বিহস্ত-সমন্বিত সূর্য্যদেব সপ্তাশ্ব চালিত একচক্র রথে পদ্মোপরি দণ্ডায়মান। উভয় হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম। উভয়পার্শ্বে ঊষা

দ্বিভুজ সূর্য্যমূর্ত্তি ঝেড়া (রাজসাহী)

ও প্রত্যূষা—সূর্য্যদেবের দুই নারী সুরেলু এবং ছায়া। পুরোভাগে পৃথিবী। দুই পার্শ্বে দুইটি পুরুষ মূর্ত্তি যথাক্রমে পিঙ্গল ও দণ্ডী এবং সম্মুখে সূর্য্য-সারথি অরুণ রশ্মি হস্তে। বিশ্বকর্ম্ম শিল্পে ইহার ধ্যান এই প্রকারের পাওয়া যায়—

একচক্রং সসপ্তাশ্বং সসারথিং মহারথম্।
হস্তদ্বয়ং পদ্মবরং কঞ্চুকঞ্চর্ম্ম তক্ষসং।

* * *

নিক্ষুভা দক্ষিণে পার্শ্বে বামে রাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা
একবক্ত্রাঙ্গিতো দণ্ডো স্কন্ধস্তেজো করাম্বুজং।
চতুর্বাহু দ্বিহস্তোবা * * *
দণ্ডশ্চ পিঙ্গলশ্চৈব দ্বারপালো চ খড়্গিনী।

ইহা ছাড়া অগ্নিপুরাণ, বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর এবং মৎস্য পুরাণেও সূর্য্যদেবের অনুরূপ ধ্যান পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রকারের দণ্ডায়মান যে মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা ষড়ভুজ। ইহা এক বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহাগারে আছে। সূর্য্যদেবের পরিধানে উষ্ণীষ বেশ এবং সপ্তাশ্ব চালিত একচক্র রথে পদ্মোপরি দণ্ডায়মান। উভয়পার্শ্বে গতানুগতিক পার্শ্বচরবৃন্দ ও স্ত্রীমূর্ত্তি। স্বাভাবিক দুই হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম অপর দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে অক্ষমালা ও বরদ মুদ্রা এবং বাম হস্তদ্বয়ে অভয় মুদ্রা ও কমণ্ডলু।

এক্ষণে যে সূর্য্যমূর্ত্তির আলোচনা করিব তাহা সূর্য্য ও ভৈরবের সমাবেশে খোদিত হইয়াছে। ইহা মার্ত্তণ্ড ভৈরব নামে পরিচিত। এই প্রকার সূর্য্যমূর্ত্তির ধ্যান সারদা-তিলকে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

হেমাম্ভোজ প্রবালপ্রতিমণিজরুচিং চারু খট্টাঙ্গ পদ্মৌ
শক্তিং চক্রং চ পাশং শৃণিমতি রুচিরামক্ষমালাং কপালং
হস্তাম্ভোজৈর্দধানং ত্রিনয়নং বিলসদ্বেদবক্ত্রাভিরামং
মার্ত্তণ্ডং বল্লভার্দ্ধং মণিময় মুকুটং হারদীপ্তং ভজামি।

কিন্তু উল্লিখিত ধ্যানে আট হাত সমন্বিত সূর্য্যদেবের বর্ণনা রহিয়াছে এবং আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিখানি দশ হাত বিশিষ্ট। এই সামান্য পার্থক্য ছাড়া আলোচ্য সূর্য্য-প্রতিমাখানি উল্লিখিত ধ্যানানুমোদিত।

সূর্য্যদেবের শিরে জটা মুকুট রহিয়াছে। মুখমণ্ডল শ্মশ্রু-সমন্বিত ও ঈষদুন্মুক্ত। দশ হস্তের ছয় হস্ত বিদ্যমান ও

ভগ্নমূল হইতে বুঝা যায় আরও চারি হস্ত ছিল। দক্ষিণ পার্শ্বের বিদ্যমান তিন হস্তে যথাক্রমে নীলোৎপল, ডমরু ও সর্প রহিয়াছে। পরিধানে ধুতি, যজ্ঞোপবীত, অলঙ্কার এবং পদদ্বয়ে বুট জুতা রহিয়াছে। উভয়পার্শ্বে স্ত্রী মূর্ত্তিদ্বয় সুরেলু এবং ছায়া এবং পুরুষ মূর্ত্তিদ্বয় পিঙ্গল ও দণ্ডী রহিয়াছে। তাঁর ধনু হস্তে ঊষা ও প্রত্যূষা। পুরোভাগে সূর্য্যদেবের পদদ্বয়ের মাঝে মহাশ্বেতা ও তৎসম্মুখে সূর্য্য-সারথি পদবিহীন পক্ষযুক্ত অরুণ রশ্মি হস্তে রহিয়াছে। পশ্চাৎশিলায় অগ্নি-শিখা এবং সর্ব্বোপরি কীর্ত্তিমুখ।

শিল্পনৈপুণ্যের দিক দিয়া উল্লিখিত মূর্ত্তিনিচয় অনিন্দ্যনীয়; এমন কি, যাঁহারা কলাবিদ্ নহেন তাঁহারাও প্রথম দৃষ্টিতে এই সকল পাষাণপ্রতিমার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হইয়া পারেন না।

ভাদরে

কাদের নওয়াজ

১

আজ ভাদরে আদর উথল্
শস্পে-ঢাকা গাঙের কূলে—
উড়্ছে ধবল উত্তরী কার
ঢেউ খেলানো কাশের ফুলে;
ছায়ায় ঘেরা কুঞ্জবনে
উঠ্ছে গীতি গুঞ্জরণে,
দুল্ছে কচি মঞ্জরী ওই,
সবুজ কাঁচা ধানের ক্ষেতে,
বাদর ধারায় গান গেয়ে আজ
ভাদর এল হর্ষে মেতে।

২

বিলের জলে, ডাহুক ডাকে
শুশুকগুলা পলায় ত্রাসে,
চক্রবাকের বক্রসারি
ঐ ভেসে যায় নীল আকাশে।
স্বপন দেখে কাজ্‌লা পুকুর,
ঝিলিক্ ঝলে জলের মুকুর,
স্বচ্ছ শীতল সে আয়নাতেই
ভাদর-রাণী মুখ দেখে আর—
সিঁদুর পরে সিঁথিতে তার,
জড়িয়ে খোঁপায় সাত-নরী-হার।

৩

ভাদর-রাণী উড়িয়ে আঁচল,
দেখ্‌ছে শোভা বকের সারির,
প্রজাপতি উড়্‌তেছে তার,
কল্কা হয়ে সবুজ সাড়ির,
সন্ধ্যা তাহার অলক-গুছি,
কপালে টিপ্ মেঘের কুচি;
আল্‌তা-রাঙা চরণতলেই
রক্তা-কমল উঠ্‌ছে ফুটি,
ভোম্‌রা হ'য়েই উড়্‌তেছে তার
কাজল-কালো নয়ন দুটি।

৪

চেয়েই আছি আকাশ পানে,
ছেয়েছে মাঠ সবুজ ধানে,
বন্-জুঁয়েরি পাই যে সুবাস,
মুগ্ধহৃদি চাষার গানে,
ভাব্‌ছি হয়ে আত্মহারা,
অনশনেই ম'রছে যারা,—
ভাদরে হায় তাদের ঘরেও
জ্বল্‌বে না কি আশার বাতি
নয়নে মোর অশ্রু-ছাপায়
পাইনে খুঁজে ব্যথার সাথী

মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বানুস্মৃতি

মাণিক পেয়াদার আখড়ায় পুলিস দিয়েছে হানা। ওরা ধরা প'ড়েছে—মাণিক, রাধা, পদ্ম, গোলাম, আরও অনেকে।

অতসীরা উঠে এসেছে নতুন বস্তিতে। কিন্তু ঠাঁই বদ্‌লালেই পয় বদ্‌লায় না। কপাল এসেছে ওর সঙ্গে। পথ তবুও ছিল ভাল। এখানে এসে জুট্‌ল আবার এক নতুন বিপদ। এরাও অনেকে ভিক্ষে করে; কিন্তু সেটা শুধু দিনের বেলায়। রাতের অন্ধকারে এদের রূপ বদ্‌লে যায়। সকাল থেকে সারাটা দিন এত বড় বস্তিতে পুরুষের সাড়া-শব্দও থাকে না; মনে হয়, মেয়ে রাজ্য। কালো, মোটা, রোগা, ঘেয়ো—রকমারি ঝি আর বোষ্টুমির দল ভাড়া নিয়েছে এক-একখানা পায়রার খোপের মত ছোট ঘর। মাণিক পেয়াদার মত ঠিকে-ভিখিরীর সর্দ্দার কেউ নেই বটে, কিন্তু আখড়াওয়ালা আছে। তাকে এরা বাবাজী বলে। সে-ই ভাড়া নিয়েছে এদিকে সবগুলো ঘর, তাই থেকে এক-একখানি বিলি ক'রেছে খুচ্‌রো ভাড়াটেদের কাছে।

লোকটার নাম শিবু মহান্ত। গোল-গাল মোটা কালো চেহারা; মাথায় কাঁচা-পাকা চুলের মস্ত একটা টিকি, গলায় কাঠের মালা। তিলক আঁকে না, কিন্তু নেশা করে। বড় তামাকের ছোট কল্‌কে আর স্যাঁপিখানা ট্যাঁকেই থাকে।

অতসী যেদিন অন্ধ বাপের হাত ধ'রে এসে ভাড়া চাইলে একখানা ঘর, শিবু একমুখ হেসে দেখিয়ে দিল ঠিক ওরই পাশের ঘরখানা। মাসিক ভাড়া সাড়ে-তিন টাকা। ভাড়াটা মাসের শেষে একসঙ্গে দিতে হবে শুনে অতসী প্রথমটা সাহস পায় নি। কিন্তু শিবু যখন আগাগোড়া শুনে ওর কথাতেই হ'ল রাজী, তখন অতসীর আপত্তি করবার আর রইল না বিশেষ কিছু। তবে শিবুর চোখদুটো দেখে গোড়া থেকেই লাগ্‌ল কেমন একটা খট্‌কা।

অতসী ইতস্তত ক'রে কোন কথা ব'ল্‌বার আগেই শিবু তেমনি হাসির সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে—"কোন নাকাল হবে না তোমাদের। দু'দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। শিবু মহান্ত থাক্‌তে—হেঁ—হেঁ।"—আবার হাসে। চোখদুটো ওর ভাঁটার মত ঘোরে।

বেলা তখন শেষ হ'য়ে এসেছে। সারাটা দিন তেতে-পুড়ে অতসী অতি কষ্টে খুঁজে বের ক'রেছে এই ঘরখানা। রাতের মুখে এটা ছেড়ে নতুন ক'রে খুঁজে দেখবার ধৈর্য্য ওর সত্যি আর ছিল না তখন।

ঘরখানা আগেকার চেয়ে অনেক বড়। তাই কোন রকমে কুলিয়ে যায়। এবার আর অভসী দীনুর জন্যে আলাদা ঘর ভাড়া করে নি। এক পাশে থাকে অতসী আর ওর বাবা; অন্য দিকে দীনুর সেই বিছানা।

দীনু যেন হঠাৎ কেমন ব'দ্‌লে গেছে। অতসী প্রাণপণ শক্তিতেও তাকে সব দিন পারে না আট্‌কে রাখ্‌তে। নিজের খেয়াল-খুশী মত কখনো তিন দিন পড়ে থাকে ও সেই ছেঁড়া মাদুরখানায়, কখন বা তিন দিন পর অতসী সারা শহর খুঁজে ধরে আনে জোর ক'রে। অতসীর জোরে সে অবশ্য বাধা দেয় না কোন দিন; কিন্তু নিজেকে মাঝে মাঝে এমন ক'রে সরিয়ে নেয় তার নাগালের বাইরে যে, অতসী প্রাণান্ত চেষ্টাতেও পারে না ফিরিয়ে আন্‌তে ওর সেই পোষমানা দুরন্ত মানুষটাকে।

অতসী কাঁদে। কখন কখন দিনের পর দিন নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ে ওর চোখের জল। উপেন হয় ত বুঝ্‌তে পারে তার সেই আর্দ্রতা; কিন্তু সাবধানে এড়িয়ে চলে, পাছে ওর বালির ঘর ভেঙে পড়ে। মেয়েটাকে এতদিন ও শুধু ফাঁকি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে।—উপেন কতদিন লক্ষ্য ক'রেছে, অতসী রাস্তার ভিখিরী ছেলেগুলোকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে, তাদের হাতে তুলে দেয়—ওর ভিখ্ মেগে আনা টুকিটাকি খাবারগুলো।

দীনু যখন থাকে না, অতসীর ওপর শিবু মহান্তর নজরটা অপ্রত্যাশিত ভাবে যায় বেড়ে। অতসী বিব্রত হ'য়ে পড়ে। শিবুর চোখদুটো দেখ্‌লে ওর ভয় হয়। শাদা, লাল আর কালো, তিনটি রঙের অদ্ভুত সংমিশ্রণে চোখদুটোর চেহারা যেন কেমন বীভৎস হ'য়ে উঠেছে।

অতসী ভাবে: দুটো সেবাদাসীতেও মিন্‌সের মন ওঠে না! ও যেন কি। মনে হয়, ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে অন্য বস্তিতে পালিয়ে বাঁচে; কিন্তু ভরসা হয় না, পাছে দীনু এসে ফিরে যায় সন্ধ্যের মুখে। সারাদিনের উপোস ঘাড়ে ক'রে একবার যদি এসে ফিরে যায় ওর দরজা থেকে, তা হ'লে আর হয় ত সারা শহর খুঁজেও অতসী পাবে না তার দেখা।

দীনুর মাথার কাছে ব'সে এক-একদিন অতসী কথায় কথায় ব'লে ফেলে—"চল আর কোথাও উঠে যাই। ভাল লাগে না এখানে।"

দীনু হাসে। হয় ত বা একটুক্ষণ কি ভেবে অতসীর পিঠের ওপর দিয়ে হাতখানা বাড়িয়ে বলে—"বেশ ত। কিন্তু ভাল কি সেখানেই লাগ্‌বে অতসী? ভাল লাগা ত সবারই জন্যে নয়।"

অতসীর দুঃখ হয়। মনে হয়, দীনু বোঝে না ওর কষ্ট। অভিমানের সুরে বলে—"তোমার কি বল? যখন খুশী পালিয়ে বেড়াও; পথে পথে ঘুরে তোমার কাটে ভালই। আর আমি রাত কাটাই ওই অন্ধ বাপের আড়ালে ব'সে। ভয়ে মরি। লোকটার চোখে যেন ঘুম নেই; সারা রাত পায়চারি করে ঘরে আর বাইরে। আমাদের দরজার সাম্‌নে খস্‌খস্ করে ওর পায়ের শব্দ।"

"মানুষের পায়ের শব্দে ভয় পাও অতসী? শুনে আমার হাসি পায়।—তোমার দোষ নেই। সারাটা দুনিয়া জুড়ে ওই ভয়! একদল মানুষ শুধু চোখ রাঙাতেই এসেছে পৃথিবীতে, আর একদল তাদের সেই চোখ-রাঙানির ভয়ে হাত-পা পেটের ভিতর গুটিয়ে সরে' দাঁড়িয়েছে পথের পাশে। এরা শুধু শিখেছে কাঁদ্‌তে; নিজের অন্নমুষ্টি পরের হাতে তুলে দিয়ে, এরা আঁচল পেতে কাঁদে।"—দীনু হেসে ওঠে।

ওর এই বেয়াড়া হাসির অর্থ অতসী কোন দিনই বোঝে না, হয় ত বুঝ্‌বেও না আর। ও শুধু হতভম্বের মত চেয়ে থাকে দীনুর মুখপানে।

দীনু আবার হেসে বলে—"কোকেন-খোর দেখেছ অতসী, যারা কোকেনের নেশা করে?"

"না।—ও ঘরের ওই খোট্টা বুড়িটা কি বলে জানো?" কণ্ঠস্বর একটু খাটো ক'রে অতসী ঝুঁকে পড়ে দীনুর কানের কাছে।—"বুড়ি বলে, লোকটা নাকি আগে চালানি কারবার ক'রত।"

—"কোকেন?"

—"না গো, না। মেয়েমানুষ চালান দিত চা-বাগান আর মরিচ বনে।" অতসীর মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়।

—"যখন দিত, তখন দিত। এখন ত আর দেয় না চালান? দিতে চাইলেই বা পাবে কোথায়?"—একদৃষ্টে অতসীর মুখপানে চেয়ে থেকে দীনু হঠাৎ প্রসঙ্গটা উল্টে দিয়ে বলে—"আচ্ছা অতসী, তুমি পার না আমাকে মুক্তি দিতে?"

দীনুর কথায় অতসী বোধ হয় প্রথমটা আঁৎকে ওঠে; তার পর নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে বলে—"আমি ত তোমাকে ধরে' রাখি নি দীনু! বামন হ'য়ে চাঁদ ধরতে চাইবই বা কেন? তুমি পথে পথে ঘুরে বেড়াও, এই নোংরা বস্তিতে তোমার মন তন্‌ছট করে, তা কি বুঝি না আমি! ভিখিরী হ'লেও আমরা মানুষ দীনু। তুমি কি মনে কর, এটুকু বুঝ্‌বার বুদ্ধিও নেই আমার?"

দীনু উঠে বসে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অতসীর মুখপানে। ওর চোখদুটো যেন অতসীর সমস্ত জীবনটাকে নিমেষে ভেদ ক'রতে চায়।—"অতসী!"

অতসী নির্ব্বাক্ ব'সে থাকে; মাথাটা ধীরে ধীরে নুইয়ে প'ড়তে চায় মাটির বুকে। ও পারে না সইতে দীনুর সেই ধারাল দৃষ্টি।

—"চুপ ক'রে রইলে যে?"

—"কি ব'ল্‌ব?"

—"ব'ল্‌বার কি কিছুই নেই তোমার?"

"না।"—অতসী মুখ তুলে চায়।

দীনু উঠে দাঁড়াবার উপক্রম ক'রতেই ওর হাতখানা ধরে' অতসী অনুনয়ের সঙ্গে বলে—"রাগ ক'রো না দীনু। আমি ভিখিরীর মেয়ে; ভিখিরীর মেয়ে হ'য়ে তোমাকে ধ'রে রাখ্‌বার সাহস আমার সত্যি হয় নি। কোন দিনও ভাব্‌তে পারি নি যে—"

বলা হয় না। অতসীর চোখ ছাপিয়ে জল আসে।

উপেন হঠাৎ আড়ামোড়া দিয়ে ঠাকুরদের নাম নিয়ে উঠে বসে। দীনু মন্ত্রমুগ্ধের মত আবার ব'সে পড়ে অতসীর পাশে।

শিবু মহান্ত যেন একতিলও সইতে পারে না দীনুকে। ওকে দেখ্‌লেই তার মুখখানা কেমন বিষিয়ে ওঠে। চোখ-দুটো মিটমিট করে বিদ্বেষে।—দীনু বোঝে; কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না।

বস্তির লোকগুলো শিবুকে বাঘের মত ভয় করে। শিবু সারাদিন ব'সে থাকে ঘরে; রাস্তায় বড় একটা বেরোয় না। দুপুরে যখন বস্তিটা ফাঁকা হ'য়ে আসে, শুধু কয়েক-জন ঝি আর রাঁধা-বোষ্টুমি ছাড়া আর কেউ থাকে না, তখন যেন শিবুর মূর্ত্তি ফুটে ওঠে সতেজ রূপ নিয়ে। মাঝে মাঝে টহল দেয় বস্তির চারিপাশে, আর মাঝে মাঝে দু'জন সেবাদাসীকে নিয়ে ব্যস্ত হয় কি একটা গোপনীয় কাজে। ওর ঘরের পিছন দিকে যে ছোট্ট রান্নার জায়গাটুকু আছে, সেইখানে ওরা কি যেন করে! দীনু আগেও লক্ষ্য ক'রেছে, কিন্তু তার বেশী অন্য কিছু তলিয়ে দেখবার অবকাশ ওর হয় নি, হয় ত বা দরকারও ছিল না।

সেদিন সকাল থেকে দীনু চুপটি ক'রে বিছানাতেই পড়ে ছিল। জীবনে এবার ওর সত্যি জমে উঠেছে গ্লানি; বেঁচে থাকার অবসাদ ঘনিয়ে উঠেছে মজ্জায় মজ্জায়। পথও আর লাগে না ভাল; ভাল কেন, কেমন একটা বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হ'য়েছে ওই বৈচিত্র্যময় পথ, আর প্রবহমান জনস্রোত। তার চেয়ে এই বস্তির অপরিসর ঘরে ওর ছেঁড়া মাদুরখানার বুকেও যেন আছে একটু মমতা; ওকে উৎক্ষিপ্ত করে না, হাঁটু দুটো অসাড় হ'য়ে আসে না ব্যথায়।—সকাল থেকে দুপুর অবধি তেমনি নিশ্চল পড়ে থাকে।

বস্তিটা নিঝুম হ'য়ে আসে। ওপাশের ঘরে যে ঝিগুলো থাকে, তারা বোধ হয় নিস্তব্ধ দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ে, না-হয় বেরিয়ে যায় কাজে। রাতে ওদের চোখে ঘুম থাকে না। সারা রাত করে কোলাহল। মিস্ত্রি, ফেরিওয়ালা, ড্রাইভার—নানা শ্রেণীর লোকের ভিড় জমে ওদের ঘরে। দিশি মদের গন্ধ আর কুৎসিত রসিকতার কলরবে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে আশপাশের লোক। শিবু মহান্ত সরবরাহ করে মদ। দীনু কত দিন চোলাই-এর গন্ধ পেয়েছে এইখানে শুয়ে শুয়ে।

হঠাৎ শিবুর চীৎকার শুনে দীনু উঠে বসে। লোকটা অকথ্য ভাষায় কার উদ্দেশে গালাগালি করে। অথচ কেউ প্রতিবাদ করে না তার সেই কদর্য্য উদ্‌গীরণের। নিশুতি দুপুরে শিবুর ওই বেয়াড়া গালাগালির কোন অর্থ দীনু ভেবে উঠ্‌তে পারে না। একবার মনে হ'ল, হয়ত ওকে লক্ষ্য করেই শিবু বিদ্বেষের ঝাল মিটাচ্ছে। কিন্তু কেন?—দীনু আস্তে আস্তে দরজার পাশে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখে।

আশ্চর্য্য! শিবুর সেই যমদূতের মত চেহারাটা নিমেষে কেমন আতঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টিতে যে প্রখরতা নেই। বক্‌বক্ ক'রে আপন মনে অজস্র গালাগালি দিয়ে চ'লেছে, আর ন্যাতা দিয়ে মুছে বেড়াচ্ছে চালাঘরের পানের পিক্। বস্তিরই কেউ, কিম্বা কারো দুপুরের খদ্দের বোধ হয় পান খেয়ে পিক ফেলেছে শিবুর ঘরের সামনে। —কিন্তু তাই নিয়ে শিবু অমন করে কেন? ফেল্‌লেই বা ওখানে পানের পিক্; উঠানের একপাশে চালাঘরের ওই নর্দ্দমায় কি দরকার আছে শিবুর?

দীনু অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে। শিবু যেন ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছে। সন্দিগ্ধ চকিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চায়, আর বার বার ন্যাতাটা জলে ভিজিয়ে এনে মুছে দেয় সেই পানের দাগগুলো।—ওর গালাগালি শুনে পুঁটি আর বিন্দুবাসিনী—দুজনেই বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে; কিন্তু কোন কথা ব'ল্‌তে পারে না ভয়ে।

বিস্ময়টুকু কাটিয়ে উঠ্‌তে দীনুর দেরী হ'ল না। ও সহজেই অনুমান ক'রে নেয় যে, লোকটা ক্রিমিনাল—খুনে। রক্তের দাগ বা ওই রকম কিছু দেখ্‌লেই ওর মাথাটা যায় বিগ্‌ড়ে। ও সইতে পারে না। ওর ওই প্রচণ্ড পৌরুষ নিমেষে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে। পানের পিক্ দেখেও ওর বলিষ্ঠ দেহটা ভয়ে পঙ্গু হ'য়ে আসে।

সেই সন্ধ্যাতেই শিবুর ঘরভাড়া মিটিয়ে ওরা আবার

উঠে গেল অন্য বস্তির সন্ধানে। দীনু এক রকম জোর ক'রেই নিয়ে গেল অতসীকে। ওর কাণ্ড দেখে কোন কথা জিজ্ঞেস ক'রবারও অবসর পেল না সে। তা ছাড়া, দীনু যে ওর ওপর এমনি ক'রে জোর ক'রবে কোন দিন, একথা ছিল অতসীর স্বপ্নের অগোচর। ওর সারা মন ভ'রে উঠ্‌ল অকারণ আনন্দের প্রাচুর্য্যে।

* * * *

ব্রততীর জীবনে যে পরিবর্ত্তন দ্রুত শ্রাবনের মত এসে প'ড়েছে, স্যার সি-কে প্রাণপণ চেষ্টাতেও পারেন নি তার গতি রোধ করতে। ওঁর গণ্ডী ছাড়িয়ে তাতু যেন দেখ্‌তে দেখ্‌তে সরে দাঁড়িয়েছে অনেক দূরে।—ও মানে না আভিজাত্যের শাসন, ও চায় না ঐশ্বর্য্যের উর্ব্বর মাটিতে স্বচ্ছন্দে জীবনের শিকড়গুলো ছড়িয়ে দিতে।—প্রথম প্রথম স্যার সি-কে'র মনে হ'য়েছিল, হয় ত ওই মণি অধিকারীই নিয়েছে তাতুর জীবনে এই বিপ্লব এনে। কিন্তু সে ভুল তাঁর তাতুই দিল ভেঙে।

স্যান্‌চিট্ ক্লাবের চাঁদার খাতায় স্যার সি-কে যেদিন দশ হাজার টাকার চেক্ জমা দিয়ে, তাতুর হাতে এনে দিলেন মেম্বারশিপের কার্ডখানা, বাপের মুখপানে চেয়ে তাতুর চোখদুটো যেন ধ্বক্ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল।—"বাবা!"

ব্রততীর কণ্ঠস্বরে স্যার সি-কে ভয় পেয়ে গেলেন! অপরাধীর মত কার্ডখানা ওর সাম্‌নে থেকে তুলে নিয়ে ব'ল্‌লেন —"ওরা যে বল্‌ছিল মা, তু-ই ওদের প্রধান নেত্রী।"

—"আমি?" ব্রততীর শরীরটা উত্তেজনায় ঝাঁকিয়ে উঠে।

"হাঁ। তোর কল্পনাকেই ওঁরা নাকি আজ রূপ দিয়েছেন বাস্তবে। ওই স্যান্‌চিট্ ক্লাব, সাঁ-সুচি থ্রেজ; তারই সঙ্গে লাইব্রেরী, মিউজিয়ম আর নাচের এম্‌ফি-থিয়েটার!"—স্যার সি-কে হঠাৎ যেন ব্রততীর সাম্‌নেও কেমন বিব্রত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

—"ওঁরা! ওঁরা মানে ত তোমার ওই বন্ধুপুত্র আর তোমার বান্ধবীর দল? কিন্তু বাবা, যে দেশে পেটের দায়ে লোক কুড়িয়ে খায় ডাষ্ট্‌বিন থেকে—শিশুকে অন্ধ করে ভিক্ষে লোহার কাঁটা ফুটিয়ে, সেখানে—না, থাক। ওদের কথা ব'লো না তুমি।—আমি চাই ওই বন্ধুদের হাত থেকে মুক্তি।"—ব্রততী কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মত চেয়ে থেকে স্যার সি-কে ওর মাথায় হাত দিয়ে ডাকেন—"তাতু!"

ব্রততী মুখ না তুলেই উত্তর দেয়—"কি বাবা?"

—"আমি ত ওদের জন্যে চাঁদা দিই নি। দিয়েছিলুম তোরই কথা ভেবে। কিন্তু তুই ত আমায় কোন দিনের জন্যেও বলিস্ নি তাতু! বলিস্ নি, তোর মনের কথা!"

চোখ মুছে ব্রততী বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে বলে—"তোমার মনে কষ্ট দিতে চাই নি বাবা।"

—"পাগ্‌লি! তোর মুখের হাসি মিলিয়ে গেলে যে কষ্ট পাই, তার চেয়ে বেশী কষ্ট কি তুই দিতে পারিস্?" —স্যার সি-কে'র চোখে জল আসে।

ব্রততী একটু ইতস্তত ক'রে বলে—"আমার চোখের সাম্‌নে থেকে পুরনো পৃথিবীটা যেন মুছে গেছে বাবা। দীনু—না; আমি ভুল্‌তে পারি না। ভুল্‌তে পারি না মানুষের দুঃখ।"

—"দীনু?"

—"মিষ্টার সেন। নিঃস্ব হ'য়েছে, তবুও মনে এতটুকু দৈন্য নেই। অদ্ভুত!"—

ব্রততী আবার স্থির হ'য়ে ব'স্‌ল।

স্যার সি-কে পাশের চেয়ারখানা আরও কাছে টেনে নিয়ে ব'স্‌লেন ব্রততীর পিঠের ওপর সস্নেহে হাতখানা রেখে।

ব্রততী আপন মনে বলে—"এত বড় দেশে ওদের মাথা গুঁজ্‌বার একটু ঠাঁই নেই।"

—"তাতু!"—পর্য্যাপ্ত মমতার সুরে স্যার সি-কে ডাকেন।

—"য়্যাঁ।"—ব্রততী করুণ দৃষ্টিতে চায়।

—"তোর মায়ের কথা একটুও মনে পড়ে না আর?"— দীর্ঘশ্বাসে বুকখানা কেঁপে ওঠে।

—"একটু একটু পড়ে। ছবিখানা দেখে এখন বেশ ভেবে নিতে পারি।"

স্যার সি-কে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ব্রততীর মুখপানে। বাপের চোখে এমন নিষ্পলক শাণিত দৃষ্টি ব্রততী আর কোন দিনও দেখে নি। মনে হয়, চোখের ভিতর দিয়ে সমস্ত অন্তরটা যেন বেরিয়ে আস্‌তে চায়।

—"আশ্চর্য্য! সেই আগুন এখনও নেবে নি। তার না-বলা কথা, গোপন অনুভূতির চাপা কান্না বিক্ষোভের

মত জ্বলে উঠেছে তাতুর বুকে।—অম্‌নি আজে-বাজে নানা ভাবনায় বিনিদ্র হ'য়ে উঠ্‌ত শীতের রাত—"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে স্যার সি-কে আকস্মিক চঞ্চলতায় অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। উনি দেবেন না, কোন মতেই দেবেন না ওদের প্রশ্রয়।—স্যান্‌চিট্‌ সোসাইটির কার্ডখানা টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে তিনি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—"এ তোমার বাড়াবাড়ি তাতু! কার মাথা গুঁজ্‌বার ঠাঁই নেই, তাই নিয়ে নিজের মাথা খারাপ করার কোন মানে হয় না। ওরা এসেছে ওদের ভাগ্য নিয়ে; তুমি পার না শত চেষ্টাতেও তার একতিল লাঘব ক'রতে।"

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে তিনি ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ব্রততী হাসে। সেই কান্নার ভিতরেও ও চেপে রাখ্‌তে পারে না ওর হাসি:—"ভাগ্য! শক্তিমানের হাতে-গড়া ওদের সেই ভাগ্য মাটির বুকে কেঁদে মরে। ওরা মানুষ, সেকথা মানুষেরাই দিয়েছে ওদের জন্মের মত ভুলিয়ে।"

হঠাৎ ব্রততী চম্‌কে উঠ্‌ল—লীলা হালদার, শিপ্রা আর মুরলা নন্দীকে দেখে। ওরা হয় ত আগেই এসে দাঁড়িয়েছিল ওর মুখের দিকে চেয়ে।—পিছনে ব্যানার্‌জি!

* * *

দীনু চেয়েছিল মুক্তি। কিন্তু অনিবার্য্য বিপর্য্যয়ের মাঝখানে পড়ে ওর জীবনের আগাগোড়া গেল আবার উল্টে। ওর কল্পনা, ওর বিশৃঙ্খল জীবনের অবাধ গতি সহসা কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল অতসীর দুর্ভাগ্যকে ঘিরে। একটা ভিখিরী মেয়ে, যার প্রতিদিনের অন্নমুষ্টি আসে চোখের জলে ধুয়ে, তার মুখপানে চেয়েও দীনুর সর্ব্বাঙ্গ আজ আড়ষ্ট হ'য়ে আসে আর্ত্ততায়।

ওদের পল্লীতে লেগেছে মড়ক। আশ-পাশে, বস্তির ঘরে ঘরে মানুষগুলো ম'রছে, কেউ বাইরে, কেউ উঠানে, কেউ বা তলগড়ের চৌকাঠে মাথা রেখে। দীনু বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তাদের পানে; কখন বা এগিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে অতসীর পীড়াপীড়িতে।—ওরা মরে; যেন বেঁচে থাকাটাই ছিল ওদের অনধিকার। জন্মের সাথে সাথে বাঁচ্‌বার অধিকার নিয়ে আসে নি এই হতভাগ্যের দল; এনেছিল অপ্রতিবাদে মরবার জন্মগত অধিকার, আগুনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া ঝাঁক ঝাঁক পঙ্গপালের মত। তবুও কাঁদে, হাহাকার ক'রে কাঁদে কেউ। বদ্ধ কান্নার গুমট-বাঁধা শ্বাসগুলো ঘুরে মরে বস্তির ঘরে ঘরে। ওদের নিশ্বাসের বিষাক্ত বাষ্প বাতাসে মিশিয়ে যায় না। ওরা যেমন অযাচিত অতিথির মত এসে আশ্রয় নিয়েছিল মানুষের পান্থশালায়, তেমনি অবারিত যাত্রীর মত একে একে চলে যায় জীবনের বোঝা মাটির বুকে নামিয়ে রেখে।—জীবন্ত পৃথিবীর উৎসবের অন্তরালে অজ্ঞাতে মুছে যায় মানুষের অবজ্ঞার গ্লানি।

দুদিন দুরাত পথে পথে ঘুরে দীনু যখন ক্লান্তপদে এসে দাঁড়াল অতসীর ঘরের সাম্‌নে, অতসী মেঝেয় পড়ে লুটোপুটি করে কান্নায়; ঘরের এককোণে কচি ছেলেটার প্রাণান্ত চীৎকারে গলা শুকিয়ে উঠেছে।

দীনু একতিলও বিচলিত হ'ল না। ওর অনশন-শুষ্ক ঠোঁট দুখানা একবার মাত্র বিকৃত হ'ল কান্নার আবেগে।—উপেনের মৃতদেহটা ডোমেরা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে। উপেন! অতসীর বাবা এতদিন পরে পেয়েছে মুক্তি। ওর জীবন-জোড়া অন্ধকারের হ'য়েছে অবসান, প্রভাত হ'য়েছে সীমাহীন অমানিশা। অসহায় পঙ্গু জীবনটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে রাত্রিদিন পৃথিবীর পথে কেঁদে বেড়ানোর লাঞ্ছনা থেকে উপেন আজ পেয়েছে নিষ্কৃতি।

—"অতসী!"

অতসীর কান্নার বেগ উথ্‌লে ওঠে। ঘরের মেঝেয় মাথা ঠুকে আরও ছট্‌ফট্‌ করে হাহাকারে। লোকগুলোর পা জড়িয়ে ধরে দুহাত দিয়ে; ও কেড়ে নিতে চায়, ছিনিয়ে নিতে চায় ওর বাপের মৃতদেহটা।

—দিনের পর দিন না খেয়ে ম'রেছে খোকা; তার পর ওর মা। এবার উপেন নিল ছুটি!

ওরা চ'লে গেল। দীনু ধীরে ধীরে গিয়ে ব'সল অতসীর পাশে। মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পাণ্ডুর মুখখানার দিকে; অতসীর তখন দাঁতি লেগেছে।

° ° ° °

যেমন করে যাচ্ছিল দিন, আবার তেমনি ক'রেই চলে পর পর আলো-ছায়ার জাল বুনে। কাল যে দিনটাকে মনে হ'চ্ছিল মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর, আজ সেটা সহজ হ'য়ে আসে আগামী কালকে শঙ্কাজড়িত ক'রে।—ওদের জীবনের গতিতেও অমনি করে পর পর নেমে আসে এক একটা সন্ধ্যা; কোলের অন্ধকার কাট্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই ঘনিয়ে ওঠে সাম্‌নের পথে সাজানো আঁধার।—এখন আর ওরা কাঁদে না; ওদের অশ্রু স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে যায় অবসন্ন পিঙ্গলার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।

উপেন পেয়েছে মুক্তি, কিন্তু অতসী পায় নি ছাড়া। ওর পিছু টানের বোঝা ছিঁড়ে পড়বার আগেই, খোকা দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রেছে অতসীর শাখা-প্রশাখা—কচি আলোকলতার মত নিবিড় আবেষ্টনে।

কেন এলো খোকা! ওর দুর্ভাগ্যের মাঝখানে এমনি অযাচিত আসা, ও ত চায় নি কোন দিন। ও চায় নি মা হ'তে, তবুও খোকা এলো ওর গোপন মনের আশা-আকাঙ্খাকে উদ্বেলিত ক'রে।

অতসী একদৃষ্টে চেয়ে থাকে খোকার মুখপানে। কখন ওর সারা গা রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে আনন্দের শিহরণে, কখন-বা চোখ ছাপিয়ে আসে জল—ওর সেই ছোট ভাই-এর কথা, মায়ের কথা ভেবে। হঠাৎ মনটা শিউরে ওঠে আতঙ্কে। ম'রেছে, ওরা ম'রেছে, দিনের পর দিন একটু একটু ক'রে ক্ষয় হ'য়ে!—খোকা যদি মরে! তেমনি না খেয়ে যদি তিল তিল ক'রে শুকিয়ে যায়!—ও পারবে না, পারবে না সইতে। নির্নিমেষ দৃষ্টি ধীরে ধীরে নিশ্চল হয় খোকার মুখের ওপর। অমনি ক'রে চেয়ে থাকতে থাকতেই ওর বুকের আঁচল ভিজে যায় দুধে। পর্য্যাপ্ত অমৃত-প্রবাহে দুটি স্তন ব'য়ে টপ্‌টপ্‌ ক'রে ঝ'রে পড়ে দুধ!

দীনু পাশে ব'সে ভাবে। ভাবে ওর অতীত জীবনের কথা, ভাবে অতসীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত্তের কথা। বুকের ভিতরটা আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে হাহাকারে।—ভুল, ভুল; জীবনের প্রতিপদক্ষেপে জমে উঠেছে শুধু ভুলের বোঝা। অতীত মুছে গেছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে; বর্ত্তমান ঘোলাটে হ'য়ে উঠেছে অন্ধকারে, কুয়াসাচ্ছন্ন নির্ম্মম অন্ধকারে ওর চোখ দুটো কেমন ধাঁধিয়ে যায়। এই অতসী কাঁটা তারের বেড়ার মত ঘিরে ধ'রেছে ওর দুর্দ্দান্ত গতিকে। তাই ফলেছে আচম্বিতে ওই ভুলের ফসল: ওর ক্ষণিক দুর্ব্বলতার সিঞ্চনে গ'ড়ে ওঠা আগামী সহস্র ভিক্ষুক বংশের আর-এক আদি পুরুষ। ওই খোকাকে আশ্রয় ক'রেই আবার পৃথিবীতে আস্‌বে অগণিত ভিখিরী; ওরই শাখায় শাখায় ফল্‌বে অসংখ্য অসহায় অন্ধ শিশু!—উঃ।

অতসীর দৃষ্টিটা হঠাৎ ছল্‌কে পড়ে দীনুর মুখের ওপর।—"কি ভাব্‌ছ তুমি অমন ক'রে?"

—"আমি? ভাব্‌ছি—ভিক্ষে আর ক'রব না অতসী।"

—"বেশ ত! আমিই ক'রব ভিক্ষে। তোমাকে ত আর বলি নি কোন দিন।"

দীনু একটুক্ষণ ভেবে আপনমনেই বলে—"তুমি বল নি সত্যি, কিন্তু পুরুষ হ'য়ে আমি পারি না এমনি নিশ্চিন্তে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে।"

কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে দীনু কেমন আন্‌মনা হ'য়ে যায়। বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে বলে—"মোট খাট্‌ব;—না হয়, না-হয় রাস্তার লোকের হাত থেকে জোর ক'রে নেব কেড়ে।" তারপর হঠাৎ অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে ব'লে ওঠে—'অতসী, চল্‌ পালিয়ে যাই! পালিয়ে যাই এই মানুষের কোলাহল, এই শহর—লোকালয় ছেড়ে দূর পাড়াগাঁয়ের মাঠে, না-হয় অন্ধকার একটা বনে, যেখানে কেউ কোন দিন নেবে না আমাদের মুখের ভাত কেড়ে। তুমি বাঁধ্‌বে ঘর; আমি মাটি কাট্‌ব।"

অতসী সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে। ওর বুঝ্‌তে সময় লাগে না মোটেই যে, হঠাৎ মাঝে মাঝে দীনুর মাথাটা যেমন বিগ্‌ড়ে যায়, তেমনি বিগ্‌ড়ে গেছে আবার। আবার হয় ত পালিয়ে যাবে কোন দিকে, না-হয় উঠ্‌বে ঝড়।

সরে' এসে ওর গায়ে গা দিয়ে ব'সে অতসী হাত বুলিয়ে দেয় দুটি পায়ে।

অদম্য বেগে দীনুর বুক ছাপিয়ে উঠ্‌তে চায় কান্না। দু'চোখে টলটল করে জল।—"আমার চোখেও জল আস্‌ছে অতসী, পাথরের দেয়ালেও এবার বুঝি ধরল ফাটল! মরীচিকা নয়, জল—জল! মরুভূমিতেও দেখা দিয়েছে জল!"—উৎকট হাসির ঝাপ্‌টায় জলটা কর্ণিকার কোলেই শুকিয়ে যায়।

* * * *

ভিক্ষে নয়, কাজের চেষ্টায় দীনু আবার উঠে-পড়ে লেগেছে। যেমন ক'রে হোক্, একটা কিছু জোগাড় ক'রতেই হবে তার। নইলে—নইলে খোকা আর অতসীকে ক'রতে হবে ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত।—দীনু ঘুরে বেড়ায়, আবার ঘোরে লোকের দরজায় দরজায়। রাস্তার মোড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে একটা মোট পাবার আশায়। কিন্তু জোটে না। অদৃষ্টের কি নির্ম্মম বিধান ওর ওপর! এত লোক মোট-খেটে করে পেটের সংস্থান, কিন্তু ওর জোটে না দিনান্তে একটি মজুরি।

পথ চল্‌তে চল্‌তে নিজেই কখন ভুলে যায় ওর উদ্দেশ্যের কথা। আন্‌মনে অতিবাহন ক'রে চলে মহানগরীর পথ। মাঝে মাঝে ফিরে চায় পিছনের কোলাহল শুনে, কিন্তু পা-দুটো থামে না।

দীনু যখন চৌরাস্তার মোড়টা ছাড়িয়ে প্রায় এসে প'ড়েছে বীমা কোম্পানীর পাথর কুঠির সাম্‌নে, হঠাৎ ওর নজর প'ড়ল বাদামি রঙের বড় মোটরখানার ওপর। গাড়ী-খানা বেগে চল্‌তে চল্‌তে আচম্‌কা ব্রেক দিয়েছে ওপারের ফুটপাথের পাশে!—ভিতরে ব'সে মণি অধিকারী, আর ব্রততীর পাশে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বোধ হয় ওর বাবা—স্যার সি-কে রায়।

ওরা নাম্‌বার উপক্রম করে! দীনু মুহূর্ত্তে কেমন হক্‌চকিয়ে গেল। তারপর পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল বীমা অফিসের পিছন দিয়ে ফিরিঙ্গী-পাড়ার ছোট গলিটার ভিতর।—পিছনে পায়ের শব্দ শুনে হৃৎস্পন্দন যেন অস্বাভাবিক গতিতে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছিল ওর। মনে হ'ল, মণি এসে পড়েছে পিছু পিছু। নিরুপায় হ'য়ে দীনু বাঁকা গলিটার বাঁকে ব'সে প'ড়ল।

সত্যি এসেছে ওরা!—মণি অধিকারী, তার পিছনে ব্রততী। বীমা অফিসের এদিকে, পেভ্‌মেণ্টের ওপর দাঁড়িয়ে ওরা আশে-পাশে চেয়ে দেখে। ব্রততী উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে চায়, হয়ত ওকেই খোঁজে চঞ্চল দুটি চোখে সেই অফুরন্ত করুণা নিয়ে! কিন্তু কেন? কেন খুঁজ্‌বে সে দীনুর মত একটা অপগত মানুষকে?—ভাব্‌তে গিয়ে দীনুর শরীরের রক্ত হিম হ'য়ে আসে। ওর জীবনে যা ছিল একদিন রোমাঞ্চকর কল্পনা, আজ তার আভাস মাত্রও হ'য়েছে জীবন্ত বিভীষিকা।

ব্রততীর পরণে নিতান্ত সাধারণ একখানা শাড়ি। হাতে ভ্যানিটি কেসটা নেই আর। সর্ব্বাঙ্গের সেই চলমান দ্রুত ভঙ্গী যেন আপনা-আপনি কেমন শ্লথ হ'য়ে এসেছে।

বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হ'য়ে আসে।—যদি এসে পড়ে! আর একটু এগিয়ে যদি এসে দাঁড়ায় গলিটার মোড়ে!

কিন্তু আসে না। যেমন আগে-পিছে দু'জনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি আবার যায় ফিরে।—ব্রততী কি বলে; হয়ত ওর কথাই, কিম্বা অন্য কারো।

দীনু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এমনি ক'রে আরও চার-পাঁচ দিন ও ক'রেছে আত্মরক্ষা ব্রততীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে।

ফিরিঙ্গী পাড়ার ভিতর দিয়ে ডানে-বাঁয়ে বেঁকে দীনু উঠ্‌ল একেবারে মিউনিসিপাল মার্কেটের সাম্‌নে এসে। তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। রাস্তার দু'পাশে কলগুঞ্জন তুলে আলোকময় পথরেখাকে মুখর ক'রে চলেছে অসংখ্য পুরুষ আর নারী।

মোড়টা ফিরে দীনু ময়দানের পথ ধরল। বিস্তৃত পথ, তবুও অবাধে চলা যায় না। দুপাশের ফুটপাথেই জীবন্ত মানুষের ভিড়! ওদের বেঁচে থাকার মাদকতায় দেহ আর মন উথ্‌লে ওঠে পথের পরিসর ছাপিয়ে। ওরা যেন বাঁচ্‌তেই এসেছে পৃথিবীতে। পরিপূর্ণ মন ফেনিল হ'য়ে উঠেছে দিনান্তের প্রমোদবিলাসে। ওদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছুটে চলে স্যাম্পেনের উদ্দাম সজীবতা।

বাঙালী মেয়েদের ভিড় জমেছে;—তরুণ তরুণী, কচিৎ দু-একজন বৃদ্ধ ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে সাম্‌নের গেরুয়া রঙের নতুন বাড়ীটার ফটকে। দীনু থম্‌কে দাঁড়ায়।—"সাঁ-সুচি!"—"স্যান্‌চিট্ ক্লাব!"—"প্রগতি ভবন!" ওর মাথার মধ্যে পিল পিল ক'রে ওঠে মগ্ন চেতনার কীটগুলো। মনে হয়, স্বপ্ন; কোন্ সুদূর অতীতের বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নে আঁকা হ'য়েছিল ওর মনে এই "সাঁ-সুচি"; আর তারই সঙ্গে

ক্লাব, লাইব্রেরী, এম্‌ফি-থিয়েটার। ওদের সবুজ সঙ্ঘের রেজল্যুশান্!—চোখের কোণ থেকে মগজের ভিতর পর্য্যন্ত ঝিম্‌ঝিম্ করে। সাম্‌নের ছবিগুলো অস্পষ্ট হ'য়ে আসে। ইলেকট্রিক নিউজের আলো ছড়িয়ে পড়ে ময়দানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি; রূপালি জোয়ারের মত ঢেউ খেলে যায় সবুজ ঘাসের বুকে।

সাঁ-সুচির উদ্বোধন উৎসব শেষ ক'রে ওরা বাড়ী ফিরে যায়। ওদের কল্প-প্রসাদ ধীরে ধীরে নীরব হ'য়ে আসে ঘুমের দোঁয়ায়।—সাহেবদের হোটেলে তখনও জীবনের উৎসব ধ্বনিত হ'চ্ছে। পিয়ানোর মৃদু শব্দে ঘুমের গান—

* * * *

—"ওদের জন্মের জন্যে কি ওরা দায়ী শিপারিন?"

—"জন্মের জন্যে হয় ত দায়ী নয়, কিন্তু পরিণতির জন্যে ওদের দায়িত্ব যে নিতান্ত কম, তা স্বীকার ক'রতে আমি মোটেই রাজী নই তাতু!"—শিপ্রা ইংরেজী কাগজখানার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে চোখ বুলিয়ে যায়। তারপর একটু থেমে বলে—"স্ট্রীট্ নুইস্যান্স বন্ধ ক'রতে হ'লে কর্পোরেশনের হেল্‌প নিতে হয় তাতু, প্রোপাগ্যাণ্ডায় হয় না।"

ব্রততী একটু চাপা তীব্রতার সঙ্গে বলে—"তা জানি। কিন্তু পরিণতির কথা ব'ল্‌তে হ'লে এই কথাই বল্‌তে হয় যে, ওদের ওই পরিণতির জন্যে ওরা যতখানি দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী আমাদের দেশ—আমাদের এই সমাজ, রাষ্ট্র আর নীতি। আমাদেরই কথাইখানায় প্রতিদিন বলি দিয়ে চলেছি আমরা ওই অসংখ্য অসহায় মানুষ-গুলোকে। তুমি কি অস্বীকার ক'রতে চাও সে কথা? এর ফল আস্‌বেই একদিন না একদিন!"

—"নিশ্চয়ই। আস্‌তেই হবে।—যাদের করেছ অপমান অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

অন্য সময় হ'লে লীলা ও মুরলা হয়ত খিলখিল ক'রে হেসে উঠ্‌ত শিপ্রার কথা শুনে। কিন্তু এখন আর ওরা ঠিক সাহস পায় না ব্রততীকে পুরোপুরি অসন্তুষ্ট ক'রতে। ও প্যাট্রোনাইজ্ না ক'রলেও ওকে উপলক্ষ্য ক'রেই যে স্যার সি-কে দিয়েছিলেন ওদের ক্লাবে দশ হাজার টাকা চাঁদা—আরও হাজার দশেক স্বচ্ছন্দে যাবে আদায় করা, এটুকু শিপারিন না বুঝ্‌লেও ওরা দু'জনে বেশ বোঝে।

ডক্টর ক্যারী তখন ব্যানার্‌জির সঙ্গে কি একটা পরামর্শ নিয়ে ব্যস্ত। শিপ্রার উক্তির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ব্রততী বলে—"মণিবাবু, সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, আমরা চাই আমাদের দাবীকে ষোল আনা স্বীকার ক'রে অন্যের বেঁচে থাক্‌বার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত অস্বীকার ক'রতে। ভেবে দেখা ত দূরের কথা, আমরা চেয়ে দেখ্‌তেও রাজী নই—হোয়াট্ ম্যান্ হ্যাজ্ মেড্ অফ্ ম্যান্—"

—"ম্যান্ হ্যাজ্ মেড্?"—শিপ্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়।

এবার ব্রততী কোন কথা ব'ল্‌বার আগেই মণি অধিকারী ব'লে ওঠে—"তা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে বলুন? মাটির বুকে জন্মেও যাদের মাটির ফসলে নেই তিলমাত্র অধিকার, তাদের বঞ্চিত ক'রেছি আমরাই। দেশের মাটি নয়।"

আলোচনাটা উঠেছিল ওদের প্রগতি-ভবনের প্রতিষ্ঠা নিয়ে, কিন্তু কথায় কথায় এসে দাঁড়িয়েছে ব্রততী আর ডক্টর ক্যারীর সদ্য-প্রতিষ্ঠিত 'ওয়েল ফেয়ার' সমিতির প্রসঙ্গে।

মিস্ হালদার আর মুরলার মোটেই ভাল লাগে না ও সব কথা। শিপ্রা ভালবাসে যে-কোন কথার সূত্র নিয়ে নিজের পেডান্ট্রি দেখাতে। তাই অন্তত তর্ক ক'রবার লোভেই ও চায় না প্রসঙ্গ উল্টে দিতে।

ওদের আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দেবার মতলবে লীলা হালদার বলে—"কেতকীর উপন্যাসটা হ'য়েছে আশ্চর্য্য রকম রিয়ালিষ্টিক। তোমাদের ওই প্রব্লেমটাই যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে ওর লেখায়।—"তৃষিত দেবতা।"

—"কেতকী?"—শিপ্রা সকৌতুকে জিজ্ঞেস করে।

—"বোধ হয় পেন্-নেম। কেউ কেউ বলে—ওটা নাকি সাগর ঘোষের লেখা।"

"কেউ কিছু বলুক আর না-বলুক, অন্তত আমাদের কবি সুকুমার চ্যাটার্জ্জী বলেন যে, ওটা তাঁর "মহানগরীর পথ"-এর অবিকল নকল। এমন কি, তিনি নাকি লাইন-গুলো পর্য্যন্ত লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রেখেছেন।"—মুরলার গাম্ভীর্য্যটা যেন বেশ জমাট বেঁধে আসে।

ডাক্তার অধিকারী বোধ হয় এতক্ষণ কথাটা মন দিয়ে শোনেন নি। মুরলার শেষ কথাটুকু কানে যেতেই ব'লে উঠ্‌লেন—"মোষ্ট ন্যাচারাল! গ্রেট মেন থিঙ্ক য়্যালাইক। হয় ত আগাগোড়াই মিলে গেছে দু'জনের চিন্তাধারা!"

মুরলা ঈষৎ সলজ্জ হাসির সঙ্গে উত্তর দেয়—"আগাগোড়া ঠিক নয়, তবে মিষ্টার চ্যাটার্জ্জীর একটা ইম্পরটেণ্ট সিন্-এর সঙ্গে ওঁর একটা ইন্‌সিডেণ্ট-এর অনেকখানি মিল আছে।"

—"আই সী। নো ফার্দার?—সে কথা আগে ব'ল্‌তে হয়। ও রকম সাদৃশ্য ত ঘাসের সঙ্গে অশথগাছেরও আছে। অন্তত একটা ইম্পরটেণ্ট য়্যাস্‌পেক্ট: পাতার রঙ। তাই ব'লে অশথ গাছকে শাঁওয়া ঘাসের নকল বলা চলে না।"—ডাক্তার অধিকারী স্বভাবসিদ্ধ প্রচণ্ড হাসিতে ঘরখানা মুখর ক'রে তুল্‌লেন।

ব্যানারজি এতক্ষণ ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারেন নি যে, হালদার আর মুরলার চেষ্টিত ইঙ্গিতটা ওঁকে লক্ষ্য ক'রেই নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে। ওঁরই কথার য়্যানালজি! কা'ল মুরলাকে সাম্‌নে রেখে মিস হালদারকে উনি ব'লেছিলেন—শিপ্রার চালচলনের হাওয়া লেগেছে ওদের দুজনের গায়ে। অবিকল নকল! ব্লাউসের রঙ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে মিলে যাচ্ছে শিপ্রার পছন্দর সঙ্গে।

মুরলার বক্র হাসিতে মুহূর্ত্তে ব্যানারজির মুখখানা লাল হ'য়ে উঠ্‌ল।

ব্রততী অনেকক্ষণ থেকেই ইতস্তত ক'রছিল ব্যানারজিকে কি ব'ল্‌বে ব'লে। কিন্তু সকলের সাম্‌নে সে প্রশ্ন উত্থাপন ক'রতে ওর কেমন বাধে। নানা কথার ভিড়েও মাঝে মাঝে ব্যানারজি আর মুরলার চোখে যে দীপশিখা ঝলক দিয়ে উঠ্‌ছিল, সেটা অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও তাতুর দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন ক'রতে পারে নি। কিন্তু আশ্চর্য্য! ওর মনে তাতে এতটুকুও ক্ষোভ হয় না; বরং স্বস্তিতে হাল্‌কা হ'য়ে আসে ওর ভারাক্রান্ত মনের পর্দ্দাগুলো।

ব্রততীকে নীরব দেখে, শিপ্রা হেসে বলে—"সাঁঝের খেয়ায় কি শেষে ঝড় উঠ্‌বে তাতু?"

—"ঝড় উঠ্‌বে না শিপার, বরং কেটে যাবে চৈতালি মেঘের নিরর্থক সমারোহ। আর, ঝড় উঠ্‌লেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না আমার, আমি করি না সে ভয়। বাঁচ্‌বার পথে ঝড়কে আমি যতটুকু ভয় করি, তার চেয়ে ঝড়ের পথে বাঁচ্‌তে এখন আমার বেশী ভাল লাগে।"—ব্রততী হাসে।

ব্যানারজি একটু বিস্মিত হ'য়ে চায় ওর মুখপানে। মুরলার হাসিতে কেমন একটা লঘু উল্লাসের রঙ!

"ওটা—"

—শীলা কটাক্ষ ক'রে কি ব'ল্‌তে চায়। কিন্তু তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব্রততী এক নিঃশ্বাসে বলে—"আমার ইডিওসিন্‌ক্রেসী দেখে আপনারা হয় ত আক্রমণ ক'রবার লোভ সম্বরণ ক'রতে পারেন না, কেমন মিস্ হালদার? কিন্তু আমি কি চাই জানেন? —আমি চাই পৃথিবীর এই নিষ্ক্রিয় অস্তিত্বের মাঝখানে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে দিতে। এতকাল যারা নিশ্চিন্তে বেঁচেছে, এবার তারা করুক প্রায়শ্চিত্ত।"

—"ব্রেভো! তুমি কি সিভিল ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'রবে তাতু? কিন্তু এ যে স্রেফ্ অটো-এগ্রেশন্! ডক্টর জাদু, —আই মীন্ বাৎস্যায়ন বলেন—"

শিপ্রার কথা শেষ না হ'তেই মিষ্টার ব্যানারজি ব'লে উঠ্‌লেন—"পার্ভারশন!"

ব্যানারজির শ্লেষটা যেন তাতুর গায়ে টিকের আগুনের মত ছিট্‌কে প'ড়ল। তবুও ব্রততী জোর ক'রে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে শান্ত অথচ প্রখর সুরে বলে—"মিঃ ব্যানারজি, মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে আপনাদের তরফ থেকে যে শিষ্টতা-বোধ আপনা হ'তেই থাকা উচিত, আমার মনে হয় সেটা সম্বন্ধে রিমাইণ্ড ক'রবার সুযোগ অন্তত মেয়েদের বতখানি না দেওয়া যায় ততই ভাল।"

শিপ্রা ও শীলা—দু'জনেই চম্‌কে ওঠে। ডাক্তার অধিকারী স্পষ্ট শুনেও ব্রততীর সঙ্গে তার কথাগুলো মিলিয়ে নিয়ে যেন ঠিক বিশ্বাস ক'রতে পারছিলেন না।—নির্ব্বাক্ চেয়ে রইলেন।

মুরলার মুখখানা কেমন অস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। প্রত্যন্তর আবহাওয়ার সূচনাটা অনুমান ক'রে ওঁরা সকলেই তখন উঠ্‌বার চেষ্টা ক'রছিলেন। মিষ্টার ব্যানারজির মুখে-চোখে কেমন একটা আড়ষ্টতা!

শিপ্রা কি ব'ল্‌তে যাচ্ছিল; কিন্তু তার কথাটা মাঝপথে আট্‌কে দিয়ে ব্রততী আবার ব'লে উঠ্‌ল—"এক্সকিউজ মি মিঃ ব্যানারজি। সেদিনের মত আমি বদ্‌লে ফেলেছি; সেই সঙ্গে কোর্স টাও।"—মুহূর্ত্তে ওর সর্ব্বাঙ্গে যেন আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ল কালবৈশাখীর ঝড়; বর্ষণোন্মুখ, কিন্তু আসন্ন ঝড়ের মত্ততায় চঞ্চল!

ওদের কোন কথা ব'ল্‌বার সুযোগ না দিয়ে ব্রততী

দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। শিপ্রা আর হালদার স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ব্যানারজির মুখপানে।

* * * *

অতসী শোনে নি ওর নিষেধ। ওই দুর্ব্বল শরীর নিয়েই ছেলেটাকে বুকে ক'রে বেরিয়েছিল ভিক্ষেয়।—দীনু যা পারে না, যা সয় না তার ধাতে, অতসী প্রাণ থাক্‌তে সে-কাজে হাত দিতে দেবে না ওকে। হ'লই বা কাঙাল, পুরুষ ত! পুরুষ হ'য়ে লোকের দরজায় হাত পাত্‌তে সত্যি হেঁট হয় ওর মাথা। পেটের দায়ে প্রতিদিন কত আর মাথা হেঁট ক'রে বেড়াবে ও!

দীনু যতবারই অতসীকে ব'লেছে—"ভিক্ষেয় বেরিও না, ওই শরীর আর কচি ছেলেটাকে নিয়ে।" অতসী শোনে নি; ও বাধা দিয়েছে। ওর নিষ্প্রভ বড় বড় চোখদুটো তুলে কাকুতির সঙ্গে বলে—"আমার কোন কষ্ট হয় না ওতে। যা পারি, দুমুঠো আন্‌বই কোনরকমে জোগাড় ক'রে। তুমি বরং সেই ফাঁকে খুঁজে দেখ একটা কাজ। —কত দিন ত হ'য়ে গেল! ঠাকুর কি এবারও চাইবে না মুখ তুলে?"

চোখে আগেকার সেই স্বচ্ছতা নেই, তবুও জলে ভ'রে উঠ্‌লে টলটল করে সজীবতায়। সজীবতাও হয় ত আর নেই একবিন্দু;—ওটা মরীচিকা, ওর অতীত নিশ্চিন্ততার সাময়িক সঞ্চয় যে-টুকু লুকিয়ে আছে রেটিনার আনাচে-কানাচে, তা-ই হঠাৎ ঝলক দিয়ে ওঠে কান্নার আবেগে।

সারাদিন পথে পথে টহল দিয়ে দীনু যখন বাড়ী ফিরল, তখন রাত্রি প্রায় আটটা। এর মধ্যেই বস্তি গুল্‌জার হ'য়ে উঠেছে। ওপাশের ঘরে যে লোকটা কাল সকালে এসে উঠেছিল ঘর-পালানো মেয়েটিকে সঙ্গে ক'রে, তাকে ঘিরে একপাল লোক দাঁড়িয়ে কি কাণাকাণি করে। মেয়েটাকে হয়ত এনেছিল ফুস্‌লিয়ে, দুপুরে আবার পালিয়েছে কার সঙ্গ পেয়ে।

অতসী আজ আর আলোটাও জ্বালে নি। ঘাড়ি-মুড়ি দিয়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে; ছেলেটা কোলের কাছে নির্জীব হ'য়ে প'ড়ে আছে। হয় ঘুমিয়েছে, না-হয় হাত-পা গুটিয়ে অন্ধকারে একলা জেগে জেগে ভাব্‌ছে ওর জন্মান্তরের কথা।

একবার মনে হ'ল, জাগাবে না। ঘুম'ক, এমনি ক'রে বোধ হয় কতকাল ঘুম নামে নি ওর চোখে। আবার মনে হয়, সারাদিনের উপোসে শরীরটা ভেঙে পড়েছে ক্লান্তিতে। চা'ল এনেছে দু'মুঠো সেধে, কিন্তু ফুটিয়ে নেবার ধৈর্য্য আর ছিল না ওর অবসন্ন দেহে।

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত ব'সে থেকে দীনু কেরোসিনের ডিবেটা জাল্‌ল।—অতসী ঘুমোয় নি! ঘোর হ'য়ে প'ড়ে আছে জ্বরে। গায়ে খই-ফুটান জ্বর! ছেলেটা কুকুর-মাছির মত লেগে আছে বুকে।

মাথার কাছে ব'সে দীনু কপালে হাত দিয়ে ডাকে—"অতসী!"

অতসী অতিকষ্টে চোখ মেলে চায়। চোখদুটো জবাফুলের মত লাল হ'য়ে উঠেছে। কথা ব'ল্‌তে ওর কষ্ট হয়: বুকে পিঠে অসহ্য ব্যথা।

আঁচলে বাঁধা চা'লগুলো দেখিয়ে বলে—"রাঁধ্‌তে আর পারি নি আজ। ভুজাওয়ালার দোকানে বদল দিয়ে মুড়ি আর ছোলা ভাজা এনে খাও।"—অতসী হাঁপায়। দম যেন ওর বন্ধ হ'য়ে আসে ওই কয়েকটি কথা ব'ল্‌তে।

"খাবো অতসী, খাবো। আজ না-হয় কাল নিশ্চয়ই খাবো আবার। খাবার জন্যেই ত এঁটো পাতা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি।"—দীনু কেরোসিনের ডিবেটা তুলে ধ'রে অতসীর মুখখানা ভাল ক'রে দেখে।

কষ ব'য়ে লালা গড়াচ্ছে। লালা!—না, শুধু লালা নয়; তারই সঙ্গে রক্ত!—তাজা রক্ত!

দীনুর মগজের মধ্যে রক্তকণিকাগুলো সিস্‌সিস্ ক'রে উঠল। ডিবেটা নামিয়ে রেখে দু'হাতে অতসীর চোয়াল দুটো ফিরিয়ে ধ'রে ডাক্‌ল—"অতসী!"

অতসী কাঁদে। হু হু ক'রে গড়িয়ে পড়ে উষ্ণ অশ্রু। চোখের জলে দীনুর হাত ভিজে ওঠে।—"রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আচম্‌কা গাড়ীখানা—"—ব'ল্‌তে পারে না। নিঃশ্বাস ঘন হ'য়ে আসে। শ্বাসকষ্টে চোখমুখ কেমন চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।

—"গাড়ী! ধাক্কা লেগেছে মোটরের?"—দীনুর কণ্ঠস্বর কাঁপে।

—"হাঁ। কি ভাগ্যে লাগে নি ছেলেটার গায়ে।"—অতসী পাশ ফিরবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

দীনুর বুকের ভিতর বিকৃত একটা হাসি গুম্‌রে ওঠে।—"ছেলেটাকে লাগ্‌লেও ক্ষতি ছিল না। একটা, একটা কেন, একশোটা ভিক্ষুকবংশের মূল উপ্‌ড়ে যেত।"

কিছুক্ষণ থেমে অতসী আবার বলে—"এই বেলা আন গে মুড়ি। দোকানটা হয় ত বন্ধ হ'য়ে যাবে।"

—"তা যাক্।"—দীনু গুম্ হ'য়ে ব'সে কি ভাবে। তারপর আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বলে—"রাত্রিদিন যে লোহার চাকা বুকের পাঁজরাগুলোকে চুরমার ক'রে দিচ্ছে, তার কাছে মোটরের চাকা কতটুকুই বা!"—দীনুর মুখে ফুটে ওঠে একটা বিকৃত হাসি।

—"কাল যদি না-পারি উঠ্‌তে! একমুঠো চা'ল রেখে দিও, সকালে ভিজিয়ে খাবে। কাল, না হয় পরশু—" আরও কি ব'ল্‌তে গিয়ে অতসী থেমে যায়। একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে আবার বলে—"ভিক্ষে ক'রতে দেবে না তোমাকে; কিছুতেই দেব না আমি। যে ক'টা দিন বাঁচ্‌ব—"

—"জানি। যে ক'টা দিন বাঁচ্‌বে, এমনি তিল তিল ক'রে নিজের জীবনটা দিয়ে বাঁচাবে আমাকে, আর বুকের রক্ত দিয়ে বাঁচাবে ওই ছেলেটাকে। কিন্তু কেন? কেন বাঁচাবে অতসী? চিরকাল ধ'রে মৃত্যুযন্ত্রণা সইবার জন্যে মানুষকে রেখ না বাঁচিয়ে। মেরে ফেলো; অজান্‌তে তাজা বিষ মুখের ভিতর গুঁজে দিয়ে মেরে ফেলো—"

দীনু অস্থির হ'য়ে উঠে পড়ে। হঠাৎ অপদেবতা-ভর-করা মানুষের মত চঞ্চলভাবে পায়চারি করে; ঘুরপাক খায় ওই একফালি ঘরের ভিতর।

অবসন্নতার গাঢ় প্রলেপ ছড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে রাত্রি। বস্তির ঘরে ঘরে লোকগুলো ঘুমিয়ে পড়ে; সারা পল্লী নিঝুম হ'য়ে আসে ঘুমে। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে আবার ঘুমিয়ে প'ড়েছে অতসীর কোলের ভিতর। এতক্ষণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রে অতসীও হয়ত ঘুমিয়েছে এবার, কিম্বা অচেতন হ'য়ে আছে জ্বরের ঘোরে।—ডিবেটা জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে আপনি নিবে গেছে কখন! তেল নেই।

* * * *

নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে চলে রাত্রি, নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়ে মহানগরীর কোলাহল, কিন্তু দীনুর চোখে একটীবারও লাগে না ঘুমের ছোঁয়া।—উপেন মরেছে, এবার মরবে অতসী—তার পর? তার পর ম'রবে ওই কচি ছেলেটা; পৃথিবীর বুকে পথভুলে-আসা ওই উলঙ্গ পথিক। জন্মের পর জন্ম ওরা অমনি ক'রেই পথ ভুলে এসেছে পৃথিবীতে, আবার নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছে গুরুভার ষ্টীম রোলারের নির্ম্মম নিষ্পেষণে। মানুষের হাতে-গড়া লৌহচক্রের চাপে দিনের পর দিন লুপ্ত হ'য়েছে মানুষের অস্তিত্ব। তবুও ক্ষান্ত হয় নি তাদের সেই অবারিত আসা।—ওরা আসে; দলের পর দল রক্তবীজের মত আসে জীবন্ত মানুষের পথে মৃত্যুর বিভীষিকা মাথায় নিয়ে।—ওদেরই সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে এসেছিল অতসী: আবার ওদের সঙ্গেই ফিরে যাবে। ওর জীর্ণ পাঁজরাগুলোয় ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে মরণের ডাক। চলন্ত মোটরের ঝাপ্‌টায় অচল যাত্রী ওরা ছিট্‌কে পড়ে আবর্জ্জনার মত।

রক্ত!—ওর লালার সঙ্গে একটু একটু ক'রে চুঁইয়ে পড়ে তাজা রক্ত!—ওই রক্তে অতসীর ছিল না কোন অধিকার। করুণার দান কুড়িয়ে কুড়িয়ে যে-রক্তের প্রতিটি বিন্দু সচল হ'য়েছে ওর ধমনীতে, তার ওপর নেই ওর এতটুকু দাবী। যাদের দরজায় কেঁদে কেঁদে হাত পেতে ও চেয়ে নিয়েছে ওর দেহের প্রতিটি রক্তকণিকা, তাদেরই পায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে ওর বেঁচে থাক্‌বার দাবী।—দীনুর মগজের ভিতরটা টন্ টন্ করে; ফুস্‌ফুসের মধ্যে সুরু হ'য়েছে আগ্নেয়গিরির দাহন।

ঘুমের ঘোরে যেন অতসী কি বলে! বলে—"এই একমুঠো চাল ভিজিয়ে খেয়ে সারাটা দিন পারবে না তুমি থাক্‌তে। একটা দিন! একটা দিন বৈ ত নয়! কাল আবার বেরুব নতুন কোন পাড়ায়।"

দীনু কান পেতে শুনবার চেষ্টা করে। আবার কি ব'ল্‌ছে অতসী! হয় ত প্রলাপ ব'ক্‌ছে "পুরুষ মানুষ; তুমি চেয়ো না কারো কাছে ভিক্ষে। লোকের দরজায় মাথা হেঁট ক'রে—ছি ছি। না না, দেব না আমি, কিছুতেই দেব না তোমায় ভিক্ষে ক'রতে। আজ না-হয় কাল ঠাকুর চাইবেই মুখ তুলে।"

"অতসী!"—দীনু এগিয়ে যায়; ঝুঁকে পড়ে অতসীর মাথার কাছে। না; জেগে নেই। ঘুমিয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ ধ'রে অতসীর নাকের কাছে হাত দিয়ে দীনু অনুভব করে ওর শ্বাসপ্রশ্বাস। মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায় না; তবুও মনে হয়, যেন নিঃশ্বাসের প্রতিটি স্পন্দনে কেঁপে কেঁপে ওঠে ওর সারা গা।

দীনু নিষ্পন্দ বসে' ভাবে। ওর চোখের সাম্‌নে কুণ্ডলী পাকিয়ে ভেসে ওঠে অসংখ্য জগৎ; স্তরে স্তরে সাজানো মৃতকল্প অসংখ্য মানুষের কঙ্কাল! দলে দলে অসহায় অন্ধ শিশু কেঁদে বেড়ায় ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে—ওদের বস্তির বাইরে, রাস্তার চলমান জনস্রোতের মাঝখানে, ফুটপাথে, বাগানে, ফিরিঙ্গীপাড়ার হোটেলের সাম্‌নে, সাঁসুচির ফটকটার দু'পাশে!

গলির মোড়ে, ডাষ্টবিনটা ঘিরে ভিড় জমিয়েছে কতকগুলো উলঙ্গ ভিখিরী! ছাই, মরা ইঁদুর, ব্যাণ্ডেজের নেকড়া ঠেলে ঠেলে খুঁজছে পচা ভাত!—দীনু সইতে পারে না। হঠাৎ ওর বুকের ভিতরটা আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে হাহাকারে। মনে হয়, মগজটা বুঝি চৌচীর হ'য়ে ফেটে পড়বে এবার।

অতসী কি বলে;—আবার কি বলে আপন মনে বিড়-বিড় ক'রে: "সারাটা দিন না খেয়ে আছ। এর পর দোকান বন্ধ হ'য়ে যাবে। ভুজাওয়ালার কাছে দু'মুঠো চা'ল বদল দিয়ে মুড়ি আর ছোলাভাজা এনে খাও।"

দীনু আর সইতে পারে না। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চঞ্চল পদে পায়চারি করে। আজ ওর কান্না পায়। ইচ্ছে করে, চীৎকার ক'রে কাঁদে। কিন্তু বুকের ভিতর দমটা আট্‌কে আসে। তালুটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে।

—ওদের সাঁসুচি ষ্টেজের উৎসব শেষ হ'য়ে গেছে। কবিগুরু উদ্বোধন ক'রে গেছেন। সুরেখা গেয়েছে উদ্বোধন সঙ্গীত। মল্লিকা, টুটুল, ডলি, রেবা, অমিয়, দীপা—ওরা সবাই দেখিয়েছে নাচ: কবিগুরুর নির্ম্মাল্য মাথায় নিয়ে ওরা ভগীরথের মত মাটির মরুভূমিতে আহ্বান ক'রে এনেছে উর্ব্বশীর নৃত্যধারা! ওরিয়েণ্টাল ডান্স! সেই সঙ্গে ঝর্ণা বাজিয়েছে সেতার, রাবেয়ার এস্‌রাজে দুলে দুলে উঠেছে সুরের মূর্চ্ছনা!

—এম্‌ফিথিয়েটারের খিলানে খিলানে সাজানো দেবদারুর ঝালর; ষ্টেজে ছড়িয়ে আছে ছিন্ন-গোলাপের অর্দ্ধ-দলিত পাঁপড়ি; লাইব্রেরীর টেবিলে, মেঝেয়, রাশি রাশি বই-এর মাথায়, অগ্রগামী মানুষের প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলোর চারিপাশে ছড়িয়ে আছে মুঠো মুঠো শ্বেত-টগর। অগুরু ধূপের গন্ধে ঘরের বাতাস তন্দ্রালু হ'য়ে উঠেছে।

ওদের ওই অমৃত ধারায় স্নান ক'রে বেঁচে উঠ্‌বে মুমূর্ষু পৃথিবী; মুক্ত হবে প্রেতায়িত মানুষের নগ্ন কঙ্কালগুলো! —দীনু হো হো শব্দে হেসে ওঠে। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে নিজের হাসি শুনে ও নিজেই চম্‌কে ওঠে ভয়ে।

হঠাৎ ওর শিরায় শিরায় চঞ্চল হয় রক্তপ্রবাহ। শ্বাস-নালীর ভিতরেও যেন উথ্‌লে উঠেছে রক্তধারা: টগ্‌বগ্ ক'রে ফোটে রুদ্ধমুখ কাৎলির জলের মত।—দীনু পাগলের মত ঘরে গিয়ে দেশলাইটা খোঁজে। কেরোসীনের ডিবেটায় আর একবিন্দুও তেল নেই। দেশলাই-এর কাঠি জেলে একবার ভাল ক'রে দেখে নেয় অতসীর মুখখানা।—ঘুমিয়েছে, এবার সত্যি ঘুমিয়েছে অতসী। গালের ওপর জমাট বেঁধে গেছে শুক্‌নো রক্তের কালো দাগ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীনু একবার চেয়ে থাকে অতসীর মুখপানে, আর-একবার চায় সেই ঘুমন্ত শিশুটার দিকে। ওর ইচ্ছে করে, অতসীর গলাটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধ'রে শ্বাসরোধ ক'রে দেয়, তারপর চেপে ধরে ছেলেটার মুখ। দীনু অস্থির হ'য়ে ওঠে। ও পারে না নিজেকে সম্বরণ ক'রতে;—মুছে দেবে, ওদের অস্তিত্ব চিরদিনের মত মুছে দেবে মাটির বুক হ'তে। বাঁচ্‌বার জন্যে এমনি তিল তিল ক'রে দেবে না ওদের ম'রতে। কব্জির পেশিগুলো শক্ত হ'য়ে ওঠে; আঙুলগুলো বাঘ নখের মত বক্র হয় বুভুক্ষায়।

অদম্য ইচ্ছার আবেগে হাত দুটো কেমন অবশ হ'য়ে আসে: সর্ব্বাঙ্গ শিরশির্ করে কাঁপুনিতে। বিছানার পাশ থেকে অতসীর ছেঁড়া কাপড়খানা নিয়ে দীনু গায়ে জড়ায়; তারপর দেশলাইটা ট্যাঁকে গুঁজে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

* * * *

সাঁসুচির পাশেই মস্ত বড় গ্যারেজ। গ্যারেজের উঠানে যমদূতের মত বড় বড় বাসগুলো ঝিম'চ্ছে। লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। সব ঘুমিয়েছে। করগেট-শেডের নীচে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে ঘুম'চ্ছে কয়েকজন লোক: হয়ত ড্রাইভার, কিম্বা ওদের কারখানার মিস্ত্রি।

চারিদিকে চেয়ে দীনু পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ে সেই

গ্যারেজের ভিতর। একবার ভয় হয়, হয়ত জেগে উঠ্‌বে কেউ ওর পায়ের শব্দে ; পরক্ষণেই আবার জেগে ওঠে অসীম সাহস।—একটা টিন, কোন রকমে একটা টিন পেট্রোল যদি হাতে পায় ও!

তেমনি ক'রে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দীনু সন্ত্রস্ত-পদে এসে দাঁড়াল করগেট-শেডটার সাম্‌নে।—ওরা ঘুম'চ্ছে, তেমনি অচেতন হ'য়ে আছে ঘুমে। মাথার কাছে সাজানো টিনের পর টিন পেট্রোল! দীনুর বুকের ভিতর লুটোপুটি করে উল্লাস! শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ ক'রে চেয়ে থাকে ওদের পানে। তারপর ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায়।

গায়ের ছেঁড়া কাপড়খানায় ঢেকে পেট্রোলের টিনটা বুকে ক'রে দীনু যখন রাস্তায় এসে দাঁড়াল, তখন গীর্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বাজল তিনটে। সবুর সইছিল না আর। ওর হৃৎপিণ্ডে জমেছে যেন পর্য্যাপ্ত অক্সিজেন ; জীবনের প্রাচুর্য্য মুহূর্ত্তে ছাপিয়ে ওঠে অঙ্গে অঙ্গে। দ্রুতপদে দীনু এগিয়ে চলে সাঁস্যুচির দিকে।

গেটে তালা বন্ধ। ছোট ঘরখানায় দারোয়ানটা ঘুম'চ্ছে। দীনু স্বপ্নাহতের মত একবার গিয়ে দাঁড়ায় ফটকটার সাম্‌নে ; তারপর নিমেষে কি ভেবে নিয়ে ছুটে যায় ও পাশের ছোট গলিটার মুখে। ওর শরীরে যেন কতকাল পরে ফিরে এসেছে অসুরের বল ; ওর কৈশোরের, ওর প্রথম যৌবনের উদ্দাম সজীবতা।

অনায়াসে দীনু পাঁচিলটা ডিঙিয়ে ঢুকে প'ড়ল ভিতরে। চেনা—আগাগোড়া সবই চেনা ওর। এই পোর্টিকো, কোরিডোর, আর্চ, সাম্‌নের এন্‌গ্রেভ-করা দরজা, সবই যেন ওর চেতনার ভাঁজে ভাঁজে আঁকা! কোথাও এতটুকু অসুবিধা হয় না খুঁজে নিতে।

দরজা খোলা। দীনু কোরিডোর পার হ'য়ে এসে দাঁড়াল এম্‌ফিথিয়েটারের সাম্‌নে। হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে সুইচটা টিপে দিতেই জ্বলে উঠ্‌ল একশো পাওয়ারের বাতি। —ওর অতীত কল্পনার স্বপ্নলোক!

সেখান থেকে ক্লাব ঘর, লাইব্রেরী, লাউঞ্জ—সব ফিরে দীনু এসে দাঁড়াল সাঁস্যুচির হলে। এবার একসঙ্গে সব বাতিগুলো দিল জ্বেলে। ঝক্‌মক্‌ করে ষ্টেজ বর্ণতুলিকার বিচিত্র রেখায় সুসজ্জিত প্রমোদভবন। ষ্টেজের মাথায় নটরাজের ব্রোঞ্জমূর্ত্তি। বাইরে, একপাশে কবিগুরুর ষ্ট্যাচু ; অন্যদিকে ছোট পিলারের ওপর শ্বেতপাথরের নগ্ন নারীমূর্ত্তি।

দীনু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ও ভেবে উঠ্‌তে পারে না, হাস্‌বে না কাঁদবে। মনে হয়, প্রচণ্ড হাসিতে ঘরখানা ফাটিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই আসে কান্না।

ওদের প্রগতি ভবন! চলমান পৃথিবীর বুকে অগ্রগামী মানুষের পূজার দেউল! চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে দীনুর চোখদুটো ধাঁধিয়ে আসে। ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে ওর দৃষ্টি। মানস চক্ষে ভেসে ওঠে অতসীর রক্তাক্ত মুখ, অন্ধ ছেলেটার করুণ কাকুতি, আর গীর্জ্জার সাম্‌নে সেই মেয়েটার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা : একটা ঘেয়ো ভিখিরীর অর্দ্ধভুক্ত রুটির টুক্‌রো!—দীনু সইতে পারে না, আর তিলমাত্র দেরী সইতে পারে না ও।

ছুটে যায় কবিগুরুর ষ্ট্যাচুটার দিকে ; কিন্তু তুল্‌তে পারে না, দুহাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতেও তুলে আন্‌তে পারে না সেই গুরুভার মর্ম্মরমূর্ত্তি। টান্‌তে টান্‌তে সেটাকে নিয়ে যায় খিলানের নীচে ; সযত্নে লুকিয়ে রাখে একটী পাশে। তারপর?

—তারপর পেট্রোলের টিন্‌টা দেয়ালে ঠুকে ঢেলে দেয় ষ্টেজে—অডিটোরিয়মে—নগ্ন উর্ব্বশীর দেহে। দেশলাই জেলে দিয়ে দীনু ছুটে বেরিয়ে আসে বাইরে, একেবারে পাঁচিল টপ্‌কে এসে দাঁড়ায় ফুটপাথে। ওর সর্ব্বাঙ্গ তখন থরথর ক'রে কাঁপ্‌ছে।

দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল আগুন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছড়িয়ে পড়ে এম্‌ফিথিয়েটার, লাইব্রেরী আর ক্লাব ঘরে। দীনু হাসে, বীভৎস উল্লাসে ওর দেহমনে উথ্‌লে ওঠে হাসি।

—ওদের সভ্যতার দেউলে জ্বেলে দিয়েছে আহবাগ্নি! ওর আপন হাতে জ্বালা পূর্ণাহুতির শিখা পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাঙ্গ হ'য়ে জ্বলে উঠেছে অগ্রগামী মানুষের বিলাস মন্দিরে।

লোকজন, ফায়ার ব্রিগেড—মানুষের কোলাহল। প্রগতি ভবনের চারিদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে সব।

দীনু ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল ময়দানে। একবার মনে হ'ল, গিয়ে ধরা দেয় ওদের কাছে ; কিন্তু প্রবৃত্তি হ'ল না। হঠাৎ বুকের ভিতরটা হাহাকার ক'রে উঠ্‌ল। মনে হ'ল, কি যেন গেল ওর! আপনার, নিতান্ত আপনার কোন মহামূল্য সম্পদ গেল আজ ছাই হ'য়ে পুড়ে।—দীনু উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলো বড় রাস্তার কাছে। কিন্তু পা-দুটো আর এগিয়ে যেতে চায় না।—ট্রামের তারগুলোয় ঝক্‌ঝক্‌ করে আগুনের আভা। সাহেবি হোটেলের কাঁচের শার্সিতে পড়েছে লাল আলোর ছটা।

দীনু আবার ফিরে গেল ময়দানের পথ ধ'রে হনহন ক'রে এগিয়ে চল্‌ল সাম্‌নের দিকে। সহরের আলো তখন ম্লান হ'য়ে এসেছে। দিক্‌চক্রে ফুটে উঠেছে প্রকৃতির সোনালি স্নেহ। দূর পল্লীর নীলাঞ্জন তরুশ্রেণী আকাশের গায়ে। স্নিগ্ধ কাজলের মত চেয়ে আছে ওর মুখপানে। ভোরের বাতাসে ওরা হাতছানি দেয় শাখা-প্রশাখা দুলিয়ে। দীনু একবার স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়ায় : মাটীর বুকে এখনও আছে মানুষের অফুরন্ত ঠাঁই।

সমাপ্ত

ঝরো ঝরো আজ ঝরিছে শাওন

শ্রীনিখিলেশ রুদ্রনারায়ণ সিংহ

আকাশে কেবল সজল কাজল—
দামিনী খেলিয়া যায়।
আজি এ নিশিতে তারকার মালা
মিটি মিটি নাহি চায়॥

ব্যথায় ব্যথায় গুমরি উঠিবে
ব্যথা নাহি বাজে বুকে ;
নিদালি আঁখিতে নিদ নাহি হায়
ভাষা নাই আজ মুখে।

বাদল ঝুরিছে, দাদুরি ডাকিছে
কাঁদিছে আমার মন ;
উতলা হইয়া প্রিয়ারে খুঁজিয়া
নাহি পায় দরশন।

বরষা আমারে দেয় নি কো সাড়া—
সুদূর অজানা গায়॥
যে কাঁদন শুধু ঘুরিয়া মরিছে—
আকাশে বাতাসে যায়॥

ঝরো ঝরো আজ ঝরিচে শাওন
শ্রবণে পশিবে গীতি ;
পরাণ আমার খুঁজিয়া ফিরিছে
কাহার পরশ প্রীতি।

পথের দু-ধারে অতসীর বন
উপরে মেঘের রাশি —
ব্যাকুলা বাতাস দোল দিয়ে যায়
ঘন ঝাউ বনে পশি'।

নদীর বুকেতে কল-কল ধ্বনি
মেঘের আঁখিতে জল—
আমার বুকেতে অশ্রু-সায়র
উথলিছে অবিরল।

মন কেঁদে ফেরে ঘন বরিষায়
নয়নহীনের প্রায়॥
আঁধারের মাঝে প্রিয়ারে আমার
খুঁজিয়া নাহি কো পায়॥

বের্লিনে এক সপ্তাহ

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ রায় বাহাদুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উণ্টার ডেন লিণ্ডেন থেকে গেলাম আমরা অলিম্পিক ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে (Stadium)। এর নিকটেই একটি রেলওয়ে ষ্টেশন হয়েছে। এখান থেকে পঙ্গপালের মত দর্শকদল ষ্টেডিয়ামে যেতে পারবে, তার ব্যবস্থা হয়েচে। দর্শকদের জলপানের ব্যবস্থা আছে, কেউ মূর্চ্ছাপন্ন হলে তার জন্যে মোড়ে মোড়ে এম্বুল্যান্স, ডাক্তার প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। ষ্টেডিয়ামে এক লক্ষ বিশ হাজার লোকের বসবার স্থান হয়েছে। তারপর সন্তরণের জন্য পুকুর ও ষ্টেডিয়াম আছে, তাতে বিশ হাজার লোক বস্‌তে পারে; এমনি আরও দু'চারটি ষ্টেডিয়ম আছে। যার যেখানে অভিরুচি, সেখানে

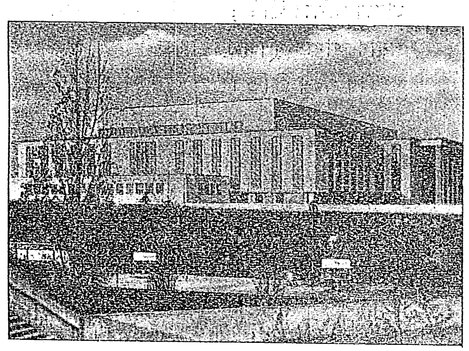

জার্ম্মাণীর প্রমোদ গৃহ

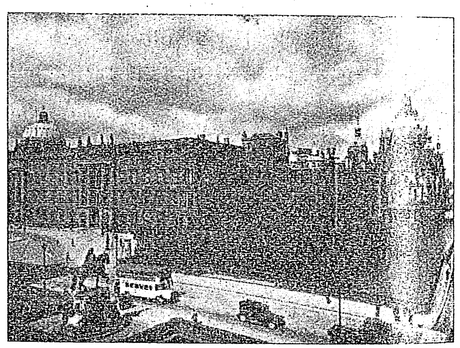

দুর্গ, গির্জা ও ফ্রেডারিকের মূর্ত্তি

সে বসে' স্বচ্ছন্দে খেলা দেখতে পারে। ষ্টেডিয়ামের নীচে রাস্তা এবং তার ধারে খাবারের ঘর, বিশ্রামাগার ও নানাবিধ দোকানপসারের বন্দোবস্ত রয়েচে।

অলিম্পিক উৎসব দেখা আমার ভাগ্যে ঘটে নি। ভীড়ের বহরটা আগেই ঠাহর করতে পেরেছিলাম, কাজেই আমার ভ্রমণ-পঞ্জীতে বের্লিনের যে সময়টা নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, সেটা ঐ উৎসবের ঠিক পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত। এতে আমি যে অনেক দ্রষ্টব্য জিনিষ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম, সে কথাটা পরে অনেকবার মনে হয়েছিল। কারণ এই অলিম্পিক ক্রীড়া-উৎসব এক বিরাট রাজসূয় যজ্ঞ। এই যজ্ঞের যিনি হোতা—হের হিট্‌লার—তিনি এই উপলক্ষে জার্ম্মাণীর অর্থ জলের মত ব্যয় করেছেন। যে জার্ম্মাণী ঋণভারে কাতর, যে জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্কগুলি অল্প দিন পূর্ব্বেও moratorium ঘোষণা করেছিল, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দেনা শোধ করতে যাদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছিল, এ কি সেই জার্ম্মাণী? জগতের অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে এই ছেলেপিলের খেলাধূলার জন্য প্রায় আট কোটী টাকা উড়িয়ে দিলে! আমাদের কাছে ত এ নিছক পাগলামি বলে মনে হয়।

কিন্তু ইউরোপে অন্যরকম। ইউরোপে 'তরুণসম্প্রদায়' (Youth movement) বলে একটি বাস্তব জিনিষ ক্রমশঃ গড়ে' উঠ্‌ছে। আমাদের দেশ নিস্তেজ, ম্রিয়মাণ, তাহলেও পশ্চিমের ঢেউ আমাদের জীবনের উপকূলে একটু আঘাত লাগ্‌ছে। তারই ফলে দেখা যাচ্চে, তরুণ সংঘ (Youth League), ছাত্র-সংহতি (Students' Federation) প্রভৃতি আন্দোলন ধূমায়িত হয়ে' উঠ্‌ছে। কিন্তু ওদেশের তরুণের দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত। সব দেশেই তাদের মধ্যে একটা চেতনার সাড়া পড়ে' গেছে। আমরা মুখস্ত বুলির মত আউড়ে আস্‌ছি যে তারা আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার

স্থল (young hopefuls)। কিন্তু আমরা কাজের বেলায় তাদের পশ্চাতে ফেলেই চলেছি। ইংলণ্ডে এখনও

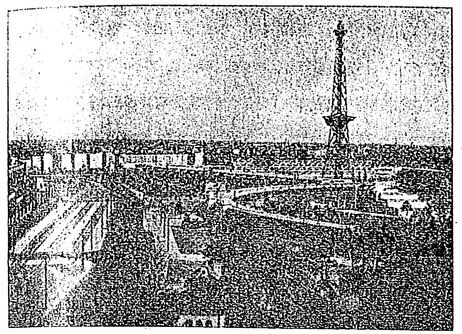

বের্লিন—নূতন ধরণের রাস্তা, বেতার মাস্তুল

কতকটা এই মনোভাব আছে। সেইজন্য বিলাতের বিখ্যাত বাগ্মী পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য লর্ড ইউষ্টন পার্সি (Lord Euston Percy) এই তরুণ-সম্প্রদায়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্‌স্‌এ। আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে এই তরুণ সম্প্রদায় মহাদেশে (Europe) এক ভীষণ ক্ষমতাশালী সংঘ হয়ে' দাঁড়াচ্চে (formidable power)। এদের আর অগ্রাহ্য করলে' চলে না। ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামে তরুণেরা হবে অগ্রণী। দেশের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে এদের

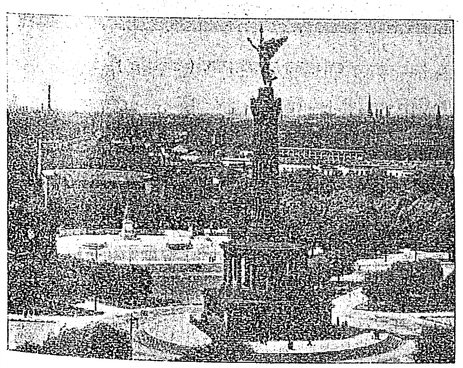

বিজয় স্তম্ভ ও ক্রোল রঙ্গমঞ্চ

মতই হবে বলবৎ, কারণ এরা জোট বাঁধলে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ক্ষমতা এদের করায়ত্ত হবে।

গত ১৮ই মে লণ্ডনের অ্যালবার্ট হলে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ষ্ট্যান্‌লি বল্‌ডুইন সাম্রাজ্যিক তরুণ সভায় বলেছিলেন 'জগতে স্বাধীনতা আজ বিপন্ন; গণতন্ত্রশাসনকে রক্ষা করতে হবে। বাইরের আক্রমণ থেকে গণতন্ত্রশাসনকে (Democracy) রক্ষা করবার ভার তোমাদের; ভিতরের বৈরতা হতেও এ শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে তোমাদেরই এবং হয়ত গণতন্ত্রশাসনের হাত থেকেও গণতন্ত্রশাসনকে রক্ষা করতে হবে। (It may be, you will have to save democracy from itself) ।' দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ সেনাপতি স্মাট্‌স্ বলেছেন—

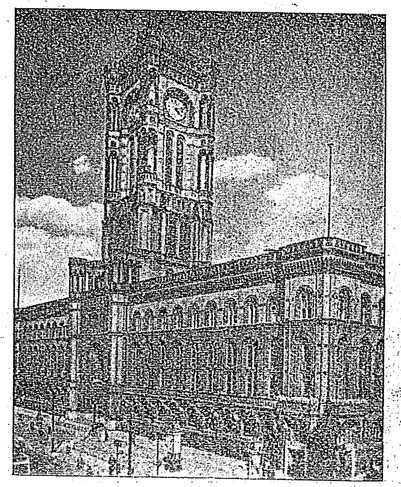

বের্লিনের টাউন হল

'মানব তার তাঁবু তুলেছে এবং যাত্রা সুরু করেছে। কিন্তু সে এগিয়ে যাবে তার আশার আলোকরাজ্যে অথবা পিছিয়ে চল্‌বে দুঃখ ও দৈন্যের গভীর অরণ্যে তা' ঠিক বলা যাচ্চে না।'*

ইউরোপ এখন সশস্ত্রভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে (Standing at armed attention—Stanley Baldwin) এই মরণ-বাঁচন সমস্যায় তরুণের দল যে একটি

* "Humanity has struck its tents and is once more on the march; but it is not certain whether it will march forward to the promised land or backward to the wilderness of sorrow and suffering."—General Smuts.

বিশিষ্ট স্থান করছে, এ ধ্রুব সত্য। তাই হিট্‌লার জগতের তরুণদলকে ক্রীড়াঙ্গনে আহ্বান করেছিলেন এবং তাদের কাছে জার্মাণীর ক্ষমতা, জার্মাণীর প্রতিষ্ঠা এবং জগতের সহিত জার্মাণীর সখ্য এই সব প্রচার করবার বিরাট আয়োজন তিনি করেছিলেন।

যে সকল খেলোয়াড় পৃথিবীর নানাদেশ থেকে জার্মাণীতে এই উপলক্ষে সমবেত হয়েছিলেন, তাদের যত্ন অভ্যর্থনার এরূপ বন্দোবস্ত হয়েছিল যে তা কল্পনা করা যেতে পারে না। বাইরে জার্মাণীর যে তত সুনাম নেই, সে কথা জার্মাণরা জানে। তাই ওরা জগতের তরুণদের কাছে ওদের আবেদন পেশ করবার জন্যই এই অলিম্পিক যজ্ঞের আয়োজন করেছিল। ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের বিবরণ পূর্ব্বেই বেরিয়েছে। তাঁদের কারও কারও সঙ্গে আমারও দেখা হয়েছিল ফিরবার সময়। দারা—

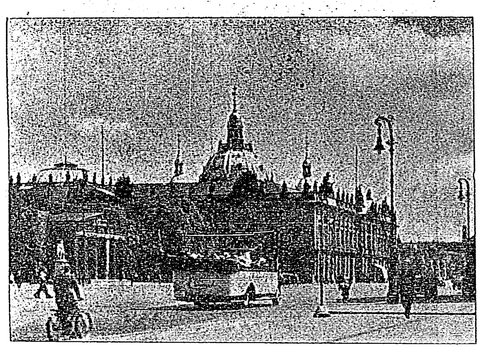

বের্লিনের অস্ত্রশালা

যিনি ভারতবর্ষের নাম হকি খেলায় রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন—আমাকে বললেন যে ওদের যত্ন আপ্যায়নের তুলনা নেই। সে বিষয়ে ওরা চরম করে' ছেড়ে দিয়েছে। সহরের বাইরে যে অলিম্পিক সহর হয়েছিল, জগতের বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড় দল এক একজনের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। প্রত্যেক দলের জন্য একখানা বা দুখানা মোটর গাড়ী (Rolles Royce) দিন রাত্রি হাজির থাকতো। এতদ্ভিন্ন খেলোয়াড়রা তাঁদের বিশিষ্ট চিহ্ন কোটে লাগিয়ে যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই বিনামূল্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছেন, ট্রামে বিনা ভাড়ায় যেতে পেরেছেন। এসব ছাড়া প্রীতিভোজ, উদ্যান-সম্মিলন প্রভৃতির ত কথাই নেই।

হিট্‌লার স্বয়ং এই খেলা দেখ্‌তে আসতেন এবং তরুণদের মতই আনন্দ করতেন। এই সকল কারণে অলিম্পিক ক্রীড়া-কৌতুক খুবই আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল, আর হিটলারের প্রতিষ্ঠা জগতের কাছে এবং জার্মাণীর কাছে দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল। একদিন একজন যুবতী ত সহস্র সহস্র লোকের মাঝে হিট্‌লারকে আলিঙ্গন করে' চুম্বন করেছিলেন। হিট্‌লার অবিবাহিত। সদ্য-সমাগত-যৌবনা বালিকার মত তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তারে এবং বেতারে বাহিত হয়ে এই সংবাদ পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে তখনই ঘোষিত হয়েছিল। এর কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের অধুনা পরিত্যক্ত-রাজ্য সম্রাট্ অষ্টম এড্‌ওয়ার্ডের প্রাণ-নাশের চেষ্টা হয়েছিল হাইড্ পার্কে। এর থেকেই বোঝা যায় যে বাতাস কোথায় কোন দিকে বইছে। এক দেশে চুম্বন, অন্য দেশে পিস্তল!

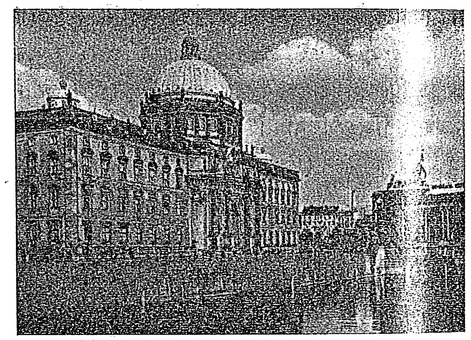

বের্লিনের রাজপ্রাসাদ (cast'e)

অলিম্পিক মল্লভূমি থেকে ফিরবার সময় দেখলাম বের্লিনের বে-তারবার্ত্তা ভবন (Broad casting), প্রকাণ্ড প্রাসাদ। তার সম্মুখে একটি হ্রদ। সু-উচ্চ বে-তারের মাস্তুল বহুদূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়।

এর পরে আমরা এলাম জার্মাণীর সুবিখ্যাত চিত্রশালায়। পাঁচটি চিত্রশালা প্রায় পাশাপাশি রয়েছে। সবগুলি দেখবার অবকাশ আমার হয় নি। পারগামন (Pargamon) চিত্রশালাটি ভাল করে' দেখতে সারা সকাল বেলা কেটে গেল। আমাদের দেশে নোট, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি একরকম কাগজে ছাপা হয়, তাকে পার্চমেণ্ট (parchment) বলে। চামড়া থেকে এই কাগজ প্রস্তুত হয়।

সম্ভবতঃ এই পার্চমেণ্ট কথাটি থেকে ওর আবিষ্কর্ত্তাদের দেশের নাম পার্গামন হয়েছিল। এসিয়া মাইনর, ব্যাবিলন, আসুর (Assur), উরুক প্রভৃতির প্রাচীন নিদর্শন এই পার্গামন চিত্রাগারে রক্ষিত আছে। ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শনও একস্থানে দেখলাম। যাঁরা প্রাচ্যের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা করেন, তাঁদের জন্য প্রাচীন সহর ব্যাবিলনের সিংহদ্বার, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির চিহ্ন সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তার ভিতর গেলেই মনে হয় যেন সুদূর প্রাচীনকালের কোনও সহরের ভিতর পথশ্রান্ত পথিকের মত ঘোরাচ্ছি। এই যাদুঘর দেখবার জন্য একজন প্রদর্শকের সাহায্য নিয়েছিলাম, তাকে দক্ষিণাও দিতে হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ কিছু উপকার তার দ্বারা হয় নি। কয়েকটি ঘর দেখিয়ে সে হস্ত প্রসারিত করলো, বললো যে এই পর্য্যন্ত

বের্লিনের একটি থিয়েটার

তার সীমানা। অন্য ঘর সম্বন্ধে সে হয় কিছুই জানে না, নয় ত তার অন্য ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। পার্গামন চিত্রশালার প্রবেশ-দ্বারটি অতি সুন্দর। এই চিত্রশালার পাশে একটি ছোট খাল; খালের উপর প্রশস্ত সেতু; সেই সেতু পার হয়ে প্রবেশ করতে হয় এই চিত্রশালায়।

এই চিত্রশালার নিকটেই জার্মাণ চিত্রশালা (Deutsh Museum); তার ভিতরেও অনেক বিখ্যাত শিল্পীর চিত্রাদি রক্ষিত হয়েছে। এই সব দেখে স্প্রী নদীর তীরে এলাম। অনতিদূরে একটি পুরাতন ফ্রান্সিস্কানদের গির্জা ও স্কুল। শুন্‌লাম এই স্কুলে বিস্‌মার্ক পড়েছিলেন। এর কাছেই একটি যায়গায় সমস্ত ঘর বাড়ী ভেঙ্গে ফেলছে। নতুন প্রণালীতে বাড়ী তৈরী হবে এবং সরকারী দপ্তরখানা কতক কতক এই অঞ্চলে থাকবে। সেখান দিয়ে আলেকজাণ্ডার প্লাজায় এলাম—তার অনতিদূরে নেপ্‌চুন ফোয়ারা। নেপচুনের বৃহৎ মূর্ত্তিটি শক্তির এবং তার নীচে রমণীগুলির মূর্ত্তি স্নিগ্ধতার প্রতীক; এ দুয়ে মিশে বেশ একটু মাধুর্য্যের সৃষ্টি করেছে—যা' ঝর্ণাধারার বেগ ও কমনীয়তা সুন্দর প্রকাশ করে।

ফিরে আসতে বেলা হয়েছিল। উণ্টার ডেন লিণ্ডেন যেখানে ফ্রিড্‌রিশ ষ্ট্র্যাসে এসে মিশেছে, তারই মোড়ে একটি বৃহৎ রেস্তঁরায় বসে' কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল এবং কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। একদল সৈন্য ব্যাণ্ড বাজিয়ে উণ্টার ডেন লিণ্ডেনের বুকের মাঝখান দিয়ে গর্ব্বিত পদক্ষেপে চলেছে। আর একজন রমণী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে'

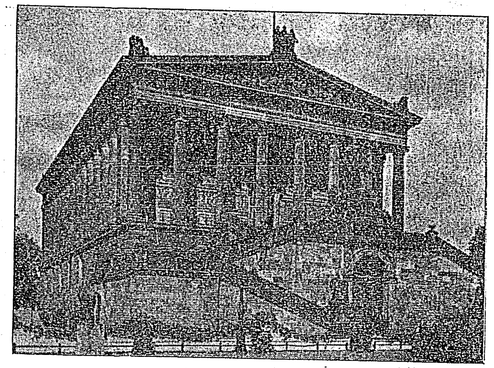

জার্মাণীর জাতীয় যাদুঘর

আমাদের ভোজনবিলাসীদের মধ্য দিয়ে 'ছিগারেট ছিগারেট' বলে ফিরি করে' বেড়াচ্চে। সিগার ও সিগারেটের ট্রে-খানি তার গলদেশ থেকে ঝুলছে। মেয়েটি যৌবনের প্রান্তে উপনীত হয়েছে। কিন্তু তার সর্ব্বাঙ্গে লাবণ্য যেন উছলে পড়ছে। সে কোনোদিকেই তাকাচ্ছে না, কেবল ডেকেই চলেছে। অবাক হয়ে তাকে দেখলাম, কিন্তু কেউ যে তার কাছ থেকে কিছু কিন্‌ল না এজন্য দুঃখ বোধ হতে লাগলো। ইউরোপের মহাদেশে তামাকখোরের সংখ্যা বোধ হয় কম। কোনও কোনও সহরে দেখেছিলাম Tabac Bar—অর্থাৎ তামাকের 'শুঁড়িখানা'! মদের দোকান আর তামাকের দোকান বোধ হয় ওদের চোখে তুল্য-মূল্য।

বের্লিনের নিকটে পট্‌স্‌ড্যাম একটি অতি রমণীয়

উপবন। ফ্রেডারিক দি গ্রেট এখানে সরোবরে ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন, ফোয়ারা নির্ম্মাণ করেছিলেন এবং প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ তৈরী করেছিলেন, তার নাম সাঁ সুসি (Sans Souci) অর্থাৎ 'নিশ্চিন্ত'—যেখানে চিন্তা, ভাবনা, উদ্বেগ কিছু নেই। পট্‌স্‌ড্যাম আমার দেখা হয় নি। সুতরাং তার বর্ণনা করবো না।

বের্লিনে কতকগুলি ব্যবহার্য্য জিনিষ কিনেছিলাম—যথা জুতো, মোজা, কালি ইত্যাদি। একটি ক্যামেরাও কিনেছিলাম। সর্ব্বত্র দোকানদাররা কি স্ত্রী, কি পুরুষ ভদ্র, বিনয়ী এবং ব্যবসাভিজ্ঞ। দরাদরি বিশেষ দেখলাম না। জুতোর দাম তার পিছনেই মুদ্রিত অক্ষরে লেখা আছে। লণ্ডনেও জুতো কিনেছিলাম, সেখানে লেগেছিল

আলেকজাণ্ডার প্লাজা (পার্ক)

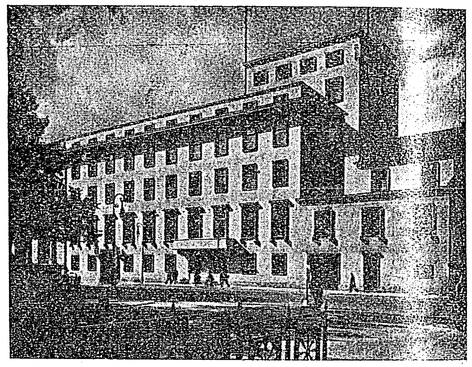

জার্মাণীর সরকারী দপ্তরখানা

এক গিনি, এখানে ১২½ মার্ক। অর্থাৎ প্রায় একই দাম। কিন্তু জিনিষপত্র যেন বের্লিনেই ভাল।

দুই একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে হোটেলে আলাপ হলো। তাঁদের মনোভাব কথাবার্ত্তায় বড় একটা ধরা দিতে চান না। বিশেষতঃ বিদেশীর সঙ্গে অল্প পরিচয়ে তাঁরা দেশের কোনও খবরই দিতে চান না। তবে যেটুকু সংগ্রহ করতে পারলাম তার নিষ্কৃষ্টার্থ এই যে যুদ্ধের দাগ তাদের মনের পট থেকে মুছে যায় নি এবং রাগটা বেশী ইংরেজদের উপর। যুদ্ধের আগেও ওদের এই রকম মনোবৃত্তি ছিল বলে' শুনেছি। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া ওরা ওদের এই হিংসা প্রচার করতো।

যুদ্ধে ইংরেজরা জয় লাভ করেছে, জার্মাণীর হা'র হয়েছে। সেজন্যে অবশ্য জার্মাণীর একটা বিজাতীয় রাগ থাকা সম্ভব। কিন্তু সে রাগ ক্রমশঃ পড়ে' যায়। এদের মধ্যে এত বিজাতীয় ঘৃণা কি করে' আবির্ভূত হলো, তাই ভাবতে লাগলাম। মনে হলো যে এ আর কিছু নয়, হ্যাভ ও হ্যাভনটের (Have and Have nots) চিরন্তন বিবাদ। ইংলণ্ডের দূরবিসর্পী (far-flung) সাম্রাজ্য আছে, অর্থবল আছে, উপনিবেশ (colonies) আছে। জার্মাণীর কিছু নেই, কাজেই জার্মাণী ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে' যাচ্চে। এইজন্যে ইংলণ্ডের কোনও কোনও রাজনীতিজ্ঞ বলেন যে জার্মাণীকে তাদের উপনিবেশগুলি (যুদ্ধের আগে যা ছিল) ফিরাইয়া দেওয়া ভাল। কারণ তা হলে তারা শান্ত হবে। আমার কিন্তু সন্দেহ হয়। যাঁরা উপনিবেশ ফিরিয়ে দেবার কথা বল্‌ছেন, তাঁরা বোধ হয় মনে ভাবছেন যে একদিন না একদিন জার্মাণ-জটায়ু ছোঁ মেরে' নেবেই। মানে মানে ফিরিয়ে দেওয়া ভাল।

জার্মাণীও ধীরে ধীরে উপনিবেশগুলি ফেরত চাইবার জোগাড় করছে। ওদের প্রথম কথা হচ্চে যে ওদের প্রসারের জন্য উপনিবেশগুলির দরকার। দ্বিতীয় কথা এই যে জার্মাণীর শিল্প-উপাদান (Raw Materials) সীমাবদ্ধ। দিন কতক বাদেই সে সব শেষ হয়ে যাবে। তখন উপায় কি হবে? প্রথম কথা সম্বন্ধে বলা যায় যে, বাপু তোমাদের জনসংখ্যা ত খুব প্রবলবেগে বাড়ছে না। তোমরা ছড়িয়ে পড়বার জন্য এত ব্যস্ত কেন? লোকসংখ্যার গড় ইউরোপের মধ্যে বরং বেলজিয়মে বেশী, ইংলণ্ডের প্রত্যেক বর্গ মাইলে ২১০, জার্মাণীর ১৪০। ইংলণ্ডে জন্মের হার হাজারে ৭, জার্মাণীতেও তাই। রাসিয়ায় ১৭। তার পরে শিল্প-উপাদান সম্বন্ধে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ বলে যে উপনিবেশ থেকে উপাদান শতকরা মাত্র ৩ ভাগ পাওয়া যায়। ফ্রান্সের মত শ্রমশিল্পবহুল দেশেও ত তামা, পারা, গন্ধক, পেট্রল নাই। সুতরাং জার্মাণীর যে উপনিবেশ না হলে চলছে না, একথা সর্ব্বৈব বাজে। যাই হোক, জার্মাণীর মনে এই উপনিবেশ নিয়ে একটা মস্ত ক্ষত হয়ে আছে এবং যতদিন সেটা থাকবে ততদিন জার্মাণী ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারছে না।*

* অনেকদিন আগেকার লেখা। কিন্তু বর্ত্তমান জটিল রাষ্ট্রনীতির কিছু কিছু আভাস হয় ত এর মধ্যে পাওয়া যাবে। —লেখক

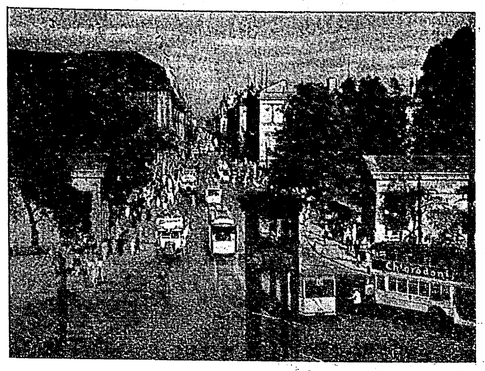

পট্‌স্‌ড্যাম পার্ক—বের্লিন

বিরহিণী

শ্রীকালিদাস রায়

চারিদিকে অন্নকষ্ট হাহাকার ব্যাধির পীড়ন,
অবিচার, অত্যাচার, দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব হরণ,
রণাঙ্গনে আহতের আর্ত্তনাদ ঘরে ঘরে শোক,
অসংখ্য জ্বালায় আজ জ্বলে' মরে জগতের লোক ;

তার মাঝে এ বর্ষায় বাতায়নে বসি একাকিনী,
প্রবাসী দয়িত লাগি কে গো তুমি দীনা বিরহিণী
করিতেছ অশ্রুপাত ? সাধ ক'রে বিলাসব্যসন,
সুকোমল শয্যাসুখ, রূপসজ্জা, সর্ব্ব প্রসাধন

তেয়াগেছ। ব্যর্থ হয় হেন ঘন বরষার দিন,
তাই ভাবি নেত্র তব অশ্রুভরা, তনু তব ক্ষীণ,
মুখ শতদল ম্লান। কাঁদ কাঁদ বিরহিণী নারী
তোমার সখের দুঃখে ফেলিবে না নয়নের বারি

কোন কবি এই যুগে। তব গূঢ় হৃদয়বেদনা
বিশ্বেরে জানাতে কেহ করিবে না শ্লোকের রচনা

বিনাইয়া বিনাইয়া, অপব্যয় করিকল্পনার
করিবে না কেহ তব অতি তুচ্ছ বিরহ ব্যথার
কথা নিয়ে। এই যুগে তাহাদের নাহি অবসর,
হংসদূত রচিবার কল্পনাই এবে হাস্যকর।

সে যুগ গিয়াছে চলি যেই যুগে তোমাদের কথা,
উপজীব্য করি কাব্য রচিবার ছিল চিরপ্রথা,
ছিল কিছু সার্থকতা। তোমাদের বিরহবিলাস
যাহাদের কাব্যচ্ছন্দে বিরচিত দিব্য রসোল্লাস

নির্ম্মূল সে কবিকুল। যুগ গেছে নিয়ে কাব্যধারা,
দরদী কবির দল, কালসিন্ধু মাঝে আজ হারা।
বিরহ তেমনি আছে পুরাকালে আছিল যেমন
এখন বিরহ শুধু হাস্যকর অরণ্যে রোদন।

কাঁদ বিরহিণী নারী। চাহিবে না কেহ আজ ফিরে,
দশমী দশায়ও যদি উপনীত হও ধীরে ধীরে।

বিশ্ব-প্রবাহ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ঘূর্ণায়মান ফাইল

জরুরি চিঠির অনুসন্ধানে কেরাণীবাবুদের অনেক সময় নাজেহাল হ'তে হয়। সম্প্রতি সাগরপারের অফিসগুলিতে ঘূর্ণায়মান ফাইলের আবিষ্কারে সেখানের কেরাণীরা আশ্বস্ত হ'য়েছেন। এই ফাইলে ২৫০০০ চিঠির উপযোগী স্থান আছে। দ্রুত এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অল্প আয়াসে ফাইলের চাকা

ঘূর্ণায়মান ফাইল

ঘুরিয়ে দরকারী চিঠির সন্ধান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। এমন কি এক হাত দিয়ে প্রত্যেক চিঠিগুলি স্বতন্ত্র ভাবে স্থানান্তরিত করা বা ফাইল মধ্যে সংরক্ষিত করা যায়। আমাদের দেশে এইরূপ ফাইলের চলন হ'লে কেরাণীকুল রক্ষা পায়।

অপরাধী ব্যক্তির মাথার মাপ

খরিদদারগণের টুপির মাপের জন্য যে উপায় টুপি-বিক্রেতারা অবলম্বন করে, তা' বর্ত্তমানে অপরাধী ব্যক্তিগণকে সনাক্ত করতে পুলিশকে সাহায্য করছে। বর্ত্তমানে রাসায়নিক বিজ্ঞানের ও অস্ত্র চিকিৎসা বিদ্যার প্রসার লাভে অপরাধী ব্যক্তি অনায়াসে আঙ্গুলের ছাপ পরিবর্ত্তন করতে পারে। কিন্তু মানুষ তার মাথার খুলির আকার পরিবর্ত্তন করতে পারে না। পরীক্ষা দ্বারা আরও দেখা গেছে এক-জনের মাথার মাপ অন্যজনের সহিত সমান নয়। সেইজন্য বর্ত্তমানে অপরাধীদের মাথার সঠিক মাপের জন্য এক যন্ত্রের

মাথার মাপ লইবার যন্ত্র

আবিষ্কার করা হ'য়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে অপরাধী বেশী দিন আর আত্মগোপন করতে পারবে না।

আলোর কাচ অপসারণ

বর্ত্তমানে এক প্রকার বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের আবিষ্কার হ'য়েছে। তার সাহায্যে মোটর গাড়ীর বড় আলোর কাঠাম-বিহীন কাচগুলিকে নিরাপদে স্থানচ্যুত করা যায়। যন্ত্রটিকে

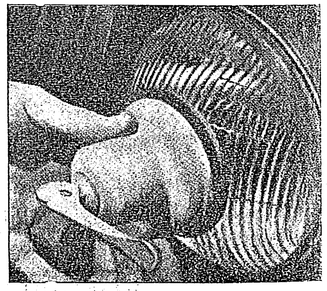

কাচ অপসারণ যন্ত্র

আলোর কাচের মধ্যভাগে বসিয়ে যন্ত্রের উপরের হাতল সাহায্যে বায়ু নিষ্কাশন করা হলে যন্ত্রটি কাচের সহিত

দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়। এইরূপ যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বেশী হ'লেও ইহার সাহায্যে কত আলোর কাচ যে নিঃশব্দে হোত হ'বে তা ভেবে অনেকেই সশঙ্কিত হবেন।

শিক্ষানবিস চালকদের ব্যবস্থা

যানবহুল সহরে শিক্ষানবিস মোটর চালকদের নিরাপদে মোটর শিক্ষার জন্য জন এল ইয়ঙ্গ এক অভিনব উপায়

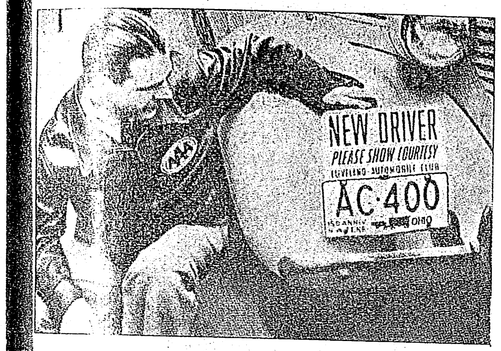

আবিষ্কারক জন এল ইয়ঙ্গ

আবিষ্কার করেছেন। চিত্রে মোটরের সম্মুখ ভাগে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি লাগান হ'য়েছে। এই বিজ্ঞপ্তির মর্ম্ম অপর মোটর চালকগণের নিকট সুপরিচিত। সুতরাং তাহারা এইরূপ গাড়ীর আবির্ভাব লক্ষ্য করলেই পূর্ব্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করে।

অভিনব মোটর

এই সভ্যতার যুগে নূতনের আবির্ভাব নিত্য। মনোরম যানবাহন হিসাবে যার আজ আদর বেশী কিছুদিন পরে তারও আর অস্তিত্ব থাকবে না। বর্ত্তমানে একটি সুদৃশ্য মোটর যানের আবির্ভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নিখুঁত ইস্পাতে গাড়ীর বর্হিভাগ দৃঢ়-ভাবে আবৃত হ'লেও অনায়াসে তা খুলে ফেলা যায়। গাড়ীর যন্ত্রাদি যথাস্থানে পুনরায় সংযুক্ত করতে মাত্র পনের মিনিট সময় লাগে। যিনি এই মোটর যানের আবিষ্কারক তিনি বলেন, গাড়ীর সকল যন্ত্রপাতি দীর্ঘকালব্যাপী ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়েছে। গাড়ীর ছাদের আলোটি সম্মুখের রাস্তা ও গাড়ীটিকে একই সময়ে আলোকিত করে। ফলে অন্ধকারেও গাড়ীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বজায় থাকে। উত্তপ্ত যন্ত্রাদি ঠাণ্ডা রাখবার জন্য পার্শ্বস্থ পথ দিয়া বায়ু চলাচল করে।

অভিনব পেলিকেন 'এ্যাস ট্রে'

অসাবধানতার জন্য সাধারণ 'এ্যাসট্রে' হ'তে অগ্নিকাণ্ডও হয়েছে—তাই অভিনব 'এ্যাস ট্রে'র আবিষ্কার। আবিষ্কারকের বিশ্বাস এইরূপ পাত্রই একমাত্র নির্ভরশীল।

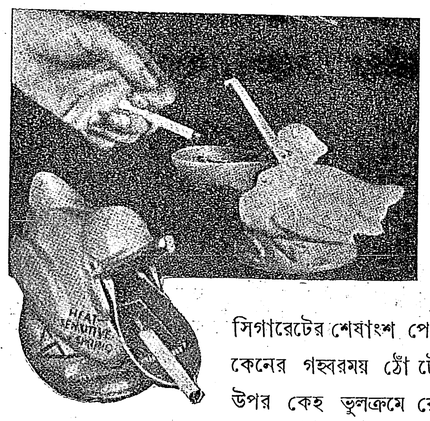

পেলিকেন 'এ্যাস ট্রে'

সিগারেটের শেষাংশ পেলি-কেনের গহ্বরময় ঠোঁটের উপর কেহ ভুলক্রমে রেখে গেলেও উত্তাপ অনুভবনীয় প্রাংটী উত্তপ্ত হ'লেই পেলিকেনের ঠোঁট দু'টিকে বন্ধ করে দেয়—ফলে সিগারেট খণ্ড তার শরীর মধ্যস্থ গহ্বরে সমাধি-লাভ করে।

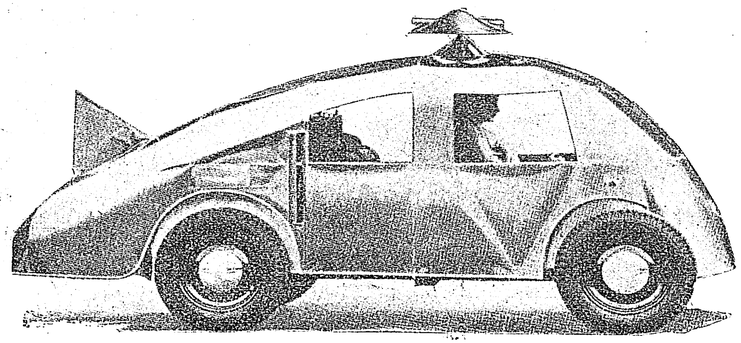

সুদৃশ্য মোটর যান

শাকশব্জীর তৈয়ারী পুতুল

ব্যঙ্গচিত্রে ক্রীড়ারত খেলোয়াড়দের বিচিত্র ভঙ্গি দেখে আমরা আমোদ পাই। দশ বৎসর বয়সের মেধাবী বালক হ্যারোল্ড ব্রাউন শাকশব্জী থেকে খেলোয়াড়দের বিচিত্র ভঙ্গিমাকে রূপ দিয়েছে। এই ছেলেটির বুদ্ধিকৌশলে আলু, পটল, কমলালেবু প্রভৃতি কিরূপে মানুষ ও তাদের খেলার সরঞ্জামে রূপান্তরিত হয়েছে তা' ছবিতে দেখান হ'ল।

ডান দিকের ছবিটিতে ব্রাউন মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। বাম দিকের ছবিটি একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের। খেলোয়াড়ের শরীর আলু দিয়ে, হাত পা গুলি শাকের ডাটা থেকে আর পায়ের বুট বাদাম থেকে তৈয়ার হয়েছে।

উপরের ছবিটি একজন সাইকেল চালকের। চালকের বিস্ফারিত চক্ষু, লম্বা নাসিকার অগ্রভাগ ও সাইকেল চালনার ভঙ্গিমা প্রভৃতির সংমিশ্রণ ছবিটিকে সত্য সত্যই বাস্তবে রূপ দিয়েছে।

বাম দিকের ছবিটি একজন পোলো খেলোয়াড়ের।

রাশিয়ান ট্যাঙ্ক

একটি রাশিয়ান ট্যাঙ্ক অদ্ভুত কৌশলে নগ্ন সেতুর উপর দিয়ে নদী অতিক্রম করছে।

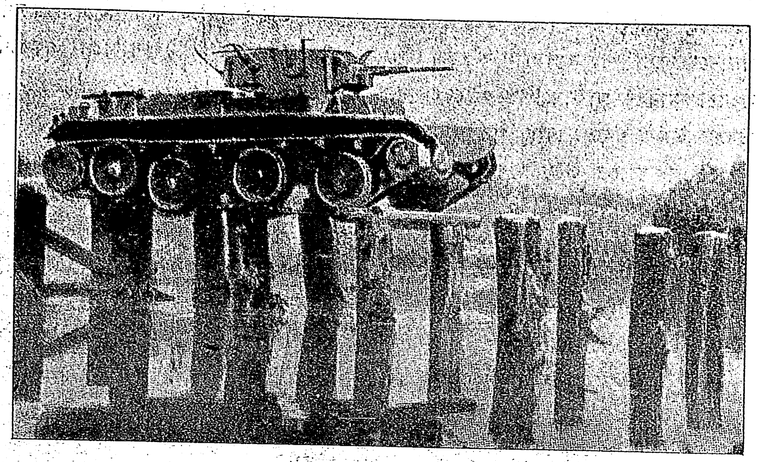

রাশিয়ান ট্যাঙ্ক

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতা

শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতার ছড়াছড়ি চারিদিকে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতার খবর কয়জনে রাখেন?

সম্প্রতি ইউরোপের বাজারে একটি শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতা বের হয়েছে। তাতে সর্ব্বসমেত ৩০৭১টি শব্দ আছে। ক্লুগুলির কাগজটি লম্বায় ৩৪ ইঞ্চি ও চওড়ায় ২৮ ইঞ্চি। এর সমাধান করতে পূর্ণ এক বৎসর লাগবে। হতাশ হ'বার কারণ নেই—সময় এখনও আছে। অন্যান্য সকলের ন্যায় ইহারও সমাধান শীলযুক্ত খামে পাঠাতে হ'বে। পুরস্কারের পরিমাণ আশাপ্রদ।

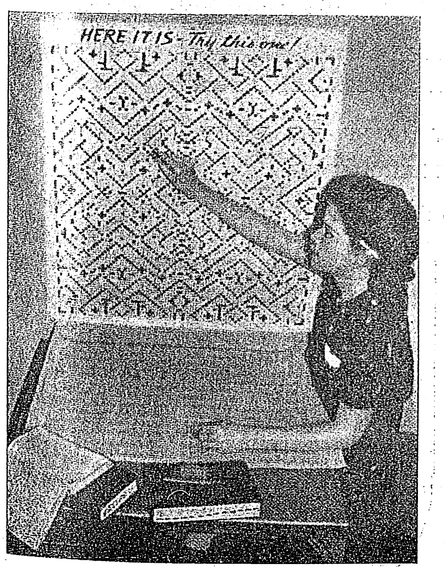

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শব্দ শৃঙ্খল কুপন

শিশুদের গ্যাস মুখোস

তিন বৎসরের গবেষণার ফলে বৃটিশ নক্সাকাররা বিষাক্ত গ্যাসের হাত থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য গ্যাস মুখোস তৈয়ার করেছে।

সকলপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে এই জাতীয় মুখোস

শিশুদের গ্যাসমুখোস

শিশুদের উপযোগী। চিত্রে জনৈক ইংরাজ মহিলা তার সন্তানকে মুখোস পরান অভ্যাস করছেন। মুখোসে আলোক-সঞ্চারী আবরণ থাকায় শিশুকে দেখা যাচ্ছে। নিম্ন-ভাগের একটি যন্ত্রে বায়ু পূর্ণ থাকে। প্রয়োজনীয় সময়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য ঐ যন্ত্র হ'তে শিশুকে বিশুদ্ধ বাতাস সরবরাহ করা হয়।

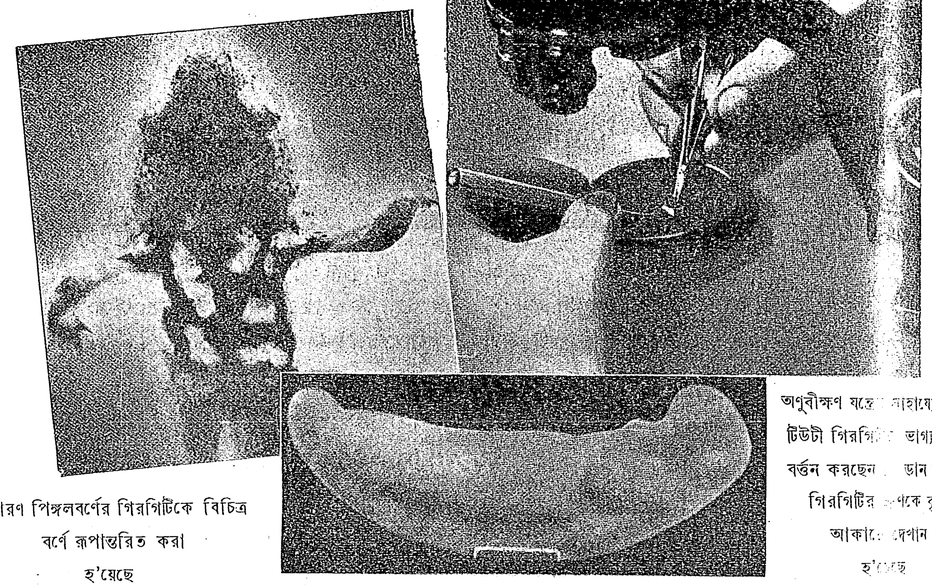

সাধারণ পিঙ্গলবর্ণের গিরগিটিকে বিচিত্র বর্ণে রূপান্তরিত করা হ'য়েছে

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ডাঃ টুইটী গিরগিটির ভাগ্য পরিবর্ত্তন করছেন। ডান দিকে গিরগিটির ভ্রূণকে বৃহৎ আকারে দেখান হ'য়েছে

প্রাণীর দৈহিক গঠন পরিবর্ত্তন

প্রকৃতির খেয়ালে জীবজগতে কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তনই না সংঘটিত হয়। বর্ত্তমানে কালিফোরনিয়ার ষ্টানফোর্ড ইউনিভারসিটির অধ্যাপক ডাঃ ভিক্টর সি টুইটী বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবের দৈহিক গঠন ও বর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করে বিজ্ঞানের এক নূতন যুগ এনেছেন। গিরগিটি জাতীয় এক উভচর প্রাণীর দেহে অস্ত্রোপচার দ্বারা সাধারণ পিঙ্গল বর্ণের ঐ জাতীয় প্রাণীকে তিনি বিচিত্র বর্ণের গিরগিটিতে রূপান্তরিত করেছেন। সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার দ্বারা ঐ জাতীয় উভচর প্রাণীর দেহে অতিরিক্ত পা এবং অস্বাভাবিক স্থানে চক্ষু, মাথা প্রভৃতি উৎপাদন করতেও সক্ষম হ'য়েছেন।

এইরূপ পরীক্ষার ফলে একদিন মানুষের দৈহিক গঠন ও বর্ণ বৈচিত্র্যের উপর যে কৃত্রিম শক্তি ধারণ করা যেতে পারে তা তিনি বিশ্বাস করেন। ডাঃ টুইটী সাধারণ বিচিত্র বর্ণের গিরগিটির বর্ণপ্রস্তুতকারী রঞ্জগুলি (Pigment cells) সাধারণ একবর্ণের গিরগিটির প্রথম অবস্থায় ভ্রূণে সংযুক্ত করে তাহাকে বিচিত্র বর্ণের গিরগিটিতে রূপান্তরিত করেছেন।

মাছ ধরা ছিপ রাখার ব্যবস্থা

গাড়ীর চালে মাছধরা ছিপ

মাছ ধরা সখ মিঃ চেম্বারলেনেরও যখন আছে তখন আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত কেরাণীদের এ খেয়ালকে অবজ্ঞা করা যায় না। ছুটির দিনে তাঁদের ছিপ হাতে ট্রামে, বাসে, সাইকেলে ও হেঁটে যাওয়ার ব্যস্ততা লক্ষ্য করবার মত।

প্রলোভন দেখিয়ে মাছকে কাবু করবার ব্যবস্থা অনেক রকম থাকলেও এই লম্বা ছিপটিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই অসুবিধা ভোগ করেন। সম্প্রতি ছিপটিকে নিরাপদে রাখবার ব্যবস্থা করে কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁদের এই দুর্গতির ভার লাঘব করেছেন। অবশ্য আমাদের দেশে এইরূপ ব্যবস্থায় বেশী সংখ্যক লোকই খুসী হ'বেন না। মটর গাড়ীর চালে চিত্রে বর্ণিত অবস্থায় ছিপটিকে রাখবার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করা হ'য়েছে।

বেড়ার আড়াল

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

চিতার বেড়াটি কুটীর দুটিরে রেখেছে আড়াল করি—
প্রকৃতির বোনা পর্দ্দাটি যেন—পাতার নীলাম্বরী!

তারি পার হ'তে সকালে ও সাঁঝে কানে আসে মাঝে মাঝে
কাঁচের চুড়ীর আওয়াজটি কা'র বাসন-মাজার কাজে!

কূপের ধারটি মুখরিত তার কলসে ও কঙ্কণে
স্নানের বেলাটি নিতি নিতি মোর জাগায় চকিত মনে।

গৃহ-গাভীটির উদ্দেশে তার কলকণ্ঠটি শুনি—
বেড়ার এপারে তাই নিয়ে আমি জল্পনা-জাল বুনি!

অনুকূল বায়ে ভেসে আসে যবে মাথাঘষা-সৌরভ,
ঘরে বসে করি কত কল্পনা সম্ভব-অসম্ভব!

মনে-মনে ভাবি একলা-ঘরের আকুল আকিঞ্চন
চির-অভাগিনী প্রতিবেশিনীর প্রগল্ভ প্রসাধন!

ন'ড়ে উঠে বেড়া—কেঁপে উঠে মন—চোখ মেলে দেখি চেয়ে
ছায়াখানি শুধু—গাভীরে টানিয়া সরায় তরুণী মেয়ে।

নিতি প্রাতে যবে মৃদু সুকণ্ঠে গীতিগুঞ্জন শুনি,
বেড়ার এপারে একা শুয়ে আমি বাসনার জাল বুনি।

সেদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে' সহসা দেখিনু চেয়ে—
মোরই আঙিনায় গাভীর দড়িটি টানাটানি করে মেয়ে!

বেড়াখানি ভাঙা! এপার-ওপার অবাধ অবন্ধন—
জীবনে যেন-বা প্রথম খুলিল দক্ষিণা-বাতায়ন।

নূতন আলোকে ভ'রে গেল আঁখি, বাধা আর নাই কিছু।
ভাঙা বেড়া হ'তে কহিল কাতরে, নয়ন করিয়া নীচু

ভারী দুরন্ত গরুটি—দেখ তো—ভেঙেচুরে একাকার!
হাসিয়া কহিনু—নহিলে কি আলো আসিত পূর্ণিমার?

ভ্রূকুটি হানিয়া হাসিমুখে বালা শিরে টানি দিল বাস—
ওপারে-ওপারে মরা-গাঙে ভরি' জুয়ারের উচ্ছ্বাস!

আচার্য্য মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃত জ্ঞান মানুষকে কুসংস্কারের দাস করে এবং সকল প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রতি উদাসীন করে এইরূপ একটি ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু সে ধারণা কখনও সম্পূর্ণরূপে সত্য হতে পারে না; কারণ সংস্কৃত কৃষ্টির বয়সের প্রাচীনতার দোষে বাইরে ময়লা জমলেও তা ভিতরকে কলুষিত করতে পারে নি, ভিতর সত্যই সাঁচ্চা আছে। এমনও দেখা যায় যে সংস্কৃত শিক্ষা এবং সংস্কৃত কৃষ্টির আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েও কোন কোন ব্যক্তি সমাজ-সংস্কারের অনুরাগে, স্বাধীন চিন্তার প্রতি নিষ্ঠায় এবং সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিতে সকলের অগ্রণী হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার একটি জলন্ত উদাহরণ। মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী তার অন্যতম উদাহরণ।

চব্বিশ পরগণায় খাঁটুরা গ্রামে এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয় ২৪শে এপ্রিল ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১০ই বৈশাখ ১২৭২ অব্দে। তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর মাতামহ ভগবানচন্দ্র তর্কালঙ্কার এই অঞ্চলের এক বিশিষ্ট টোলের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পিতৃব্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার কয়েক বছর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন। এই সংস্কৃতের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়ে বাল্যকালে তিনি কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষাই শিক্ষা করেছিলেন এবং স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে হয় ত তিনি আস্‌তেন না।

কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ঘট্‌ল অন্য রকম। তাঁর পিতা ধরণীধর শিরোমণি মারা গেলেন তাঁকে মাত্র দশ বছরের বালক রেখে। ফলে এক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, তাঁর বিধবা মাতা তাঁর একমাত্র পুত্রের প্রতি কেবল আদরের মাত্রা পরিবর্দ্ধিত ক'রেই তাঁর পিতার অভাব মোচন করতে চেষ্টা করলেন এবং তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে হলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। এইরূপে দু-এক বছর কাট্‌ল। কৈশোরের প্রারম্ভেই এই বালকের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হ'ল। তিনি নিজেই নির্দ্ধারণ করলেন যে, কলিকাতায় গিয়ে বিদ্যা শিক্ষা করবেন। মায়ের আদর এবং মায়ের প্রতিবাদ তাঁর সে প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে বিচলিত করল না। তিনি বেশ বয়স্ক অবস্থায় সংস্কৃত কলেজের স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ করলেন, কিন্তু প্রতি বছর ডবল প্রমোশন লাভ ক'রে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯০ অব্দে তিনি সংস্কৃত এম এ পরীক্ষায় সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে উত্তীর্ণ হন।

এমন অনেকে থাকেন যাঁদের মানসিক শক্তি এত পরিবর্দ্ধিত যে কেবল একটি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি তাঁদের তৃপ্তি দেয় না। মুরলীধরের প্রতিভা সেই ধরণের ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে এম্-এ হয়েও তাঁর ইংরেজীতে অধিকারের খ্যাতি এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যে, ইংরেজীর অধ্যাপক রূপেই প্রথম চাকুরী পেতে তাঁর কোন অসুবিধা হয় নি। ১৮৯১ সালে তিনি কটক রেভন্‌শ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। পরে ১৯০৩ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে তিনি ইতিহাসের, দর্শনের এবং সংস্কৃতের অধ্যাপকতা কার্য্য করেছিলেন। পরে ১৯১৭ সালে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ অধ্যাপনার ব্যবস্থা হয় তখন তাঁর উপর প্রাকৃত ভাষা অধ্যাপনার কার্য্য ন্যস্ত হয়। বলা বাহুল্য তার কারণ এই যে, এ বিষয়ের ভার গ্রহণ করবার উপযুক্ত অপর ব্যক্তির তখন অভাব ঘটেছিল। তিনি ১৯১০ সাল থেকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুর পর ঐ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে অক্টোবর মাসে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পরেও তাঁর অধ্যাপনা কার্য্যের সহিত বিচ্ছেদ হয় নি। তিনি বরাবর, মৃত্যুর ছয়মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্য্য করেছিলেন। মোটামুটি বহু বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যই তাঁর প্রতিভার বিশিষ্টতা ছিল।

মুরলীধর যে সমস্ত পুস্তক রচনা ক'রে গেছেন তা সংখ্যায় বেশী নয়; কিন্তু চিন্তাধারায় তাদের মৌলিকতা আছে, তাই হ'ল তাদের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষায় অন্ধভাবে কেবলমাত্র নিছক স্মরণ শক্তির সাহায্যে বিষয় আয়ত্ত করা তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। সকল বিষয়ই বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে

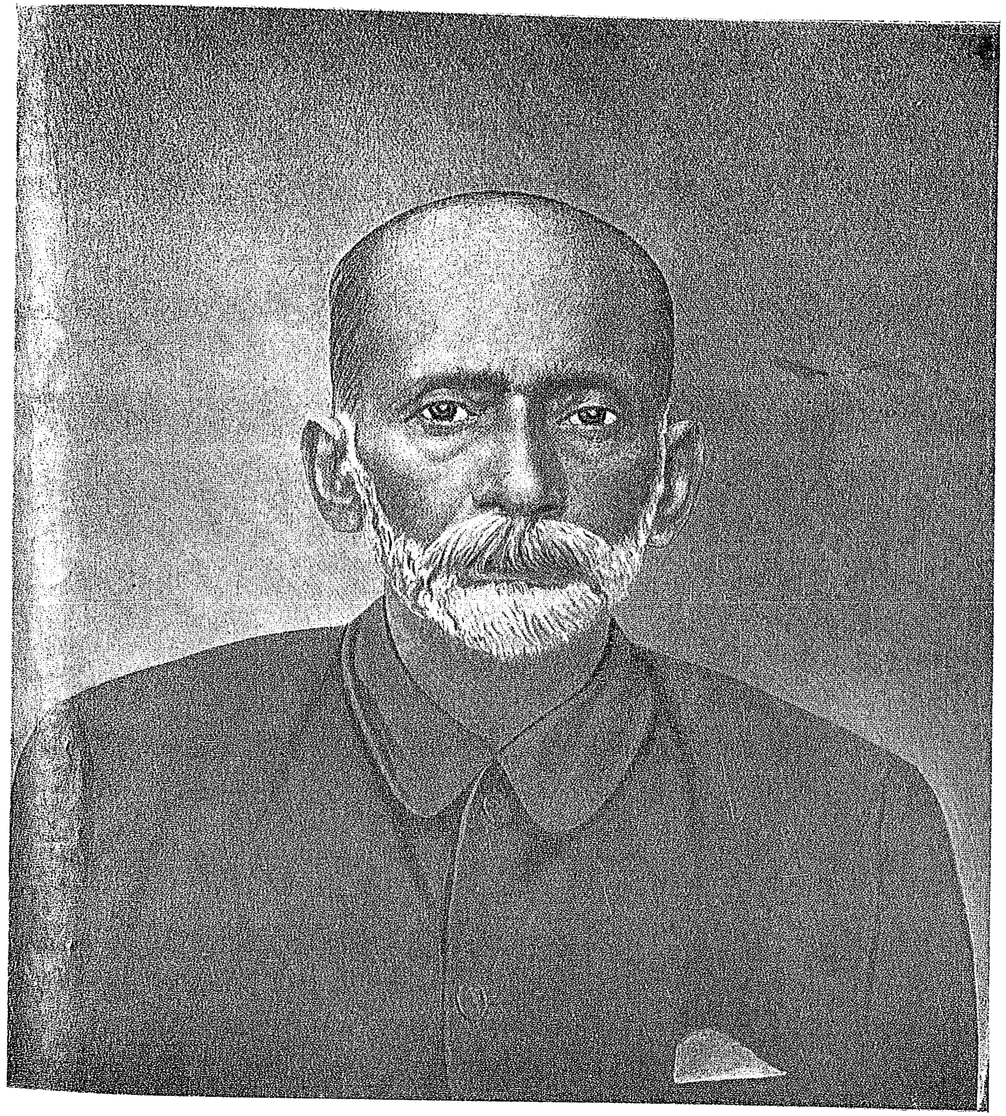

জন্ম—২৪শে এপ্রিল, ১৮৬৫ আচার্য্য মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যু—৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৩

হজম ক'রে তারপর আয়ত্ত করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি, ছোট ছেলেদের বর্ণ শিক্ষাতেও তিনি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির এই কারণে বিরোধী ছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি "বাংলা অক্ষরপরিচয়" প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে তিনি বর্ণশিক্ষা পদ্ধতির দুইটি আমূল সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন: (১) অক্ষরগুলিকে শব্দ অনুসারে না সাজিয়ে তিনি আকৃতি অনুসারে সাজিয়ে ছিলেন; তার যুক্তি এই যে, শিশুর শব্দ এমনি আয়ত্ত হয়েছে এবং যে অবস্থায় তার বর্ণশিক্ষার প্রয়োজন হয় তখন সেই শব্দের আকৃতির সহিত পরিচয় ঘটানই তার বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। (২) দ্বিতীয়ত তিনি অক্ষরের আকৃতির জন্মের ইতিহাস আবিষ্কার করেন এবং যে ধারা অনুসারে অক্ষরের জন্ম হয়েছে, সেই ধারা অনুসারে শিশুকে অক্ষর শিখানর ব্যবস্থা করেন এবং এই শিক্ষা প্রণালীকে "জননানুক্রমিক পদ্ধতি" নাম দেন।[১] এই প্রণালী তাঁর গবেষণা মতে বিজ্ঞানসম্মত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হ'তে তিনি দুখানি পুস্তক সঙ্কলন করেন। "হেমচন্দ্রের দেশী নামমালা" অতি প্রসিদ্ধ প্রাকৃত অভিধান। তার একটি সংস্করণ জার্ম্মাণ পণ্ডিত পিশেল প্রকাশ করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। এখন সে বই দুষ্প্রাপ্য। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য তিনি দেশী নামমালার একটি আধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় যে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেছেন তার তিনি ১৯২৮ সালে আমূল সংস্কার করেন।

কিন্তু তাঁর চিন্তাধারায় মৌলিকতা সব থেকে বেশী পরিস্ফুট হয় তাঁর দার্শনিক গবেষণায়। বিশ্বের সকল দর্শনের তুলনা-মূলক সমালোচনা করে দর্শনের ইতিহাস লেখা তাঁর একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। এই ইতিহাস রচনার জন্য তিনি আলোচনার একটি বিশেষ প্রণালীও বার করেন এবং তার নামকরণ করেন "জননানুক্রমিক আলোচনা" (Genetic Method)। বিষয়টি এত পারিভাষিক (technical) যে তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে সার্থক হবে না। সংক্ষিপ্ত ভাবে এইটুকু বল্‌লেই হবে যে, এই প্রণালী যে ক্রম অনুসারে দার্শনিক জগতে কোন সমস্যার জন্মলাভ হয় এবং ক্রমবিকাশ লাভ করে তা নিজের সার্থকতা খুঁজে নেয় সেই প্রণালীতেই তিনি প্রতি দার্শনিক সমস্যার আলোচনার প্রস্তাব করেন। মোটামুটি তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, জগতের সকল দর্শনের মধ্যেই অল্প বিস্তর সত্য নিহিত আছে। এই মতগুলির পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণ এই যে, তারা কেউ একা সমগ্র সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সমগ্র সত্যকে লাভ করতে হলে এই পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য আন্‌তে হবে এবং সেই সামঞ্জস্যের মধ্যেই পূর্ণ সত্য আত্মপ্রকাশ করবে। গল্পে কথিত পাঁচটি অন্ধ ব্যক্তির হাতী সম্বন্ধে অভিমত যেমন তাদের নিজেদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অনুসারে পরস্পরবিরোধী অথচ অন্য ভাবে সত্য, এও সেইরূপ। তাদের সকলের মতের সামঞ্জস্য আন্‌লে যেমন হাতীর পূর্ণরূপের বিবরণ পাওয়া যায়, এখানেও প্রতি দার্শনিক সমস্যা সম্বন্ধে সকল বিরোধী মতের সামঞ্জস্যের মাঝখানে সেই সমস্যার পূর্ণ সমাধান পাওয়া যায়। তিনি এই পুস্তক শেষ করতে পারেন নি, কেবল একটি খসড়া এবং প্রথম কয়েকটি পাতা লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পুস্তকটি সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করেন।[২] ঠিক দার্শনিক সমস্যার তুলনা-মূলক আলোচনা মাত্র এই পুস্তকটি নয়। এটি একটি নূতন দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করে। বিশেষ বিবরণের জন্য আসল পুস্তক দ্রষ্টব্য। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এই পুস্তক প্রকাশ করেছেন।

দেশের নিকট তাঁর সব চেয়ে বড় দান তাঁর সমাজ সংস্কারের চেষ্টা। কোন রকমে প্রাচীন কাল হতে মাত্র টিকে থাকায় তিনি হিন্দুসমাজের সার্থকতা দেখ্‌তে পেতেন না। হিন্দুসমাজ ছাই চাপা আগুন, ভিতর তার সাঁচ্চা; কিন্তু বাহির তার বার্দ্ধক্যের দোষে ক্লেদযুক্ত। সেই ক্লেদ, সেই আবর্জ্জনা হল আমাদের কুসংস্কার, আমাদের জাতি-ভেদ, আমাদের নারীনিগ্রহ। সেই ক্লেদকে অপসারিত করবার প্রয়োজন যে কেবল হিন্দুসমাজের উন্নতি সাধনের

(১) তাঁর "বাংলা অক্ষর পরিচয়" চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং প্রকাশিত পুস্তকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(২) A Genetic History of the Problems of Philosophy, Published by the Calcutta University

উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত তা নয়, তার প্রয়োজনীয়তা আরও বড় কারণের জন্য। তাঁর মতে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এমন মহত্ত্ব নিহিত আছে যে, সে মহত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই সেই সকল সংস্কার, যা নীচতা, যা জাতি বিদ্বেষ বা যা সম্প্রদায়-বিশেষের সুবিধা খোঁজে—তাদের সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করতে হবে। সাম্য প্রচার করা যে ধর্ম্মের মূল নীতি তার মাঝে জাতিভেদের যুক্তি নাই; সর্ব্বভূতে যে ধর্ম্ম ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে তার মাঝে নীচতার স্থান নাই; নারীকে শ্রদ্ধা করা এবং পূজা করা যে ধর্ম্মের শিক্ষা সেখানে নারী পুরুষের বিভিন্ন ব্যবস্থার অনুমোদন নাই। ১৯১৯ সালে যখন প্যাটেল ভারতীয় আইন সভায় অসবর্ণ বিবাহের সমর্থক আইনের প্রস্তাব করেন তিনি তীব্র সংস্কার বিরোধী দলের সমালোচনা সত্ত্বেও সেই প্রস্তাবিত আইনের সপক্ষে তুমুল আন্দোলন চালান। ফলে বঙ্গীয় সমাজ সংস্কার সমিতি স্থাপিত হয় এবং পরে ঐ সমিতির তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই সমিতির চেষ্টায় মেদিনীপুরে ১৯২০ সালের এপ্রিলে বাংলার প্রথম সমাজ সম্মিলনীর বৈঠক হয়। সেই সম্মিলনীর সভাপতি রূপে তিনি হিন্দু সমাজ সম্পর্কে উল্লিখিত উদার আদর্শের বাণী প্রচার করেন। এই সম্পর্কে তাঁর সেই বক্তৃতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"মন্ত্র ও উপনিষদাত্মক শ্রুতি যে ধর্ম্মের মূল, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম যাহার শাখা, গীতা পুরাণ ও তন্ত্র যাহার সমন্বয়, তাহা কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে। সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ই সেই ধর্ম্মের বিশেষত্ব ও গৌরব। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্' যে ধর্ম্মের উপদেশ, কেবল মানুষের নয়—সর্ব্ব জীবে দয়া ও প্রীতি যে ধর্ম্মের বিধান, স্বদেশ প্রীতি নহে, জগদ্ধিত যাহার নীতি, যে ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায়বিশেষের সম্পত্তি নহে, যাহার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অন্য সম্প্রদায়কে বহিষ্কৃত করিতে হইবে।"

ঘরের কোণে বা লাইব্রেরীর কোণে বসে নির্ব্বাক ভাবে যিনি অধ্যয়নে অভ্যস্ত তিনি আবার প্রয়োজন হলে কর্ম্মেও কুশল হতে পারেন। সে কথা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। সমাজ সংস্কারের জন্য, নারীর পুরুষের সহিত শিক্ষায় অধিকারে সমান সুযোগ দেবার জন্য, জাতিভেদ দূর করার জন্য তিনি আপ্রাণ পরিশ্রম করেছিলেন। কত বিধবা-বিবাহে, কত অসবর্ণ-বিবাহে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, যেখানে লোকনিন্দার ভয়ে পুরোহিতের সাহচর্য্য পাওয়া যায় নাই, সেখানে তিনি নিজে পৌরোহিত্যের কার্য্য সানন্দে সম্পাদন করেছেন।

শেষ জীবনে অবসর গ্রহণের পরও তিনি জনহিতকর নানা কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। দক্ষিণ কলিকাতার বালিগঞ্জ তাঁর বাসস্থান ছিল। এই বালিগঞ্জের সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠানেরই তিনি উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বালিগঞ্জের প্রথম উচ্চ ইংরাজি স্কুল জগদ্বন্ধু বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন এবং বহু বৎসর তার সম্পাদক ছিলেন। বালিগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক। বালিগঞ্জের ছেলে ও মেয়েদের অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং দাতব্য চিকিৎসালয়েরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৩৩ সালের ৩০শে নভেম্বর কয়েক দিনের রোগ ভোগের পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। সেদিন বালিগঞ্জবাসী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে কার্পণ্য করে নাই।

গান

শ্রীরাখালদাস চক্রবর্ত্তী

মাটীর ধরায় ওরে আজি জাগে মানুষের দেবতা,
ভুলে যা রে তুই স্বর্গের কথা, ভুলে যা রে সে-কথা।
মাঠের সবুজ শস্যের সাথে
আপনা বিলায়ে মিতালি যে পাতে,
তারি ঘরে মোর নারায়ণ জাগে, তারি লাগি যত ব্যথা।
দেবতা নহে গো মন্দির-মাঝে,
তার পদধ্বনি কুটীরে যে বাজে,
নর-নারায়ণ, সে নহে গোলকে, আমি গাহি তারি কথা।

পোলাণ্ডের কথা

শ্রীশিশির সেন

জার্ম্মানী ও ইতালী জাতীয়-রাষ্ট্রের পরিকল্পনার ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করলে। এই শতকেই পোলিশ জাতীয়তাবোধও বৃদ্ধি পায়। মধ্যযুগে পোলাণ্ডের এমন একদিন ছিল যখন য়ুরোপীয় বিশিষ্ট শক্তিসমূহের ভিতরে তার একটি স্বতন্ত্র আসন ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে পোলাণ্ডীয় সামরিক শক্তির জয়ডঙ্কা কন্টিনেণ্টের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিনাদিত হ'ত। কিন্তু সব কিছু পোলাণ্ডের ইতিহাসকে বিক্ষিপ্ত করে তুললে এর আভ্যন্তরিক মতবাদ ও স্বদেশীয় যোগ্য ব্যক্তিগণের কূটমন্ত্রণা। ১৭৭২, ১৭৯৩ এবং ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এর সীমা-প্রাচীর কর্ত্তিত হ'ল অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া এবং রুশিয়ার মধ্যে। নেপোলিয়নীয় মধ্য-অঙ্ক পরিসমাপ্তির পর ভিয়েনা কংগ্রেস ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বণ্টনকারীদের মনুষ্যদ্বেষী কার্য্যের জন্য এর নিজস্ব বোধিত শীল সন্নিবেশিত করলে। গত নিরনব্বুই বৎসর ধরে অর্থাৎ—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কার্য্য সহ্য করা হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দুই কোটি পোলাণ্ডবাসী রুশিয়ার প্রজা হিসেবে গণ্য হ'ল; পঞ্চাশ লক্ষ অষ্ট্রিয় সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করল এবং অবশিষ্টাংশ জার্ম্মান রাইখ দলের সঙ্গে সম্মিলিত হ'ল। য়ুরোপের মানচিত্র হ'তে জাতীয়-রাষ্ট্র হিসেবে পোলাণ্ডের চিত্র উঠে গেল—কারণ পোলাণ্ডের অধিবাসীরা বৈদেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

কিন্তু পোলিশ জাতীয়তাবাদ ধ্বংস হবার কোনরূপ আশঙ্কা ছিল না এবং তার নিজস্ব জাতীয়তা রক্ষার জন্য ফ্রান্সের সাহায্যের জন্য উন্মুখ ছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সেখানকার বিদ্রোহকারীগণ জায়গীর প্রথার মূলচ্ছেদ করলে। ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও আত্ম-প্রকাশ নীতি সমর্থিত হ'লো। রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়ার প্রতি বিদ্বেষ এবং বিদ্রোহীদিগের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন তরুণ-পোলবাসীদিগকে নেপোলিয়ান ও প্রজাতন্ত্র গঠনের পক্ষে উদ্বুদ্ধ করলে। যখন পোলিশদিগের বিরুদ্ধা-চরণ ১৮৩০ সালে অকৃতকার্য্যতায় পর্য্যবসিত হ'লো তখন স্বদেশভক্তগণ ওয়ারশ থেকে প্যারীতে এসে সমবেত হ'লেন। তখন থেকেই পোলাণ্ড ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক জীবন ও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সহায়তা ক'রে আসছে। গত মহাযুদ্ধে ফ্রান্স খোলাখুলিভাবে পোলিশদের দৃঢ়তা সমর্থন করে। একবার তার সহযোগী রুশিয়ার অভিসন্ধি ফেঁসে যায়। ১৯২০ সালে যখন নব পোলাণ্ড ও সোভিয়েট রুশিয়া পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠে, ফ্রান্স তখন পুনরায় পোলাণ্ডকে সামরিক সাহায্য করে। সেই বৎসর থেকেই ফ্রাঙ্কো-পোলিশ কুটুম্বিতা স্থাপিত হয়—সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় বিভিন্ন পরিস্থিতির ভিতরেও তারা সমব্যথায় ব্যথী।

বিসমার্কের অভিপ্রায় ছিল রুশিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব রাখা। সেই অভিপ্রায় কর্ণধার কাইজারকে পরিত্যাগ করায় বিপর্য্যস্ত হয়ে ওঠে এবং ১৯১৪ সালে রুশিয়া ও জার্ম্মানীতে যুদ্ধ বাধে। বর্ত্তমানে হিটলারও তাঁদের সাবেকী বিচক্ষণতায় ফিরে গেছেন—অন্তত প্রকাশ্যভাবে তাঁরা রুশিয়ার বিরুদ্ধবাদী নন। পোলিশরাও তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, কারণ বিসমার্কের মানসিক ভাব তাদের অজানা নয়। তাঁর সময়ই জার্ম্মানী পোলিশদিগের ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করবার সুযোগ অন্বেষণ করে। অধিকন্তু পোলিশ জেলাসমূহে জার্ম্মান কৃষকগণকে বসিয়ে তাদের জার্ম্মান মনোভাবাপন্ন ক'রে তোলবার চেষ্টাও চলে; কিন্তু পোলিশরা অতি সংলগ্নতাশীল জাতি।

গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে পোলাণ্ডের পক্ষে জয়ের আশা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। ফ্রান্স ছিল ধূর্ত্ত-উৎপীড়ক রুশিয়ার সহায়ক। জারের রাজত্বে অষ্ট্রিয়ান এবং জার্ম্মান পোল-বাসীরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে তোলে। তবুও পোলিশ জাতীয়তাবোধের ভিতরে ছিল একটা অদ্ভুত শক্তি এবং এর মূলে ছিলেন চার্লস্ জোসেফ পিলসুড্স্কি। জার-বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তিনি সাইবেরিয়াতে পাঁচ বৎসরের জন্য ১৮৮৭ সালে কারারুদ্ধ হন। ছয় বৎসর

পরে তিনি একটি বিপ্লবাত্মক সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন। ছাপার কাজ গোপনে করা হ'ত বলে পুনরায় তার জেল হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি লণ্ডনে ছিলেন। মাইল-এণ্ডের একটি বাড়ীতে পোলিশ স্বদেশপ্রেমিকদের গোপন সভা বসত। ১৯০২ সালে পোলাণ্ডে ফিরে বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের সর্ব্বজন-স্বীকৃত প্রতিনিধি হন। চার বৎসর পরে ১৯০৫-৬ সালের আন্দোলনের সময় তিনিই রুশিয়ার সৈন্যবাহিনী আক্রমণের বিলি ব্যবস্থা ও পোলিশ বন্দিগণের মুক্তির উপায় করেন। এর ফলে তিনি অষ্ট্রিয়ায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি সামরিক সমিতি গঠনের পরিকল্পনা করেন এবং সত্যি সত্যিই তাঁর সৈন্যবাহিনী বিনা বিরোধে যুদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত হ'তে আরম্ভ করে।

১৯১৪ সালে যখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় পিলসুড্স্কি পোলিশ ইণ্ডিপেন্ডেণ্ট্ পার্টিতে যোগ দেন। ক্রাকোতে একটি ঘোষণা-পত্রে পোলবাসীদিগকে রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আবেদন জানান। ৫ই আগষ্ট পিলসুডস্কি ও তাঁর সেনাগণ অষ্ট্রিয়া ও রুশিয় পোলাণ্ড অতিক্রম করেন এবং কীলেস্ অধিকার করেন। কীলেস্ শহর ক্রাকোর পঁচাত্তর মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। সেই হেতু অষ্ট্রিয়ার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথম নব-পোলিশ শক্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করেন। ইতিমধ্যে রুশিয়ার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস্ একটি ঘোষণা-পত্রে পোলিশদিগের পৃষ্ঠপোষণের জন্য আবেদন জানান। জারের অধীনে পোলাণ্ড পুনরায় ধর্ম্মগত, ভাষাগত ও স্বায়ত্তশাসন অধিকার লাভ করে নবজীবন লাভ করতে পারবে। রুশিয়ার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, যে তরবারি টানেনবার্গের শত্রুকে আঘাত করেছে তাতে এখন মরচে পড়েনি অর্থাৎ ১৪১০ সালের পোলদিগের জার্ম্মানদের উপর মহান জয়ের উল্লেখই এতে নিহিত আছে। ডমোস্কির উদাহরণ স্বরূপ ওয়ারশতে চারটি পোলিশ দল সম্বর্দ্ধিত হয়। অষ্ট্রিয়া থেকে একটি শ্রেষ্ঠতর প্রস্তাব প্রস্তুত করা হ'ল এবং অধিকাংশ রুশীয় পোলেরা জার সরকারকে তাদের সমর্থন দিলে। ফ্রান্সে হাজার হাজার পোলেরা সাধারণ-তন্ত্রে সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হয়ে কাজ করে। আমেরিকাতে প্রসিদ্ধ পিয়ানো-বাদক পিডারেস্কির অধীনে দুর্ভাগ্য দেশের প্রতিকার কল্পে একটি দল গঠিত হয়। ঠিক এই প্রকারের কমিটি লণ্ডনেও ১৯১৫ সালে সৃষ্টি হয়।

ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়ান কর্ম্মকর্ত্তারা সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচকিত হয়ে ওঠেন। এই সব কারণে পিলসুড্স্কি ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে, পোলেরা অবশ্যই জার্ম্মানদের প্রতিরোধ করবে। তাঁর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা বলশালী হয়। গুপ্ত বিগক্ষতা পোলদের পক্ষে সম্ভব হয় এবং সৈন্যবাহিনী অষ্ট্রিয়ার সেবা করতে থাকে।

পোলিশ সমস্যার শুভাশুভ নিয়ে পশ্চিমে আজ ঔৎসুক্যের শেষ নেই। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় পার্লিয়ামেণ্ট এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, পোলিশ রাজ্য বহু শতাব্দী ধরে সভ্যতার একটি অঙ্গস্বরূপ ছিল তাকে একতার নিদর্শন স্বরূপ স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসনপূর্ণ রাষ্ট্র হিসাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। পিলসুড্স্কি ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে কর্ম্মে ইস্তফা দিলেন। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, কেন্দ্রীয় শক্তি রুশীয়দের রুশীয়া-পোলাণ্ড হ'তে বিতাড়িত ক'রে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তেই পৌছুতে পারে নি। পর বৎসর তিনি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট দেশনেতাগণ প্রমাণ করলেন যে, পোলিশ যোদ্ধ্দল স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে ও প্রাণ দিচ্ছে। অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় শক্তির ভাবগতিকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যোদ্ধ্দল সাময়িকভাবে পুরোভাগ হতে অবসর গ্রহণ করলে।

জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার বর্ত্তমানে লোকের প্রয়োজন। কাজেই পোলাণ্ডকে পাথেয় স্বরূপ পাবার জন্য ঘোষণা করা হয় যে পোলরাষ্ট্র অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর গোপন চুক্তিতে জার্ম্মানী বা অষ্ট্রিয়-পোলাণ্ডের কোন অংশের অন্তর্গত হবে না—কোন স্বাধীন বৈদেশিক রাজনীতি থাকবে না এবং সেনাদল জার্ম্মানীর অনুমোদন ক্রমেই পরিচালিত হবে। এমন কি, সীমান্ত প্রদেশসমূহের বিষয়গুলোও শান্তির পরে মীমাংসা করা হবে। পোলবাসীরা এ প্রস্তাব রাষ্ট্রের মন্ত্রই সন্দেহের চোখে দেখলে। সুতরাং তারা এ আহ্বানে খুব অল্প সাড়াই দিলে। কিন্তু রুশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সূচনা দেখা দিল। অগ্রগামী বিদ্রোহী দল পেট্রোগ্রাডে প্রাদেশিক গভর্মেণ্টের অভিষেক করলে। শীঘ্রই প্রচার

করা হ'ল যে এই পোলিশ রাষ্ট্র স্বাধীন ও একীভূত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কেবল রুশিয়ার সঙ্গে স্বাধীন সামরিক মিলন এবং শ্লাভ জনগণের জার্ম্মান পেষণের দুর্গ-প্রাচীর হিসাবে সংঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবে। এই প্রস্তাবে ফরাসী, ব্রিটিশ, ইতালীয় ও আমেরিকার জনগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হ'ল। পিলসুড্স্কি যোদ্ধ্গণকে জার্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ার সেনাদলের অনুরুক্তি প্রতিজ্ঞা-পত্রে বিরুদ্ধতা করবার আদেশ দিলেন। যারা পিলসুড্স্কির আদেশ পালন করলে জার্ম্মান সরকার তাদের নিরস্ত্র করে বন্দী করলে। ১৯১৭ সালে জুলাই মাসে পিলসুড্স্কি ও পোলাণ্ডের সমর-মন্ত্রী সমোস্কিকেও গ্রেপ্তার করলে। এর ফলে পিলসুড্স্কি স্মিগ্লি-রিজের উপর পোলিশ সামরিক ব্যবস্থার ভার দিলেন। বর্ত্তমানে তিনিই পোলাণ্ডের সেনাধ্যক্ষ।

রুশিয়া ও জার্ম্মানীতে বলশেভিক্ ক্ষমতা বিস্তারের পর পুনরায় নতুন ক'রে পোলিশ চিন্তাধারায় আঘাত লাগে। কারণ পোলেরা উক্রেনিয়ন রিপাব্লিককে তাদের নিজেদের দেশেরই একটি অঙ্গস্বরূপ মনে করত। অপরপক্ষে ত্রয়োদশ প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে ইউ, এস কংগ্রেসের কাছে তাঁর চতুর্দ্দশ দফার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিলেন: 'An independent Polish State should be erected which should include the territories inhabited by indisputably Polish populations, which should be assured a free and secure access to the sea and whose political and economic independence and territorial integrity should be granted by international covenant.' ব্রিটেনের পক্ষ হতে লয়েড্ জর্জ্জ বললেন: 'independent Poland is a necessity for western Europe's stability.' মহাযুদ্ধের শেষ বৎসর বিশৃঙ্খলার সময় জার্ম্মান, রাশীয় ও অষ্ট্রিয়ানগণ পোলিশ সেনাবাহিনীর পূর্ব্বভাগ আক্রমণ করে। এর ফলে ওয়ারশতে একটি মন্ত্রণাসভা গড়ে ওঠে এবং এতে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামের প্রস্তাবই গৃহীত হয়। অক্টোবর মাসের মধ্যেই যোদ্ধগণ পোলাণ্ডের দাবী দৃঢ়তর করবার পক্ষে আরও অনেকটা এগিয়ে যায়। কেন্দ্রীয় শক্তি ভেঙ্গে যায় ও বিপন্ন হয়ে পড়ে। ১১ই নভেম্বর পিলসুড্স্কি জেল থেকে মুক্তি পান এবং তাঁকে ওয়ারশতে রিজেন্সি কাউন্সিল কর্ত্তৃক সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রদান করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত পোলাণ্ড স্বাধীন হয়।

পিলসুড্স্কি দেখতে পেলেন, পোলাণ্ড আজ বিধ্বস্ত। এর কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা-প্রাচীর নেই। জার্ম্মান সৈন্যের প্রাবাল্য এখনও বিদ্যমান। রুশীয় সৈন্যরা আক্রমণশীল। লউ নেবার জন্য উক্রেনিয়ান প্রচেষ্টা বলবৎ। জার্ম্মানেরা বিনা ক্লেশে সরে দাঁড়াল, কিন্তু উক্রেনিয়ানদের দিয়ে একটি সুষ্ঠু যুদ্ধ ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত পরিচালনা করলে। স্মিগ্লি রিজের প্রতিষ্ঠানকে স্তম্ভ স্বরূপ রেখে পিলসুড্স্কি তিন মাসের মধ্যে এক সেনাবাহিনী গঠন করলে। সরকারীভাবে কার্য্য পরিচালনার জন্য তিনি অধিকার পেলেন, যদিও প্রকৃত-পক্ষে তিনিই রাষ্ট্রের অধ্যক্ষ স্বরূপ ছিলেন। পেডারেস্কি পোলাণ্ডে ফিরে গিয়ে জাতীয় গভর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠা ক'রে একটি দুঃসাধ্য রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে দেশকে রক্ষা করেন। শান্তি বৈঠকে তিনি ও ডেমোস্কি প্রতিনিধি ছিলেন।

পোলাণ্ডের সীমান্ত সমস্যার ব্যাপারে সুপ্রিম কাউন্সিল পোলিশ কার্য্যকলাপ অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটি কমিশন গঠন করে। কমিশনের অনুসন্ধানের ফল এই দাঁড়াল যে, পোলিশদিগের পশ্চিম সীমান্ত পোজনানিয়া এবং পশ্চিম প্রুশিয়া পোলাণ্ড ও জার্ম্মানীর সীমান্ত বলে গণ্য হবে। ডানজিগ্ ও সেই প্রদেশ যাহা Danzig—Eylan—Warsaw রেলওয়ে দ্বারা প্রতিবদ্ধ তাহা পোলাণ্ডের। আপনার সিলিসিয়ান জেলাসমূহ যাহা পোলদের দ্বারা জনাকীর্ণ, তাহা পোলিশদের এবং আলেনষ্টিনের ন্যাশানালিটি প্লেবিসাইটদের দ্বারা স্থিরীকৃত হবে। পোলিশ ডেলিগেটদের মধ্যে ইহাই প্রধান জিজ্ঞাস্য ছিল। লয়েড জর্জ্জ পোলাণ্ডকে ডানজিগ্ দেবার বিপক্ষে ছিলেন; কারণ ডানজিগ্ প্রধানত জার্ম্মান অধিবাসীদ্বারাই জনাকীর্ণ। লয়েড জর্জ্জের এই মত সুপ্রিম কাউন্সিল দ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়, যদিও ক্লিমেনসিউ এবং ইতালিয়ানরা পোলিশ দাবীর আনুকূল্য প্রদর্শন করে। সেই অনুসারে শান্তি চুক্তির ধারাটি এইভাবে গঠিত হ'ল যে, ডানজিগ্ স্বাধীন নগরী হিসাবেই থাকবে কিন্তু মারিয়েনওয়েরডার প্লেবিসাইটদের প্রজারূপে গণ্য হবে। ভার্সাই সন্ধির ৮৭ ধারায় আছে: 'Germany recognises, as the Allied and Associated powers have already recognised, the

complete independence of Poland. ফলে পোলাণ্ড পোজনানিয়া ও পশ্চিম প্রুশিয়ার অধিকাংশ ফিরে পায়, যদিও ডানজিগ্ স্বাধীন নগরী হিসাবে লীগ অফ্ নেশনের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। তবুও পোলাণ্ড তার সমুদ্রপথের প্রবেশানুমতি জানজিগ্ ও বিস্তৃত বাল্টিক সাগর উপকূলের মধ্য দিয়ে পায়। এই প্রকারে পোলাণ্ডের পশ্চিম সীমান্ত চিহ্নিত করা হয়। পূর্ব্ব সীমা রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং ১৯২১ সালের মার্চ্চ মাসের রিগা সন্ধির অগ্র পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় না।

১৯১৯ সালে এপ্রিল মাসে পোলাণ্ডকে উত্তর-পূর্ব্বে বলশেভিক এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে উক্রেনিয়ান্দের সম্মুখীন হ'তে হয়। এতে পিলসুড্স্কি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, বলশেভিকরা জারেদের মতই সাম্রাজ্যপিপাসু—মিত্র রাজ্যের আপত্তি সত্ত্বেও তারা যুদ্ধ ঘোষণা করে। ল্যাটেভিয়া ও রুমানিয়ার সহযোগিতায় পিলসুড্স্কি শত্রুদের উদ্যম ব্যর্থ করতে সমর্থ হন।

ইতিমধ্যে পোলিশরা তাদের পূর্ব্ব গৌরব ফিরে পায়। পোলেরা রুশীয়দের পোলাণ্ডে বলশেভিক গভর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠার মতলব বুঝতে পেরে পূর্ণ উদ্যমে শক্তি সঞ্চয় করতে সুরু করে। পিলসুড্স্কি ক্ষিপ্রগতিতে রুশিয়ার কেন্দ্র খণ্ড বিখণ্ড ক'রে দেন এবং এই প্রকারে ওয়ারশকে রক্ষা করেন। নীমেন ও স্কজারা যুদ্ধে পিলসুড্স্কি পুনরায় রুশিয়ানদের পরাজিত করেন। ১৯২১ সালে মার্চ্চ মাসে এই দুই জাতির ভিতর রিগাতে এক সন্ধি হয় এবং তাতে পোলাণ্ডের পূর্ব্ব সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

১৯২১ সালে আপার সাইলিসিয়ার প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে ওঠে। একজন প্লেবিসাইট প্রকাশ করেন যে, পশ্চিমে ৭,০৭,৬০৫ ভোটার জার্ম্মানী পক্ষে এবং পূর্ব্বে পোলাণ্ডের পক্ষে ৪৭৯, ৩৫৯ ভোটার। রাইখগণ আপার সাইলিসিয়া এই যুক্তিতে দাবী করে বসলেন যে, অর্থনৈতিকভাবে একে বিভক্ত করা অসম্ভব। কাজেই সমগ্র অংশই আমাদের প্রাপ্য। পোলেরা উত্তর দেয় যে, শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণে নিযুক্ত 'ত্রিকোণ-ক্ষেত্র' (বেউথেন, গ্লিউইজ এবং কোটোইস্) সম্বন্ধে তাদের অধিকারই অধিক যুক্তিসঙ্গত। লীগ সভা অবশেষে জাতীয় বসতির উপর নজর রেখে সীমান্তের সীমা নির্দ্দেশিত করে। কেবলমাত্র কেটোইস্ পেল পোলেরা এবং অবশিষ্ট সমস্ত আপার সাইলিসিয়াই জার্ম্মানী পায়।

শান্তি সন্ধির পর জার্ম্মান-পোলিশ সম্বন্ধ ক্রমশই জটিল হয়ে ওঠে। ডানজিগ্, করিডর, সাইলিসিয়া নিয়ে সীমা-নির্দ্দেশ এবং অন্যান্য বিবাদ-বিসম্বাদ ১৯৩৪ সালে এক নতুন মূর্ত্তি ধারণ করে।

১৯৩৪ সালের ৫ই মে রুশিয়ার পোলাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্যকরী থাকবে। ঠিক এক বৎসর পরে একটি বিখ্যাত পোলিশ পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট হের হিটলার বলেন: The racial teaching of Nazism; rejected the de-nationalizing of foreign peoples living on Germany's frontiers? তিনি আরও বলেন: 'I would not repeat the mistakes made in the past centuries and that the reconstitution of the relations between the Germany and Polish people was an instance of my point of view.'

এই জার্ম্মান-পোলিশ চুক্তিকেই হের হিটলার এবৎসর এপ্রিল মাসে বোহেমিয়া, মোরাভিয়া এবং মৃত চেকোশ্লোভাকিয়ার কিয়দংশ গ্রহণের পর প্রকাশ্যে নিন্দা করেন। গত অক্টোবর মাসে চেকোশ্লোভাকিয়া কর্ত্তৃক সুদেতেন অঞ্চল জার্ম্মানীর হস্তে সমর্পণ করা হয়। পোলাণ্ডও তাদের তেস্কেন জেলার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছে দাবী জানায়। ফলে তেস্কেন ফিরে পায়। তেস্কেন জেলায় পোলদিগেরই বসতি এবং গত কুড়ি বৎসর এই নিয়ে তাদের বিবাদ ছিল।

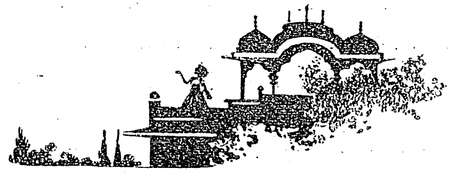

শারদা-হিন্দোল

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আজ থেমে গেছে বর্ষার চঞ্চল নাচনের ঝম ঝম নূপুরের ছন্দ,
ওই নির্ম্মল গগনের অন্তরতল থেকে ঝরে' পড়ে নীল মকরন্দ।
আজ নিম্নেতে কাঁদে প্রেম-বিরহীর পারাবার মিলনের গান বাজে ঊর্দ্ধে,
এই ঊর্দ্ধের সাথে আজ নিম্নের গান গেঁথে বন্ধু গো আয় তোরা সুর দে।
ওই পদ্মার বানজলে গাঙ্ করে থই থই তাল দেয় নেচে মহানন্দা।
নাচে গৈরিক দরিয়ার গঙ্গায় লাল জল ঝর্ণারা হ'ল মধুছন্দা।
ওরে ডুবে গেছে পথ ঘাট ছেলেদের উৎসব রচবে যে আজ তারা স্বর্গ,
ওই গঙ্গার পশ্চিম গৈরিক বুকে আজ নেমে এ'ল জীবনের বর গো।
হোথা পদ্মের বন দোলে বিলভরা কহ্লার সুন্দর শোভা মধু গম্ভীর,
যেন তার সাথে লাজভরা দোলে মধুযৌবন সুন্দরী লক্ষ নিতম্বীর।
ওই রং করা ধানখেতে সবুজ সিংহাসনে দুলে ওঠে কার মধু অঞ্চল,
ওরে দুলে ওঠে কাশবন দোল খায় মাঠবন প্রাণ মন করে দেয় চঞ্চল।
গ্রাম প্রান্তের কোল ঘিরে বন্যার মাটী ধোয়া ঘোলা জলে ডুবাইয়া অঙ্গ,
হৃদি অঞ্চল সরাইয়া চঞ্চল তরুণীরা তুলিয়াছে হাসির তরঙ্গ।
তারা চলে কটি চঞ্চল কুম্ভ ছলাৎছল স্বর্গের মধু বুঝি ঝরবে,
এই মৃত্যুঞ্জয় মধু বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজ বুঝি শিব এসে ধরবে।
ওই গঙ্গায় পাল তুলে নেচে চলে নৌদল ঝরকায় বসে চাহে বৌ গো,
ওরে 'বৌ কথা কও' পাখী এই বেলা ডেকে ওঠ্ সন্ন্যাসী আজ তুমি শোও গো।
মধু সন্ধ্যায় নেমে আসে চাঁদিনীর স্বপ্নরে তারকারা জ্বালে লাল দীপ যে,
ভোর রাত্রির শুকতারা ঘুমভাঙ্গাবার গানে শিরে দেয় জাগাবার টীপ্ যে।
আজ নেচে নেচে ঊষা নামে ঝরে মুক্তির গান সোনা রোদে রবি ঢালে হাস্য,
আমি বিহ্বল মনে আজ খুলে দিয়ে বাতায়ন পড়ি এই রূপায়ন-ভাষ্য।
ওরে এই নীল সিন্ধুর সোপানেতে দাঁড়াইয়া মনে হয় আজি এই প্রৌঢ়ে,
সেই স্বপ্নের মধুভরা সুন্দর যৌবনে ফিরে বুঝি এনু এক দৌড়ে।
এই যৌবন দিয়া মোর গেঁথে রসে মণিহার আজ সখা সাধ যায় রঙ্গে,
ওগো সুন্দরী শারদার চঞ্চল চরণেতে লুটাইয়া পড়ি সারা অঙ্গে।
ওরে ঘরে মোর প্রিয়া হাসে রাঙা হাসি নীল চোখ বাহিরেতে যাদুকরা বিশ্ব,
ওগো কারে ফেলে কারে দেখি হয়ে গেছি ধন্দ গো এরি মাঝে হয়ে গেছি নিঃস্ব।
ওরে কুচি কুচি সাদা মেঘ জলহারা চঞ্চল তোর সাথে হব আজ সঙ্গী,
চল শারদার কাব্যের মেঘদূত গেয়ে গেয়ে চলে যাই এ ধরণী রঙ্গি।
আজ ওঠ্ জাগ্ বিরহিনী দ্বারে ডাকে প্রিয়তম দেবতার আগমন দ্বার খোল্,
সব কুঞ্জের তলে সবে হিন্দোল বেঁধে আজ দে দোল দে দোল দেগো দোল্ দোল্।

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ও বাঙ্গালা কংগ্রেস—

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করায় ওয়ার্কিং কমিটি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে তিন বৎসরের জন্য কংগ্রেসের সমস্ত নির্ব্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। "ইচ্ছা করিলে" তিনি কংগ্রেসের চারি আনা সদস্য থাকিতে পারিবেন। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি হিসাবে বিনা নির্ব্বাচনেই সুভাষচন্দ্র নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য। কিন্তু আচার্য্য কৃপালানীর বিবৃতিতে মনে হয়, শাস্তি ব্যবস্থার ফলে সে অধিকারও তাঁহার লুপ্ত হইয়াছে। যে অধিকার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে অর্জ্জন করিয়াছেন, যাহা ওয়ার্কিং কমিটির খেয়াল খুশীর উপর নির্ভর করে না—কি করিয়া তাহাও লুপ্ত হইতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয়।

এই সম্পর্কে উভয় পক্ষের অনেক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এক পক্ষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—শাস্তি সঙ্গতই হইয়াছে, কংগ্রেসে শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য শাস্তি ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। সুভাষচন্দ্র যত বড়ই নেতা হোন, অপরাধ করিলে তাঁহাকেও শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। অপর পক্ষ এই কথা প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, কংগ্রেসের প্রস্তাব "অমান্য" করিলে তবেই শাস্তির কথা উঠিতে পারে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের প্রস্তাব "অমান্য" করেন নাই, উহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন মাত্র এবং উহার বিরুদ্ধে জনমত যে কত তীব্র সেই সম্বন্ধে কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষকে সচেতন করিয়াছেন। সে অধিকার নিশ্চয়ই প্রত্যেক কংগ্রেস সেবকের আছে। ইহার বিরুদ্ধে অপর পক্ষের বক্তব্য এই যে, সে অধিকার কংগ্রেসের সাধারণ সেবকের থাকিতে পারে, কিন্তু কংগ্রেসের কোনো দায়িত্বশীল কর্ম্মকর্ত্তার নাই। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সাধারণ সেবক নহেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

মহাত্মার বিবৃতি—

আইনের কূট তর্কের সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ বিচারকের সিদ্ধান্তই সেখানে চূড়ান্ত। মহাত্মাজি বলিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের খসড়া তিনিই রচনা করিয়াছেন। সুতরাং শাস্তি বিধান সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব সুস্পষ্ট। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধেও তাঁহার বিরূপতা অপরিচিত নয়। গত রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কার্য্যে ও বাক্যে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শ্লেষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, সুভাষচন্দ্র যে প্রকার জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে কংগ্রেসের বিধান তাঁহার কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। শ্লেষ করিয়া বলিলেও কথাটা আমরা সত্য বলিয়াই মনে করি। ত্যাগে ও আন্তরিকতায়, দুঃখের দহনে ও নিঃস্বার্থপরতায় জনগণের অন্তরে তিনি শ্রদ্ধার আসন পাতিয়াছেন, তিনি কংগ্রেসের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থাকুন বা না থাকুন, কিছুই যায় আসে না। তার দৃষ্টান্ত স্বয়ং মহাত্মাজি। কংগ্রেসের চারি আনা সদস্য না হইলেও আজ তিনিই কংগ্রেসের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহারই বিধানে একটা প্রদেশের কংগ্রেস-সভাপতি তিন বৎসরের জন্য বহিষ্কৃত হইলেন।

আইনের ঔচিত্য-অনৌচিত্য ছাড়িয়া দিয়াও একটা অনুরোধ আমরা তাঁহাকে জানাইতেছি। শৃঙ্খলা রক্ষা তিনি করিতে পারেন, শাস্তি বিধানও যদৃচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু রোগ সারাইতে গিয়া রোগী না মারা পড়ে! শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সরিয়া আসিয়াছেন। খারে, নরীম্যান বিতাড়িত। দেশব্যাপী বিক্ষোভের অন্ত নাই। ধীরে ধীরে কংগ্রেস কোথায় নামিয়া আসিতেছে সে খবর রাখাও কি তিনি প্রয়োজন বোধ করেন না?

সুভাষচন্দ্রের শূন্য পদ—

সুভাষচন্দ্রের প্রতি শাস্তি বিধানের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে সভাপতির পদ শূন্য হইয়াছে। প্রাদেশিক কংগ্রেসের এক সভায় সুভাষচন্দ্রকে "খামখেয়ালী, অবৈধ এবং সম্পূর্ণ অসঙ্গতভাবে অপসারিত করায়" ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। সুভাষচন্দ্রকে সভাপতির পদ হইতে অপসারণ এবং কার্য্য নির্ব্বাহক মণ্ডলীর নির্ব্বাচন অসিদ্ধ করা—ওয়ার্কিং কমিটির এই দুইটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে, যদি জনমত অনুসারে কাজ করা হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় সমিতিকে উভয় সিদ্ধান্তই অমান্য করিয়া চলিতে হয়। রাষ্ট্রীয় সমিতি ততদূর চরম পন্থা অবলম্বন করার পক্ষপাতী নহে। সমিতি আপোষ রফা করিতেই চাহুক। সমিতি আশা করেন, ওয়ার্কিং কমিটি এখনও সিদ্ধান্ত দুইটি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবেন। যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন সভাপতির পদ শূন্যই থাকিবে। প্রস্তাবটি ২১৩—১৩৮ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৫৪১। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের দল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সঙ্গত কাজই করিয়াছেন। কিন্তু সভা শেষে উচ্ছৃঙ্খল জনতা যে ব্যবহার করিয়াছে তাহাও বাঙ্গালার পক্ষে গভীর লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।

যুক্ত প্রদেশে শিক্ষা সংস্কার—

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধীজি যে নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং ডক্টর জাকির হোসেন প্রভৃতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণের সাহায্যে যাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তদনুযায়ী যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট ১৭৫০টি নূতন মডেলের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। পরিচিত বস্তুর সাহায্যে শিশুদের অক্ষর পরিচয়ের এই অভিনব ব্যবস্থা শিশুদের শিক্ষাকে সহজ এবং মনোরম করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই। যুক্তপ্রদেশ সরকার অবিলম্বে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কথাও চিন্তা করিতেছেন। অর্থাভাব তো আছেই, কিন্তু দেশসেবার সত্যকার আগ্রহ যেখানে আছে, সেখানে অর্থাভাব অনতিক্রমণীয় বাধা নয়।

যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে আমাদের কেবল একটি কথা বলিবার আছে। যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট হিন্দুস্থানীকেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র বাহনরূপে স্থির করিয়াছেন। ফলে অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়া যাঁহারা যুক্তপ্রদেশে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের ছেলেদের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। প্রদেশের প্রধান হিসাবে হিন্দুস্থানীর প্রাধান্য আমরা অস্বীকার করিতে চাই না। প্রবাসীদের মাতৃভাষারও একটা স্থান থাকা কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি, যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সুবিচার করিবেন।

নারীহরণ—

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ দক্ষিণ মালদহের বড়বরিয়া এবং সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের হিন্দুদের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা সত্যই ভয়াবহ! তিনি জানাইতেছেন, গত কয়েক বৎসরে এই অঞ্চল হইতে ৬০টি হিন্দুনারী অপহৃতা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ নারীও আছে। সংবাদপত্রে তিনি তাহাদের নাম ধামও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার সহিত কয়েকটি বিশিষ্ট মুসলমান জমিদার পরিবার সংশ্লিষ্ট বলিয়াও তিনি অভিযোগ করিয়াছেন; অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। আমরা বাঙ্গলার মুসলীম মন্ত্রীমণ্ডলের দৃষ্টি দক্ষিণ মালদহের এই শোচনীয় ঘটনাবলীর দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

বাহিরে সৈন্য প্রেরণ—

ভারত হইতে কয়েকটি সৈন্যদল মিশর, এডেন ও মালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, পূর্ব্বাহ্নেই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে জানানো হইয়াছে। এই সংবাদে ভারতের জনসাধারণ কৃতার্থ বোধ করিবে সন্দেহ নাই। সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার ভারতবর্ষ জোগাইলেও তাহার গতিবিধির উপর ভারতের কোন অধিকার নাই এ অভিযোগ অনেকবার করা হইয়াছে। তাহাদের ভারতের বাহিরে পাঠাইতে হইলে আইন সভার অনুমতি লওয়ার আবশ্যক হয় না। আবশ্যক এবারও হয় নাই এবং অনুমতিও লওয়া হয় নাই। মাত্র আইন সভার বিভিন্ন দলের নেতাকে সৈন্য প্রেরণের

পূর্ব্বে কথাটা জানানো হইয়াছে। তাঁহাদের সম্মতিও লওয়া হয় নাই, প্রতিবাদেরও অবকাশ দেওয়া হয় নাই। অনুগ্রহ ও ভদ্রতার নামে এ পরিহাস না করিলেই কি চলিত না?

বন্যার প্রকোপ—

এবারে বাঙ্গালায়, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গে বন্যার যে প্রকোপ দেখা গিয়াছে এমন বহুদিন দেখা যায় নাই। পশ্চিম বঙ্গে গঙ্গা, অজয় ও দামোদরের বন্যা আসে। কিন্তু দামোদর ও অজয়ের বন্যা ছাড়া আর কিছুতে তেমন ক্ষতি বড় একটা করে না। এবারে মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, নদীয়া, হুগলী ও মেদিনীপুরে বন্যার ফলে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আউস ধান একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোথাও আমন ধানেরও আশা নাই। চারিদিকে বন্যার্ত্তদের হাহাকার উঠিয়াছে। কংগ্রেসের সেবকগণ সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া যথাসাধ্য তাহাদের সেবা করিতেছে। এই দুঃসময়ে বাঙ্গালার মন্ত্রীমণ্ডল কি করিতেছেন, জানিতে বড় আগ্রহ হয়।

জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি—

কংগ্রেস কর্ত্তৃক নিযুক্ত জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ৫ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী সমিতির বিভিন্ন সাব-কমিটিতে সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেও সমিতির সহিত সহযোগিতা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার খুঁটায় আবদ্ধ মন্ত্রীমণ্ডলের এই ঔদার্য্য বিস্ময়কর হইলেও আনন্দজনক।

স্কুলের ঘণ্টা—

স্কুলের সময় দুপুরে না করিয়া সকাল ৬টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত করিবার জন্য একটা কথা উঠিয়াছে। প্রস্তাবটা নূতন নয়, প্রথাও নূতন নয়। ইংরেজ আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই নিয়মই প্রচলিত ছিল। তারপরে শীতপ্রধান ইংলণ্ডের অনুকরণে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও বর্ত্তমান ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। মফঃস্বলে অধিকাংশ স্কুলেই পাখা ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা নাই। বৎসরের নয় মাস মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের যে কি কষ্ট হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। আমাদের অভিমত, বিদ্যালয় সকালে করাই উচিত; কিন্তু ৬-১১টা নয়, ৬-১০টা; শীতকালে ৭-১১টা। তাহাতে পড়া এক ঘণ্টা কম হইবে বটে, কিন্তু সে ক্ষতি স্বাস্থ্যের দিক দিয়া পোষাইয়া যাইবে।

পাটের দর নিয়ন্ত্রণ—

অনেক অনুরোধ, উপরোধ, অনুযোগ ও আন্দোলনের পরে বাঙ্গলার মন্ত্রীমণ্ডল পাটের নিম্নতম দর অর্ডিন্যান্স করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন। ৮৸৹ আনার কম দরে কেহ পাট কেনার কণ্ট্রাক্ট করিতে পারিবে না। করিলে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। ফাটকা বাজারের কল্যাণে নিরীহ চাষীর শ্রমজাত পাট লইয়া যে খেলা চলে তাহার দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্স যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু চাষী যে মিলওয়ালা ও দালালদের হাত হইতে অনেকখানি রক্ষা পাইল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের কর্ত্তব্য—

আসন্ন মহাসমরে ভারতের কর্ত্তব্য কি সে সম্বন্ধেও নানা দিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। হায়দরাবাদ, কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া রামপুর পর্য্যন্ত প্রায় সকল দেশীয় রাজাই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ এবং বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেব বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই সঙ্কটক্ষণে হিন্দু-মুসলমানের সকল বিরোধ বিস্মৃত হইয়া মহাসমরে রক্তদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

ইঁহারা দুইজনে লীগের যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম বাহু। কিন্তু লীগ এ সম্বন্ধে এখনও পাকাপাকি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। বরং দিল্লীতে যে লীগ কাউন্সিলের সভা বসিয়াছিল, বৃটেনকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য তাহাতে স্যার সেকেন্দারের বিরুদ্ধে নিন্দার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। বৃটেনকে কোন প্রকার সাহায্য না করিবারও একটা প্রস্তাব উঠিয়াছিল। কিন্তু মিঃ জিন্না সুকৌশলে প্রথম প্রস্তাবটি উঠিতে দেন নাই এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ধামা চাপা দিয়া অপেক্ষাকৃত নরম একটা প্রস্তাব পাশ করাইয়া লন। তাহাতে বৃটেনকে অর্থ ও সৈন্য দিয়া সাহায্য করা হইবে কি-না সে সম্বন্ধে কোন কথাই নাই, কেবল যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে মুসলমানদের জন্য আরও অধিক সংখ্যক সদস্যপদ ভিক্ষা করা হইয়াছিল। ভারতে হিন্দুর জনসংখ্যার শতকরা হার ৭২ ও মুসলমানের ২২। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুর আসনের শতকরা হার ৪২ ও মুসলমানের ৩৩। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, এই অবিচার দূর করিয়া মুসলমানের সদস্য সংখ্যা আরও বাড়ানো হোক।

যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিতেই "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"ও মুখর হইয়া সাম্প্রদায়িক মিলন-গীতি গাহিতে সুরু করিয়াছেন এবং প্রস্তাব করিয়াছেন, এতদিন উভয় সম্প্রদায়ে যে কলহ করিয়াছে, কিন্তু সাম্রাজ্যের এই ঘোর দুর্দ্দিনে এখন উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত হইয়া রণক্ষেত্রে রক্তদান করা উচিত। জিন্না সাহেব এবং দেশাই মহাশয় যদি এখন হাতে হাত মিলাইয়া প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র চালু করিয়া দেন তাহা হইলে তো সোনায় সোহাগা হয়। এমন কি, বর্ত্তমান বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া অস্থায়ীভাবে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রও চালাইতে পারেন। ইতিমধ্যে যথাসম্ভব শীঘ্র প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র অনুযায়ী নির্ব্বাচন ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে।

বলা বাহুল্য এ সম্বন্ধে কোন সরকারী প্রস্তাব উঠে নাই এবং ভারতের দাবী মিটাইবার আগ্রহও কোন তরফ হইতে বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করা হয় নাই।

কংগ্রেসের মনোভাব—

আগামী যুদ্ধে কংগ্রেস বৃটেনকে সাহায্য করিবে কি-না, সে সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে অস্পষ্টতা কোথাও নাই। কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল স্বেচ্ছায় এবং সহজে পদত্যাগ হয় তো করিবেন না। কিন্তু গবর্ণরের সঙ্গে প্রতি পদে সংঘর্ষের ফলে অবশেষে যে তাঁহাদের পদত্যাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে তাহা তাঁহারা জানেন। দায়িত্ববিহীন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত দায়িত্বশীল প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বেশী দিন সমান্তরাল ভাবে চলিতে পারে না। যুদ্ধের সময়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এমন অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, যাহা আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীমণ্ডলের পক্ষে সমর্থন করা অসম্ভব। সুতরাং কংগ্রেসী প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াই রহিলেন।

ওদিকে ভারত সরকারও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই। বিশ্বমানবতা, গণতন্ত্র, মানবের জন্মগত অধিকার এবং পোলিশ স্বাধীনতার জন্য বৃটেন সত্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে কি না জানি না। কিন্তু ভারতের সম্বন্ধে তাহার দৃঢ়মুষ্টি এতটুকু শিথিল হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে না। কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ করিলে কি ভাবে গবর্ণর শাসনভার গ্রহণ করিবেন এবং দমননীতি পরিচালনার কি সুব্যবস্থা হইবে এখন হইতেই তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। উভয় পক্ষের এই মনোভাব দেখিয়া মনে হয়, কংগ্রেসের সহিত আবার একটা সংঘর্ষ অত্যাসন্ন।

বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন—

কলিকাতায় শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনের সভাপতিত্বে যে বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন হইয়া গেল তাহার অপূর্ব্ব সাফল্যে বোঝা যায়, এই সম্বন্ধে বাঙ্গলার জনসাধারণের মনোভাব কত তীব্র। সম্মেলনে শুধু যে হিন্দুরাই যোগদান করিয়াছিলেন তাহা নয়, জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরাও উপস্থিত ছিলেন।

পৃথক নির্ব্বাচন জাতীয়তা বিকাশের পরিপন্থী। তবু সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ এই ব্যবস্থা দিতেই হয়, তাহাতে যেন পক্ষপাত দোষ না থাকে। এ সম্পর্কে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের বক্তৃতায় যে সকল রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে জবরদস্তি পক্ষপাতিত্বের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সম্মেলনে কংগ্রেসের "না-গ্রহণ, না-বর্জ্জন" নীতিরও তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ—

অবশেষে মহাযুদ্ধ বাধিল। একদিকে জার্ম্মানী, অন্যদিকে বৃটেন, ফ্রান্স ও পোলাণ্ড মহাসমারোহে সমরানলে ঝাঁপ দিয়াছে। বার্লিনে সমর মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট লণ্ডন ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট প্যারিস খালি করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন। যাহারা এখনও পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ আছে, তাহাদের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। হলাণ্ড এবং বেলজিয়ামেও সৈন্য সমাবেশ চলিতেছে।

শেষ পর্য্যন্তও একটা আপোষের কথা চলিতেছিল। হের হিটলার এবং মিঃ চেম্বারলেনের মধ্যে স্যার নেভিল হেণ্ডারসন তাঁতের মাকুর মত ছুটাছুটি করিলেন। কিন্তু তাহাতে যে শান্তির সকল সম্ভাবনাই ব্যর্থ হইল! জার্ম্মানী পোলাণ্ডকে বার্লিনে আসিয়া আপোষের কথা পাকা করিবার ২৪ ঘণ্টা মাত্র সময় দিয়া পোলাণ্ড আক্রমণ করিল।

ডানজিগ জার্ম্মানীর চাই, চাই পূর্ব্ব প্রাশিয়া হইতে জার্ম্মানীকে সংযুক্ত করিবার জন্য আরও এক ফালি ভূখণ্ড—করিডর ডানজিগকে পোলাণ্ডের নাসিকা বলিলেও চলে। বাহিরের হাওয়া এই পথেই পোলাণ্ডের হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ডানজিগ পোলাণ্ডেরও নয়, ইহা স্বাধীন নগরী। তাহার শুল্ক বিভাগ শুধু পোলাণ্ডের হাতে। ইহাই পোলাণ্ডের একমাত্র বন্দর এবং পোলীশ বাণিজ্যের কল্যাণেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি।

পক্ষান্তরে ডানজিগের প্রায় বারো আনা অধিবাসী জার্ম্মান। মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত ইহা জার্ম্মানীর হাতেই ছিল। মহাযুদ্ধের পরে পোলাণ্ডকে যখন স্বাধীন রাজ্যরূপে সৃষ্টি করা হয়, তখন পরাজিত জার্ম্মানীর নিকট হইতে লইয়া ইহা স্বাধীন নগরী'তে পরিণত করা হয়। শক্তিমান বর্ত্তমান জার্ম্মানী সেই অবিচার সংশোধন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজা বর্ত্তমান ডিউক অফ উইণ্ডসর হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মাজি পর্য্যন্ত সকলেই শান্তির আবেদন জানাইয়াছিলেন। ফল হয় নাই। জার্ম্মানী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পোলাণ্ডও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বৃটেন পোলাণ্ডকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে যুদ্ধ এবারে বাধিল নৃশংসতায়, ধ্বংসলীলার ব্যাপকতায় ও ভীষণতায় গত মহাযুদ্ধ ইহার তুলনায় ছেলেখেলায় পরিণত হইবে। সেই আশঙ্কায় বিশ্ববাসী আজ ত্রস্ত।

জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি ও তাহার প্রতিকার—

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় প্রায় সকল জিনিষের দামই অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায়, ইহাতে জনসাধারণকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। একদিনের মধ্যে চিনি, লবণ, দেশলাই প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির মূল্য দ্বিগুণ হয়। সুখের বিষয়, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তখনই ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা হওয়ায় দেশবাসী বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় আচরণকারী ব্যবসায়ীদিগকে গ্রেপ্তার করায় সুফল ফলিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্য তৎপরতার সকলেই প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঔষধ ব্যবসায়ীরা এখনও বহু ঔষধ বিক্রয় বন্ধ রাখিয়াছেন—সেগুলি পরে উচ্চমূল্যে বিক্রী করিবার আশায়। কাগজওয়ালারাও কাগজের মূল্য হ্রাস করেন নাই—তাহার ফলে সংবাদপত্রাদির মালিকগণকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। পরে বিদেশী কাগজের আনয়নের খরচ বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু সেজন্য এখন হইতে ব্যবসায়ীদের পক্ষে কাগজ আটকাইয়া রাখা বা অন্যায়রূপ অধিক দরে বিক্রয় করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আমরা আশা করি, গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য জিনিষের মত জনসাধারণের নিত্য-ব্যবহারের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী কাগজেরও দর নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইবেন।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—

খ্যাতনামা প্রবীণ কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। ১২৬৬ সালে হাওড়া জেলার নারিট গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও তৎকালের বহু মাসিকে তাহার কবিতা প্রকাশিত হইত। তিনি ছেলেদের জন্য প্রকাশিত 'সখা' পত্রের সম্পাদক ছিলেন ও টুকটুকে রামায়ণ প্রভৃতি বহু শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১২৯৫ সালের 'প্রচার'-এর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে—

গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জবন,
গাহে না পাখী, ফুটে না কলি, নাহিক অলি গুঞ্জরণ।
দুলাতে মৃদু লতিকা বনে
খেলিতে নর কলিকা সনে
মধুরতর নাহি সে আর সমীর ধীর সঞ্চরণ।
কাননে ঢালি জ্যোছনা রাশি
ভাসে না চাঁদ গোকুলে আসি
নাহি সে হাসি প্রমোদ রাশি,
নাহি সে সুখ সম্মিলন।

ইত্যাদি। তাঁহার রচিত এইরূপ বহু কবিতা এখনও বহু প্রবীণ সাহিত্যিকের মুখে মুখে শুনা যায়। তিনি কখনও খ্যাতি বা অর্থের সন্ধান করেন নাই এবং তাহা পানও নাই। তথাপি আজ তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালী সাহিত্যিকমাত্রই তাঁহার কথা সাশ্রুনয়নে স্মরণ করিতেছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলন—

গত ২রা সেপ্টেম্বর হইতে ৪দিন কলিকাতা সাহিত্য বাসরের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন এবং ৪ দিন যথাক্রমে ৪ জন উদ্বোধন করেন ও ৪ জন সভাপতিত্ব করেন—উদ্বোধক—(ক) ভাইস চ্যান্সেলার খান বাহাদুর আজিজল হক (খ) শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (গ) শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও (ঘ) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। সভাপতি—(ক) শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিক (খ) শ্রীমতী নিরুপমা দেবী (গ) শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু ও (ঘ) রায় বাহাদুর শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রথম দিনে কবিতা, দ্বিতীয় দিনে ছোটগল্প, তৃতীয় দিনে সংবাদ সাহিত্য ও চতুর্থ দিনে সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল। আলোচনা ও লোকসমাগমের দিক দিয়া সম্মিলন সম্পূর্ণভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কলিকাতা শহরে শহরবাসীর নিজস্ব এই ধরণের সম্মিলন এই প্রথম হইল। যাহাতে বৎসর বৎসর এইরূপ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে কলিকাতাবাসী সকল সাহিত্যিক সমবেত হন, সেজন্য আমরা সম্মিলনের উদ্যোক্তাদিগকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

মহাজাতি সদন—

গত ১৯শে আগষ্ট কবি রবীন্দ্রনাথ "মহাজাতি সদন" গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রাজনৈতিক সংগ্রামে যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছে, প্রচণ্ড ঝাপ্টায় যাহাদের পায়ের তলার মাটি সরিয়া গিয়াছে; শুধু যে তাহাদের আশ্রয়ের জন্য এই গৃহ পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা নয়, এই গৃহের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড হল থাকিবে, তাহাতে ২৫০০ লোকের বসিবার স্থান সঙ্কুলান হইবে। তাহা ছাড়া একটি সমৃদ্ধ পুস্তকাগার, ব্যায়ামাগার, পাঠাগারও

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থাকিবে। বাহিরের বিশিষ্ট অতিথিগণও এখানে থাকিতে পারিবেন।

সুভাষচন্দ্র জানাইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত এই কার্য্যের জন্য ৩১ হাজার টাকা তিনি পাইয়াছেন এবং ৫০ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন। আরও ২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। বাঙ্গলা দেশে কোন বড় কার্য্যের জন্য অর্থের অভাব হয় নাই। আশা করি, এক্ষেত্রেও হইবে না। প্রার্থনা করি, সুভাষচন্দ্রের এই মহৎ প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক।

ও যে মোর ফুলের নির্ঝর

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শতাব্দীর মহাসিন্ধু বুকে সভ্যতার দুরন্ত বাতাসে
প্রাণের তরণী
ডুবে যায় আর্ত্তনাদ করি ;

কেঁদে কেঁদে উড়িতেছে পাখী, আলো নাই অনন্ত আকাশে,
আঁধার বরণী
মেঘপুঞ্জে উঠিছে গুমরি' ।

মুষ্টিমেয় যুগযাত্রিদল লভিয়াছে জীবনের আলো,
ভাগ্য-সবিতার
করুণায় দিবস মধুর ।

বাকী পঙ্গু প্রাণীদের চোখে দুঃখ আর নাহি লাগে ভালো,
অশ্রু-কবিতার
বাজে ব্যথা বেদনার সুর !

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব নিয়া যে-জীবন দুর্য্যোগের পানে
করে আত্মদান
সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে,

ধরণীর ইতিবৃত্ত মাঝে স্থান যার নাহি কোন খানে,
তারি ব্যর্থ গান
গেয়ে যাই বেদনার সাথে ।

জানি তার বসন্ত-পূর্ণিমা আসে নাই দক্ষিণ সমীরে,
ফোটেনি কুসুম,
সাধ ছিল ফুটিবার কত !

অনন্তের অন্তরের ধ্বনি ভাসে নাই ভগ্ন চিত্ততীরে
আসে নাই ঘুম,
সুখস্বপ্ন চির অনাগত !

জানি তার অভিশপ্তপথে বিভীষিকা করে আনাগোনা,
মায়ার ছলনে
শিহরিয়া কাঁদে পথচারী,

সকলের মাঝখানে জানি,—আপনারে নাহি জানাশোনা
দুঃখের দলনে
পারাবারে দিতে চায় পাড়ি,

তবু তারে লাগে মোর ভালো, বন্ধু ব'লে করি সম্বোধন
আলিঙ্গন দিয়া
ছায়ামগ্ন বনবীথি তলে ।

সারল্যের শুভ্র মাধুরিমা ছেয়ে আছে তারি তনুমন
তাহারি লাগিয়া
পুষ্প মোর ফোটে অশ্রুজলে ।

দৈন্যদাহে দগ্ধ চিত্ত তার কারুণ্যেরে করেছে সন্ধান,
ধরণীর পথে
ব্যর্থ হ'য়ে করে হাহাকার !

মদমত্ত রত্নগর্ব্বীদল গেয়ে চলে ঐশ্বর্য্যের গান,
পুষ্পরথ হ'তে
তার পানে চাহে না ক আর

ধরণীতে নহে তুচ্ছ কভু—হোক্ না ক চির-নিরক্ষর,
হোক্ না ভিখারী,
তার মাঝে আপনারে পাই ।

তার পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি—সে যে মোর যুগের নির্ঝর
স্বপন-পসারী
পথহারা পথিকেরে চাই ।

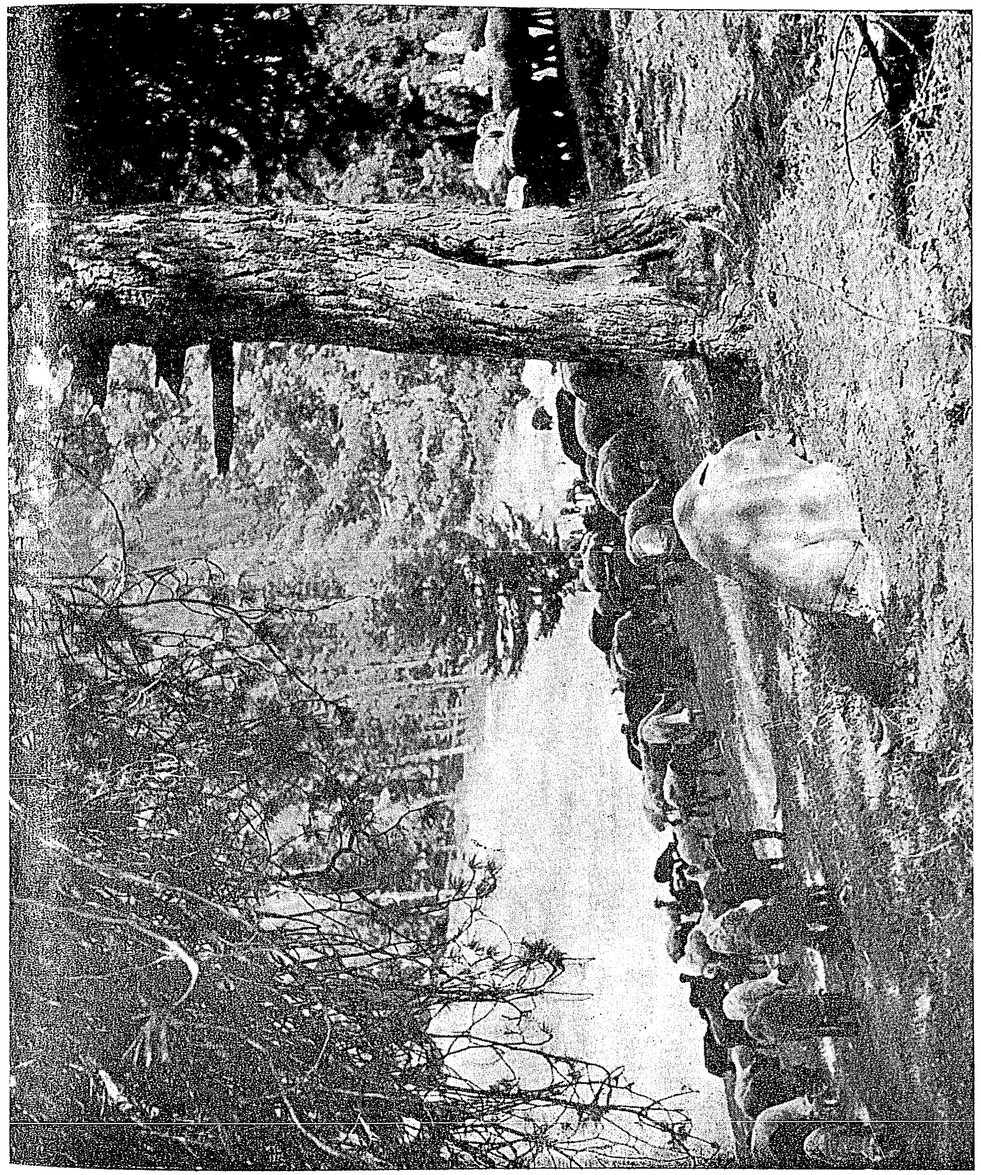

শিল্পী—সুনীলকুমার দাশগুপ্ত, কলিকাতা

কাশ্মীরের মেষপালক

এই পড়লো !

শিল্পী—পান্না সেন, কলিকাতা

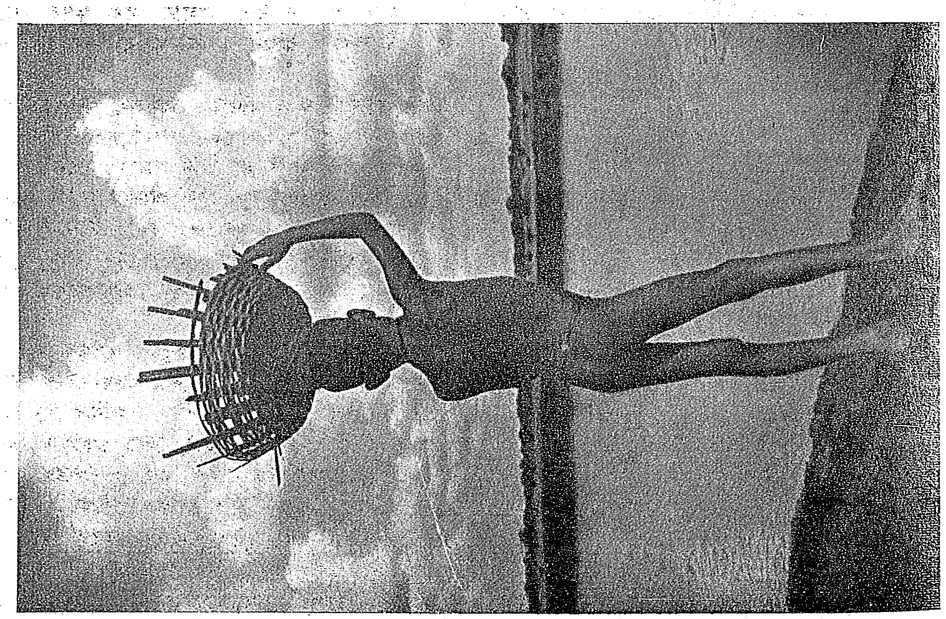

উড়ো মেঘ

শিল্পী—অমিয়লাল চৌধুরী, ময়মনসিংহ

মহাশয়

শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম-এ, বি-এল্

আশ্বিনের সুন্দর সন্ধ্যা। লেক রোডের একটি নাতিবৃহৎ মনোরম অট্টালিকার সংলগ্ন বাগানে দুইটি বর্ষীয়সী মহিলা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন; অদূরে একটি যুবতী উল দিয়া ব্লাউজ বুনিতেছিলেন ও মাঝে মাঝে তাঁহাদের কথোপকথনে যোগদান করিতেছিলেন। বর্ষীয়সীদের মধ্যে একজন মিসেস্ ডি-কে-বোস। ইনিই গৃহ-কর্ত্রী, মিঃ বোসের মৃত্যুর পর একাকিনী এই বাটীতে বাস করিতেছেন। অপরটি তাঁহার বান্ধবী মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি, আর যুবতীটি মিসেস্ বোসের একমাত্র সন্তান মিসেস্ ইভা দত্ত—উদীয়মান ব্যারিস্টার মিঃ এ-আর-দত্তর সহিত পরিণীতা।

দুটি বান্ধবীতে আজ মিলিত হইয়াছেন ইভার জন্ম-তিথি উপলক্ষে। আপাতত উহাদের কথা হইতেছিল মিঃ ডি-কে-বোসের অন্তরঙ্গ বন্ধু মিঃ সুদর্শন রায়ের সম্বন্ধে। তিনিও আজ নিমন্ত্রিত; আগেই আসিয়াছিলেন ও বৈকালিক চা-পানের পর একটু বেড়াইয়া আসিবার জন্য বাহির হইয়া গিয়াছেন।

মিসেস্ বোস মিসেস্ চ্যাটার্জ্জিকে বলিলেন, "কেমন লাগ্‌ল সুদর্শনবাবুকে তোমার?"

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "বেশ লাগল—কিন্তু, দোষ নিও না, কেমন একটু খাপ-ছাড়া ব'লে মনে হয় নাকি ওঁকে?"

"খাপছাড়া মানে যদি অনন্য-সাধারণ বল, তা হ'লে তুমি তা বলতে পার ওঁর সম্বন্ধে। সব বিষয়ে মৌলিকত্ব ওঁর একটা চিরদিনকার বিশেষত্ব। আমার স্বামী ও উনি বরাবর স্কুলে একত্র পড়তেন। স্কুল থেকে পাশ ক'রে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান উনি লাভ করেছিলেন। ছেলে বয়স থেকেই ওঁরা দুটিতে ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে অভেদাত্মা। কতবার কতরকমে ওঁকে দেখেছি; কখনও ওঁর স্বভাবজাত সুন্দর মধুর ব্যবহারের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম আমি দেখিনি। এত ভাল, তাই বোধহয় এ সংসারের উপযুক্ত উনি ততটা নন। মিঃ বোসের মৃত্যুর পর ওঁর দুঃখ যদি দেখ্‌তে! এত দুঃখ বোধ হয় অন্তরঙ্গ সহোদর ভাইয়ের জন্যও কারুর হয় না।" কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সুদর্শনবাবুর কথা মিসেস্ চাটার্জ্জির কাছে বল্‌ছিলাম, ইভা।"

ইভা বলিল, "কাকাবাবুর চেহারা কত খারাপ হ'য়ে গেছে, লক্ষ্য করেছ মা?"

মিসেস্ বোস বলিলেন, "খারাপ কিছু দেখ্‌লাম; কিন্তু চেহারা ওঁর প্রায় ঐ রকমই বরাবর—"

তাহার পর মিসেস্ চ্যাটার্জ্জিকে বলিলেন, "অবস্থা ওঁর খুবই ভাল—তার উপর তিনি বিয়ে করেন নি। কোনো ঝঞ্ঝাটও ওঁর নেই। তা সত্ত্বেও কি উনি এখন করেন, জান? শহরের এক অত্যন্ত দরিদ্র পল্লীতে উনি এখন বাস করেন। কোথায় যেন, ইভা?"

"আহিরীটোলা অঞ্চলে"

"হাঁ, সেখানে এক হীন খোলার ঘর ওঁর আধুনিক বাসস্থান। উদ্দেশ্য, গরীবদের মধ্যে থেকে তাদের জীবনের সব দুঃখ-দৈন্য স্বচক্ষে অনুধাবন ও যথাসাধ্য তার প্রতিকার করা। জীবনের সব সুখ ও ভোগ-বিলাস থেকে আজ উনি বিচ্ছিন্ন এরই জন্য। ভদ্র-সমাজে ওঁকে আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। বোধ হয় শুধু আমাদেরই বাড়ীতে উনি যা দু-একবার আসেন। এই যে অমানুষিক স্বার্থত্যাগের ব্রত তিনি নিয়েছেন মাথা পেতে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য, সে সম্বন্ধে কেউ বোধ হয় কিছুই জান্‌তে পারেনি। উনিও পারতপক্ষে ও বিষয়ের আলোচনা মোটেই করেন না। কি মহানুভব লোক; কথাবার্ত্তা ধরণ-ধারণে কিছু বুঝতে পেরেছিলে তুমি এ সম্বন্ধে?"

"মোটেই না। কিছুই ত উনি বিশেষ বলেন নি। ওঁর কথা থেকে শুধু জান্‌তে পেলাম—সখ্ ক'রে কাঠের খেল্‌না তৈরী করা ও রাজনীতি আলোচনা ওঁর খুব ভাল লাগে।"

একটু হাসিয়া ইভা বলিল, "বরাবরই ও-দুটো 'হবি' কাকাবাবুর কাঁধে চেপে আছে। যখন ছোট ছিলাম—কত রকমের কত খেল্‌নাই না উনি আমায় এনে দিতেন, নিজ হাতে তৈরী ক'রে! তারপর আমার বি-এ, এম্-এ পড়বার সময় কত সহজ ও সুন্দরভাবেই যে উনি ইকনমিক্স ও পলিটিক্সের জটিল বিষয়গুলি আলোচনা ক'রে বুঝিয়ে দিতেন আমায়—যা কোনো প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের কাছ থেকেও কখনো পাইনি আমি!"

মিসেস্ বোস ব'ল্‌লেন, "কিছুই অসম্ভব নয় এই সুদর্শনবাবুর পক্ষে! আমার স্বামীর দেখা-দেখি উনিও এই অঞ্চলেই বাস করতে লাগ্‌লেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কি যে হ'ল, উনি বাড়ীখানা ছেড়ে দিয়ে কোথায় উধাও হ'লেন—কোন মতেই ওঁর খোঁজ এই দু বছরের ভেতর পাইনি। হঠাৎ সেদিন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বারান্দায় সাক্ষাৎ পেলাম। কি যে ওঁর হয়েছিল বলতে পারি না; তবে এটা ঠিক্, এমন একটা কিছু ঘটেছে যার জন্য ওঁর জীবনের ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালিত হচ্ছে। সম্ভবত

গরীবের ক্রন্দন ওঁর কোমল প্রাণের এত করুণ এক তন্ত্রীতে আঘাত করেছে যার জন্য আজ এই অবস্থা।—তাই আজ উনি আত্ম-ত্যাগী কর্ম্মী তাপস।"

এই সময় সদর দরজায় পায়ের শব্দ শোনা গেল ও অব্যবহিত পরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন কয়েকটি নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক, আর তাদের মধ্যে সুদর্শনবাবু। বয়স তাঁহার পঞ্চাশের কাছাকাছি, গৌরবর্ণ, নাতিদীর্ঘ গঠন, সামান্য অবনতাকৃতি, মুখে একভুবনভোলা হাসি—তাহা সত্ত্বেও সমস্ত মুখে দৃঢ়তার এক স্পষ্ট ছাপ। লাজুক স্বভাববশত সবাইকার পিছনে মাথা নীচু করিয়া আসিতে আসিতে বোধ হয় তিনি এক কোণেই নীরবে বসিয়া পড়িতেন, যদি না ইভা উঠিয়া গিয়া তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া বসাইত। চেয়ারটা তাঁহার কাছে আরও একটু সরাইয়া লইয়া গিয়া ইভা বলিল, "পূজোর সময় নিশ্চয় আপনি বাইরে কোথাও যাবেন কাকাবাবু?"

দ্বিধাভরে সুদর্শনবাবু বলিলেন, "হাঁ, যাব বোধ হয় কোথাও—ওঃ না, নাও যেতে পারি, ঠিক মোটেই নেই।"

"কিন্তু কাকাবাবু, শরীরটা আপনার ভেঙ্গে পড়েছে ব'লে স্পষ্টই মনে হয়। যদি না মনে করেন কিছু, তা হ'লে আপনাকে আন্তরিক অনুরোধ করছি—চলুন, আমাদের সাথে এবার পুরীতে। শরীটাও আপনার শুধ্‌রে যাবে, তার উপর খুবই আনন্দ পাব আমরা আপনাকে ক'টা দিনের জন্যে কাছে পেয়ে। যত খুশী রাজনৈতিক আলোচনা করবেন ওঁর সঙ্গে। বলুন, আমাদের এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন না কাকাবাবু!"

"তোমার এই স্নেহের উপরোধ খুবই আনন্দ আমায় দিল মা ইভা, তার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু মা, আমার বোধ হয় যাওয়া ঘট্‌বে না তোমাদের সঙ্গে। বোধ হয় কেন, হবে নাই একরকম; কারণ এমন একটা কাজে আমি ব্যাপৃত আছি, যা ছেড়ে যাওয়া আমার চলবেই না এখন।"—ধীরে ধীরে দ্বিধা-ভরে সুদর্শনবাবু একথাগুলি বলিলেন—যা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল তাঁহার হৃদয়ে কি যেন একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল।

"কিন্তু এই শরীর নিয়ে, পরের দুঃখে মনটা সর্ব্বদা অস্থির ক'রে আহিরীটোলার ঐ নোংরা বস্তিতে বেশি দিন একাদিক্রমে প'ড়ে থাক্‌লে কি দেহটাকে সুস্থভাবে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বেন? মাপ করবেন কাকাবাবু, কিন্তু শরীর রক্ষার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি দেওয়া সবারই কর্ত্তব্য নয় কি?"

"তা ত একশ বার। কিন্তু আমি ত ভালই আছি। কাকাবাবুর উপর অন্ধ স্নেহ ভুল ধারণা এনে দিয়েছে তোমার মনে—আমার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে। তা ছাড়া আহিরীটোলা ত নিতান্ত মন্দ স্থান নয়। যে জায়গাটায় আমি থাকি সেটা বস্তির মধ্যে হ'লেও গঙ্গা যে তার খুবই কাছে। আর দুবেলাই ত খানিকটা সময় গঙ্গার ধারে গিয়ে ব'সে নির্ম্মল হাওয়া আমি পেয়ে থাকি। কিছুমাত্র শঙ্কিত হ'য়ো না আমার জন্য। শরীর যদি বাস্তবিকই খারাপ বোধ করি, তা হ'লে তোমাদের না জানিয়ে—কে আর আছে আমার যাকে জানাব?"

আহারাদির পর সবাই একে একে বিদায় লইলেন—সুদর্শনবাবুও বাহির হইয়া পড়িলেন মিষ্ট মধুর বিদায় অভিবাদন করিয়া। কেহ গেল মোটরে, কেহ ট্রামে বাসে, কিন্তু সুদর্শনবাবু ধীরগতিতে পদব্রজে চলিলেন। তাহার মুখ দেখিয়া মোটেই মনে হইল না, স্বেচ্ছায় তিনি এই নৈশ-ভ্রমণ উপভোগ করিতে করিতে চলিতেছিলেন। উপরোক্ত যতই অগ্রসর হইতেছিলেন ততই যেন তিনি অবসন্নভাবে পা-দুখানি টানিয়া টানিয়া চলিতেছিলেন। অবশেষে রাত্রি প্রায় একটার সময় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এক গলিপথে একটি বস্তিতে ঢুকিয়া তাহার শেষ প্রান্তে একখানি জীর্ণ খোলাঘরের একটি কামরায় তিনি প্রবেশ করিলেন ও জামাটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া পুরাতন একটি তক্তপোষের উপর পাতা মলিন বিছানায় দেহ এলাইয়া দিলেন এবং অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন ঘুম যখন তাঁহার ভাঙ্গিল তখন বেলা প্রায় আটটা। তিনি উৎকণ্ঠাভরে বিছানায় উঠিয়া সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্বরাত্রের পরিহিত পোষাকগুলি সযত্নে পাট করিয়া তুলিয়া রাখিলেন! তাহার পর ক্ষিপ্রহস্তে একটা টিনের কৌটা হইতে খানিকটা চিঁড়া একটা লোহার বাটীতে ঢালিয়া জলে ধুইয়া চিনি দিয়া কোন মতে গলাধঃকরণ করিয়া শ্রমিকের পোষাকে বাহির হইয়া গেলেন। কয়েকটি গলি-ঘুঁজি ঘুরিয়া তিনি একটি দপ্তরীর কারখানায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজন বৃদ্ধ দপ্তরী একটি বাক্সের উপর বসিয়া সট্‌কায় তামাক টানিতেছিল। চারিদিকে তাহার কাগজ আঠা মলাট বই আরও কত কি সব ছড়ান। সুদর্শনবাবু সেখানে প্রবেশ করিয়া হাত তুলিয়া বলিলেন, "সেলাম ওস্তাদজি!" ওস্তাদজি সট্‌কা হইতে ঈষৎ মুখখানি তুলিয়া প্রত্যভিবাদন বুঝাইয়া দিয়া পুনরায় সট্‌কায় মনো-নিবেশ করিলেন। সুদর্শনবাবু নিজেকে বই বাঁধান কার্য্যে ব্যাপৃত করিলেন। ওস্তাদজিও নিজ কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁহাকে কাজ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন। এই ভাবে আগ্রহশীল শিক্ষার্থীর ন্যায় পূর্ণ উদ্যমে একাদিক্রমে আটঘণ্টা কাল পরিশ্রম করা আজকাল সুদর্শনবাবুর দৈনন্দিন কার্য্য।

সদ্বংশজাত, ধনীর একমাত্র সন্তান, হিন্দুস্কুল-প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব মেধাবী ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী প্রভৃত কোম্পানী-কাগজের উপস্বত্ব-ভোগী সুদর্শন রায়ের আজ এই অবস্থা! পাঠ সাঙ্গ করিয়া কিছুদিন তিনি কোন একটা কিছু করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়া

ছিলেন। কিন্তু কোন কিছু করিবার কোনও আবশ্যকতাই তাঁর মোটে ছিল না। তাই তিনি নিরন্ত হইয়া বালিগঞ্জ অঞ্চলে তাহার আবাল্য সহপাঠী অন্তরঙ্গ সুহৃদ মিঃ বোসের বাটীর সন্নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। বিবাহের চেষ্টাও ক-একবার তিনি করিয়াছিলেন কিন্তু প্রতিবারই বীতরাগ হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইয়াছিল নিজ প্রকৃতির সহিত সে সব স্ত্রী প্রকৃতির দারুণ অসামঞ্জস্যতার তাড়নায়। তাহার পর হইতে তাঁহার জীবন চলিল স্বাধীন, সানন্দ, স্বচ্ছন্দ গতিতে।

মিঃ বোস ছিলেন সেয়ার মার্কেটের নাম করা জহুরী। প্রায়ই তিনি সুদর্শনবাবুকে তাহার টাকা উচ্চ-উপস্বত্বভোগী ভাল সেয়ারে না লাগাইয়া কোম্পানীর কাগজের কম সুদে ফেলিয়া রাখিবার জন্য অনুযোগ করিতেন। তিনি বলিতেন—এমন অনেক কাজ আছে সেয়ার বাজারে, যাহাতে টাকা নিয়োজিত করিলে ক্ষতির আশঙ্কা বিন্দুমাত্র নাই। সেগুলি কোম্পানীর কাগজের মতই নিরাপদ, অথচ উহাদ্বারা অন্তত চতুর্গুণ বেশী লাভবান হওয়া যায় কোম্পানী-কাগজের তুলনায়। বন্ধুর একথায় সুদর্শনবাবু বহুদিন কোন আমল দেওয়া আবশ্যকই মনে করেন নাই, কারণ কাগজগুলি হইতে তাঁহার যে আয় তাহা তাঁর প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক অধিক। অবশেষে মিঃ বোসের এই আশ্বাসের কথা তাঁহার মনে ধরিল—তাঁহার খুল্লতাতপুত্রী ভগ্নী সুনন্দাকেও নিয়মিত কিছু অর্থ সাহায্য করিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া। সুনন্দার স্বামী পাটনায় ব্যারিষ্টারী করিতেন। কিন্তু ব্যবসাদ্বারা সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা লাভ তিনি কখনও করিতে পারেন নাই। তাই ছয়টি পুত্র ও স্ত্রীকে ভালভাবে ভরণ পোষণ করিতে গিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। সুনন্দা সে কথা জানাইলে সুদর্শনবাবু সে ঋণ পরিশোধের একটি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন ও তাহাদের ভরণপোষণের জন্য মাসে মাসে কিছু পাঠাইবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মিঃ বসুর উপর সম্পূর্ণ আস্থা তাঁহার বরাবরই ছিল। তাই সুনন্দার সাহায্য বিষয়ে অনুকূল হইবে বলিয়া তিনি তাঁহার কোম্পানীর কাগজগুলি বিক্রয় করিয়া সেই টাকা মিঃ বোসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সেয়ারে নিয়োজিত করিলেন। ফলে কিছুকাল পরে যে সংবাদ তিনি পাইলেন তাহাতে ইহাই দাঁড়াইল যে তিনি সর্ব্বনাশের শেষ সীমায় উপনীত, প্রায় পথের ভিখারীর মত অবস্থায় তিনি পতিত।

তাঁহার এই সেয়ার ঘটিত সর্ব্বনাশের কাহিনী মিঃ বোস ভিন্ন আর কেহই জানিত না! এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ বোস কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া মারা গেলেন। সেয়ারের এই দুর্ঘটনায় মিঃ বোসের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা খুব বেশী নয়, কিন্তু সুদর্শনবাবুকে সত্য সত্যই ইহার জন্য পথে বসিতে হইল। তিনি এ বিষয়ে মিসেস্ বোসকে কিছুমাত্র না বলিয়া এটর্ণীর সাহায্যে ধ্বংসাবশিষ্ট তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া অকিঞ্চিৎকর যাহা পাইলেন তাহা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া কেবলমাত্র ভগ্নীকে এই আকস্মিক বিপৎপাতের কথা জানাইয়া সকলের অগোচরে নীরবে লেক রোডের বাড়ী হইতে সরিয়া পড়িলেন।

দারুণ দুর্দ্দশায় তিনি পড়িলেন। ধ্বংসাবশিষ্ট যে টাকা তিনি ব্যাঙ্কে রাখিয়াছিলেন তাহা ব্যয় করিতে তিনি সাহস করিলেন না। তাহা হইতে যে সুদ পাওয়া যাইতে পারে তাহাও নগণ্য—অত্যন্ত দরিদ্র শ্রমজীবীর জীবন যাপনের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। আত্মীয়বন্ধুদের দয়ার উপর নিজেকে নিক্ষেপ করিবার চিন্তা তাঁহার মনকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। এমন কি, হীনভাবে পরিচিত লোক-সমাজে মুখ দেখাইতেও অন্তরাত্মা তাঁহার বাঁকিয়া বসিল। তাই নিজেকে পরিচিত সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া শারীরিক শ্রম দ্বারা যে কোনও উপায়ে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইয়া লইতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রথমে তিনি চিৎপুরের এক মুসলমান পল্লীতে একটি ক্ষুদ্র ঘর লইয়া কাঠের খেলনা তৈয়ারী করিয়া একটি লোকের সাহায্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে মাসে তাহার চারি-পাঁচ টাকার বেশী আয় দাঁড়াইল না। তাই উহা ত্যাগ করিয়া তিনি আহিরীটোলার এক দরিদ্র বস্তিতে উঠিয়া গিয়া এক বৃদ্ধ দপ্তরীর নিকট কার্য্য শিক্ষা সুরু করিলেন। ওস্তাদ দয়া করিয়া যাহা তাঁহাকে দিত ও ব্যাঙ্কের সামান্য কয়টি সুদের টাকা দ্বারা কোনও রকমে তিনি নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিলেন। পূর্ব্বেকার অবস্থার সিগারেটের খরচ দ্বারা তাঁহাকে এখন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। তাই শরীর ও মনের এত অবনতি সহ্য করিতে যে দ্বন্দ্ব তাঁহার মনে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিত তাহার সহিত নিজেকে আংশিক খাপ খাওয়াইয়া লইতেও তাঁহার অনেক দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর ক্রমে এই নূতন অবস্থার আবর্ত্তে পড়িয়া বহু নূতন জ্ঞান তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আয়ত্ত করিতে হইল। এ বিষয়ে কোনও চিন্তাও কখনো যে তাঁহাকে করিতে হইবে তাহা তিনি পূর্ব্বে কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। এইরূপ অবস্থায় কি করিলে কত কম মূল্যে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবে জীবন যাপন করা যায় তাহাই হয় মানুষের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা। সুদর্শনবাবুকেও তাই এ বিষয়ে নজর দিতে হইল বাধ্য হইয়া। জিনিষের দর, কোথায় কি সস্তা, কোন্ খাদ্য মূল্যানুপাতে বেশি পুষ্টিকর ইত্যাদি বহু বিষয় তাঁহাকে চিন্তা ও অনুধাবন করিয়া শিখিতে হইল।

এই অবস্থার মধ্যে একদিন তিনি সুদের টাকা উঠাইয়া লইবার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে গেলে সেখানে হঠাৎ তাঁহার দেখা হইল মিসেস্ বোসের সঙ্গে। আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার দিকে ছুটিয়া গিয়া তিনি বলিলেন, "এই যে সুদর্শনবাবু!

কি হয়েছিল আপনার এত দিন? কোথায় উধাও হ'য়ে গিয়েছিলেন আপনি? বিদেশে গিয়েছিলেন কি?"

হঠাৎ তাঁহার সহিত এই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হওয়ায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া প্রায় যন্ত্র-চালিতের মত তাঁহারই কথার যেন প্রতিধ্বনি করিয়া সুদর্শনবাবু বলিলেন, "হাঁ, বিদেশেই গিয়েছিলাম···"

তাঁহাকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়া মিসেস্ বোস অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "বিদেশে গেলে কি আমাদের একখানা চিঠি লিখেও একটু খোঁজ করতে বা দিতে নেই, সুদর্শনবাবু? কি মমতাহীন আপনি! কেন যে আপ্‌নি আমাদের ঘুণাক্ষরে এতটুকু আভাষ মাত্র না দিয়ে ওভাবে নিরুদ্দেশ হলেন তা আজ পর্য্যন্ত আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারি নি। ইভা ত প্রায়ই বলে—হয় ত আমরা কোন ব্যবহারে আপনার প্রাণে গভীর দুঃখ দিয়েছি। বলুন, কি করেছি আমরা আপনার—"

লজ্জিত হইয়া সুদর্শনবাবু বলিলেন, "কি যে ওসব বল্‌ছেন আপ্‌নি! দোষ আমারই সম্পূর্ণ। কেন যে আমি ওভাবে উধাও হ'য়ে গিয়েছিলাম ও আপনাদের কোন কিছু জানাই নি তার জবাব দেওয়া সহজ নয়—অনেক কিছু বল্‌তে হবে। শুধু জেনে রাখুন, ওটা আমার একটা খেয়াল বা পাগ্‌লামো বই আর কিছু নয়—তাতে বিন্দুমাত্র দায়িত্ব আপনাদের নেই।"

মিসেস্ বোস বলিলেন—"যাক, যা করেছেন বেশ, তার কারণ না হয় পরে জানা যাবে। বলুন ত এখন, কবে যাচ্ছেন আপ্‌নি আমাদের ওখানে? ইভা ত আপনার জন্য অস্থির! জামাতা বাবাজিকে দিয়ে সে কত যে খোঁজ করিয়েছে আপনার! যাক আসা চাই কিন্তু আপ্‌নার আমাদের ওখানে। কাল আশা করতে পারি কি আপ্‌নাকে?"

"আচ্ছা, কালই যাব।"

"ঠিক ত? কাল বিকেলে আপনার জন্য পথ চেয়ে থাক্‌ব কিন্তু। ইভা আর অজয়কে খবর দিয়ে আনিয়ে রাখ্‌ব, বুঝলেন?"

সারা পথ সেদিন ও তার পরদিন তাঁহার কাটিয়া গেল; কি জবাব তিনি দিবেন মিসেস্ বোসকে তাদের সঙ্গে ঐরূপ আকস্মিকভাবে সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া এত দিন অজ্ঞাতবাস করার। তাঁহার বর্ত্তমান শোচনীয় দারিদ্র্যের এবং কর্ম্ম ও বাসস্থানের কথা ও তাহার কারণ তাহাদিগকে বলিবেন কি? বলিলে, তাহাদের দয়ার নিষ্পেষণে মনের অবস্থা তাঁহার যেরূপ দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া সমস্ত অন্তরটা তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তদুপরি তাঁহার এই অশেষ দুর্দ্দশার করুণ কাহিনী উহাদের প্রাণে যে দুঃখের কারণ হইবে তাহা তাহাদিগকে না দেওয়াই বোধ হয় ভদ্রোচিত। কিন্তু অপরপক্ষে, তাঁহাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইবে। তাহাও কি ঠিক? কিন্তু অপ্রিয় সত্যটা কি না বলাই শ্রেয়তর নয় এ ক্ষেত্রে? আবার ইহাও ঠিক যে, তাঁহার দুর্দ্দশার কাহিনীর সত্য বিবৃতি তাঁহার মৃত সুহৃদ মিঃ বোসের নিন্দাবাদের নামান্তর হইয়া দাঁড়াইবে—ইহা ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত ইহার বিরুদ্ধে দৃঢ় ভাবে সাড়া দিল।

ফলে যখন তিনি পরদিন মিসেস্ বোসের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন তখনও মন তাঁহার এ বিষয়ে দোদুল্যমান। ড্রইং-রুমে গিয়া তিনি দেখিলেন মিসেস্ বোস, ইভা ও অজয় তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তাঁহাদের আন্তরিক অভ্যর্থনায় মন তাঁহার ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাই তাহাদের বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে ইতস্তত করিয়া তিনি তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা প্রায় একটা নভেলের ঘটনার মত হইয়া দাঁড়াইল। সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হইলেও অনেকটা ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিয়া তিনি যখন উহার তাৎপর্য্যটা উপলব্ধি করিতে পারিলেন তখন এই নিছক্ মিথ্যা সৃষ্টির জঘন্যতা তাঁহার মনকে গভীর ভাবে পীড়িত করিয়া তুলিল।

উহাদের প্রশ্নোত্তরে যাহা তিনি বলিয়াছিলেন মোটামুটি তাহা এই দাঁড়াইয়াছিল যে, তিনি এখন আহিরীটোলা অঞ্চলে এক গরীব বস্তিতে ছোট একখানি ঘর লইয়া বাস করিতেছেন। উদ্দেশ্য, গরীবদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়া গিয়া তাহাদের দুঃখ দৈন্য, অভাব অভিযোগ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা অর্থাৎ লোক-সেবাই তাঁহার এই অজ্ঞাতবাসের উদ্দেশ্য; এক কথায়, যাহা তিনি মিসেস্ বসুকে পূর্ব্বদিন বলিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার একটা খেয়াল বই আর কিছু নয়।

তাহার পর সকলের আলোচনার বিষয় হইল সুদর্শনবাবুর মহত্ত্ব ও তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্য। তাঁহাদের এই প্রশংসাবাদ নিদারুণ কশাঘাতের মতই তাঁহার মনটিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। দারুণ অনুশোচনায় মন তাঁহার ভরিয়া উঠিল। অপ্রস্তুত হইয়া তিনি প্রায় বাক্‌রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সুদর্শন-বাবুর এই অস্বস্তিভাব তাহারা তাঁহার মহত্ত্বের অন্যতর নিদর্শন বলিয়া ধারণা করিয়া লইলেন। তাই ও বিষয় ত্যাগ করিয়া তাহারা অন্য বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। সুদর্শন-বাবুর এই কাহিনী অবিশ্বাস করিতে বা তাঁহার বর্ত্তমান কঠোর দারিদ্র্যের কথা কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। কারণ সবাই জানিত তাঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল। পূর্ব্বদিনও তাঁহাকে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে দেখা গিয়াছিল। তাহারও তাৎপর্য্য এই যে তিনি ধনী। তদুপরি সকলেই তাহাকে খেয়ালী বলিয়া জানিত। তাই তাঁহার এই কাহিনীর সত্যতা সবাই নিঃসন্দেহে মানিয়া লইয়া তাহার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইলেন। কেবল সুদর্শনবাবুর মন এই

মিথ্যা সৃষ্টির জন্য নিদারুণ ধিক্কার ও অনুশোচনায় বিদ্ধ হইতে লাগিল।

বৎসরাধিক কাল এইভাবে কাটিল। ইতিমধ্যে সুদর্শনবাবু পনের-কুড়িবার মিসেস্ বোসের বাড়ীতে উঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট, দুঃখপূর্ণ জীবনের একঘেয়ে দংশন হইতে অন্তত কিছুকালের জন্য এই বিরামটুকু তাঁহার ভাল লাগিত। শুধু তাঁহার বর্ত্তমান জীবন সম্বন্ধে আলোচনা উঠিলেই বিবেকের তাড়না তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত—তাহার প্রকৃত অবস্থার কথা মিসেস্ বোসের কাছে বলিলে হয় ত জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে আর এই অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। সুদ ও দপ্তরীর কার্য্য করিয়া তাঁহার যে আয়, তাহা দিয়া কোন মতে মাসের কুড়ি-পঁচিশ দিন তাঁহার চলিত; বাকী কয়দিন প্রায় অর্দ্ধাশনে কাটাইতে তিনি বাধ্য হইতেন।

এ অবস্থায় মিসেস্ বোসের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া একদিন অপরাহ্নে তিনি তাঁহার অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় পিওন তাঁহাকে একখানি চিঠি দিয়া গেল। চিঠি তাঁর নামে আসে না বড় একটা, তাই কম্পিত হস্তে খুলিয়া দেখিলেন, ইভা লিখিয়াছে ও তাহাতে সংলগ্ন পাঁচশত টাকার একখানি চেক।

ইভা লিখিয়াছে:—

"পূজনীয় কাকাবাবু,

আপনার অসাধারণ আত্মত্যাগ ও মহৎ ব্রত সম্বন্ধে সব সময়ই ভাবি ও গর্ব্বে আমাদের বুক ভ'রে ওঠে, আমরা আপনারই একজন ভেবে। যাদের কল্যাণের জন্য আপনি নিজের সব ঐহিক সুখ অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়েছেন তাদের অবস্থার কথা ভাব্‌লে খুবই দুঃখ হয়। কত অর্থ কত দিকে আমরা বৃথা অপচয় করি প্রতি দিন—যা পেলে বোধ হয় ওদের অনেকের জীবন রক্ষা পায় দুটি খেতে পেয়ে। তাই ছুটিতে পুরী যাবার আগে তাদের উদ্দেশ্যে এই সামান্য টাকাটা আপনার হাতে সঁপে দিলাম। আশা করি তাদের জন্য গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ কর্‌বেন।

কালই আমরা পুরী রওনা হচ্ছি। আপনিও আসুন না কাকাবাবু ক'দিনের সময় ক'রে। খুব সুখী হব আমরা দু'জনে ক'টি দিনের তরে আপনার সেবা করবার সুযোগ পেলে। ইতি

প্রণতা

ইভা

চেকখানি অনশনক্লিষ্ট হতভাগ্যের সম্মুখে প্রচুর খাদ্য দ্রব্যের মত সুদর্শনবাবুর নিকট মনে হইল। দারুণ অর্থাভাব-জনিত তাঁহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যাগুলি একে একে তাঁহার মনে জাগরূক হইয়া এক নিদারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাঁহার শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। শীঘ্র কোনো ব্যবস্থা না করিলে শরীরটা তিনি আর বেশী দিন খাড়া রাখিতে পারিবেন না তাহা তিনি বেশ অনুভব করিতেছিলেন। পুরাতন পোষাক পরিচ্ছদের সাহায্যে তিনি মিসেস্ বোসের বাড়ীতে এখনও যাতায়াত করিতে পারিতেছেন—তাঁহাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না হইতে দিয়া, সেগুলিও জীর্ণতার শেষ দশায় পৌঁছিয়াছে। দপ্তরীর কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হইলে সেই সংক্রান্ত কিছু টাকার যন্ত্রপাতি তাহাকে খরিদ করিতে হইবে। আরো অনেক কিছু দরকারী বিষয় ছাড়িয়া দিলেও ভদ্রোচিত পোষাক ও কিছু যন্ত্রপাতি তাঁহার না হইলেও নয়। বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ খরচ চালাইবার মত অর্থ সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে অনাহারে মরিতে হইবে ইহা নিশ্চিত। এই সব চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু এসবের পূর্ব্বে ইভার চিঠিখানার জবাব দেওয়া সর্ব্বপ্রথম দরকার বিবেচনা করিয়া সুদর্শনবাবু নগ্ন কেরোসিনের আলোটি জ্বালিয়া লিখিতে বসিলেন। কিন্তু কত বার কালী উঠাইলেন লিখিবার জন্য—কতবার সে কালী শুকাইয়া গেল, লেখা অগ্রসর হইল না। অবশেষে তিনি লিখিলেন—

"ইভা, মা আমার,

—আবার বসিয়া রহিলেন কি লিখিবেন, খুঁজিয়া না পাইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার ঘুম পাইল। এক ঝাঁকুনি দিয়া সোজা হইয়া বসিয়া তিনি লিখিতে লাগিলেন—

"আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার অশেষ দয়ার নিদর্শন চেকখানি আমি গ্রহণ করিলাম। অন্তরের সহিত ইহার জন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাইতেছি। টাকাটা···[আরও খানিকক্ষণ চিন্তার পর তিনি শেষ করিলেন] তোমার নির্দ্দেশমত ব্যয় করিব ও পরে কি ভাবে ব্যয়িত হইল বিস্তারিত তোমাকে জানাইব।"

লিখিতে এত বাধা জীবনে তিনি আর কখনও পান নাই। যাহা লিখিলেন তাহাও তাঁহার পছন্দ হইল না। কিন্তু আর কিছু লিখিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। এ পর্ব্বের শেষ করিয়া চিন্তার হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য তখনই তিনি সেটা ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন। চিঠিখানা লিখিতে যেন তাঁহার শরীরের সমস্ত শক্তি তিরোহিত হইয়াছে। তাই তিনি শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিদ্রা তাঁহার আসিল না। সারা রাত্রি তাঁহার বিনিদ্র কাটিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—এই দান গ্রহণের উপযোগী দরিদ্র কোথায় তিনি পাইবেন? তাঁহার বাড়ীর চারিপাশের সবাই গরীব, কিন্তু উহাদের ও তাঁহার দারিদ্র্য কি একই প্রকারের? তাহাদের প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ যাহাদের ঘটিয়াছে তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই এই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, তাহাদের

দারিদ্র্য সম্বন্ধে অধিকাংশ কথাই অতিশয়োক্তি। অর্থ তাহারা উপার্জ্জন করে, কিন্তু দারিদ্র্য তাহারা নিজেরাই ডাকিয়া আনে—নানা দুর্নীতিবশত সেই অর্থের অপব্যবহার করিয়া। এইভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে তাঁহার মত দরিদ্র লোক বোধ হয় বেশী খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য। চিন্তাধারা তাহার অন্য পথে ধাবিত হইল। ধনীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন-পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া কে তাহাকে এই চরম দুর্দ্দশার আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়াছে? ইভার পিতাই নয় কি? এই ধারায় চিন্তা করিলে তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় জীবন-রক্ষার অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়-বহনে এই অর্থ নিয়োজিত করিলে অন্যায় হইবে কি? হঠাৎ তাঁহার মনে অন্য এক চিন্তা উদিত হইল—হয়ত বা ইভা প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইচ্ছা করিয়াই এই অর্থ তাঁহারই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছে!···

ভোরে উঠিয়া নিজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও তৎসম্পর্কে মিঃ বোসের দায়িত্বের ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধ-মূল হইল। এক লম্ফে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি চেকখানি বাহির করিয়া আনিলেন ও প্রায় ঘণ্টাখানেক উহা লইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার খেয়াল হইল কাজের সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। তাই তিনি ছুটিলেন দপ্তরী-খানায়। দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া চেক ও তাহার হাতের টাকা ক'টি পকেটে করিয়া তিনি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন ও প্রায় যন্ত্রচালিতবৎ একটি জুতার দোকানে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং বড় কিছু না দেখিয়াই একজোড়া জুতা তিনি ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। চেক্ ত ভাঙ্গান হয় নাই। জুতা জোড়াটার দাম দিতে তাহার বহু মূল্য অর্থের প্রায় সবই শেষ হইয়া গেল। পুরাতন জুতা জোড়াটি বগলদাবা করিয়া নূতন জোড়াটা পরিয়া মচ্-মচ্ করিয়া তিনি চলিলেন। বাড়ী পৌঁছিয়া তিনি প্রথম অনুভব করিলেন যে জুতা জোড়াটি বিশ্রী মচ্-মচ্ শব্দ করিতেছে ও পা দুখানি তাঁহার আহত। কি বিশ্রী ব্যাপার!···কিন্তু সব নূতন জুতাই ত ঐরূপ শব্দ করে ও প্রথম প্রথম পায়ের ব্যথার কারণ হয়! বহুদিন নূতন জুতা ক্রয় করেন নাই—তাই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন।···শ্রান্তিতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর এলাইয়া পড়িতেছিল। ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়নাও তাহাকে উৎপীড়িত করিতেছিল। তাই তিনি যৎসামান্য কিছু গলাধঃকরণ করিয়া এক ঘটি জল খাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

সারা রাত্রি তাঁহার কাটিল এক বেখাপ্পা স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে! তিনি যেন নূতন জুতাজোড়াটি পায়ে দিয়া খঞ্জের মত খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিয়াছেন—হাতে তাঁহার সেই চেকখানি। সকলেই তাহাকে চাপা হাসিতে বিদ্রূপ করিতেছে। এমন অবস্থায় তাঁহার দেখা হইল ইভার সঙ্গে। ইভা তাহাকে দেখিয়া অভিবাদন না করিয়া ঘৃণাভরে তাকাইয়া রহিল—কিছুই বলিল না। তিনি চলিলেন চেক ভাঙ্গাইতে—মচ-মচ শব্দ করিতে করিতে, খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া। সে শব্দও যেন বাক্‌রূপী হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি দেখিলেন দৈহিক শ্রান্তি তাঁহার মোটেই কমে নাই, কিন্তু চিন্তাশক্তি তাঁহার ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কেন মূর্খের মত তিনি তাঁহার এত প্রয়োজনীয়—শরীরের রক্ত সদৃশ এত অর্থ ঐ উদ্ভট জুতাজোড়াটি ক্রয়ে ব্যয় করিয়াছেন। বর্ষাটা তাঁহার বেশ চলিয়া যাইত পুরাতন জুতাজোড়াটি দ্বারা। কি মনে করিয়া তিনি ঐ জুতার দোকানে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন? তবে কি তিনি সত্য-সত্যই চাহিয়াছিলেন ইভার টাকাটা নিজে আত্মসাৎ করিতে? হা ভগবান, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ তাঁহার শরীর, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সব চুরমার করিয়াও কি ক্ষান্ত হয় নাই—ধাওয়া করিয়াছে তাঁহার সাধারণ নৈতিক বুদ্ধির মূলেও কুঠারাঘাত করিতে? ইহার পূর্ব্বে যে তাহার মৃত্যুই ছিল শ্রেয়!

সহসা তিনি উঠিয়া পড়িলেন। মুখে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ। ক্ষিপ্রহস্তে একখানি চাদর টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়া ওস্তাদজির নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া দুই দিনের ছুটি লইলেন।

দ্বিতীয় দিন তিনি ইভার নিকট চিঠি লিখিতে বসিলেন। এবার আর কোন বাধা তাঁহার সম্মুখে রহিল না। স্বাভাবিক সরল রচনা ভঙ্গিতে তিনি ইভার নিকট লিখিয়া গেলেন—

"তোমার প্রেরিত টাকা সদ্ব্যয়ে অর্পণ করিয়াছি। হিন্দু-মিশনের কর্ম্মসচিব কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ স্বামীজির হাতে তোমার চেকখানি দিয়াছি, তিনি যে কার্য্যে উহা অর্পণ করিয়াছেন তাহা এতৎসংযুক্ত কাগজে লিখিয়া দিয়াছেন ও এই দানের জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। তোমার অর্থের যথার্থ সদ্ব্যয় হইয়াছে জানিয়া আশা করি তুমি সুখী হইবে।

"স্বভাবতই তুমি জিজ্ঞাসা করিবে কেন আমি যে দুঃস্থদের সহিত সম্পর্কিত ও যাহাদের কল্যাণ আমার জীবনের ব্রত তাহাদের জন্য তোমার ও টাকাটা ব্যয় না করিয়া স্বামীজির শরণাপন্ন হইয়াছি। তাহার সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট জবাব এই যে, আমি এতদিন তোমাদের কাছে মিথ্যা বলিয়া আসিয়াছি।

"বর্ত্তমান স্থানে বাস আমি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লই নাই। লোক-সেবার উদ্দেশ্যে অনুচালিত হইয়া আমি কোন মহৎকার্য্যে ব্রতী নই। কোনওরূপ ত্যাগ স্বীকার আমি উহার জন্য করি নাই। আমি এখন দারুণ দুর্দ্দশাপন্ন নিরতিশয় দরিদ্র সামান্য একটি ভদ্রলোক মাত্র।···একদিন হঠাৎ আমি দেখিলাম রাস্তার ভিখারীর চেয়েও অধিক শোচনীয় অবস্থায় আমি উপনীত। অধিক লাভের আশায় মূর্খের মত আমার সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে

কতকগুলি সেয়ার ক্রয় করার সমুচিত দণ্ড বলিয়া উহা আমি গ্রহণ করিলাম ও লজ্জায় বন্ধু-বান্ধবদের কিছু না বলিয়া আমি উধাও হইলাম। দুর্দ্দশার উপর মিথ্যার কলঙ্ক-কালিমা আমার চরিত্রকে মলিন করিল। আরও যে কি পঙ্কে নিপতিত হইব জানি না।

"দপ্তরীর কাজ আমি শিখিয়াছি। আমার অভাব কমাইয়া ফেলিয়াছি। ঐ কাজের সাহায্যে কোনমতে আমি জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিব। যদি পার, তোমরা আমায় ক্ষমা করিও। আর আমার বিশেষ অনুরোধ, তোমার এই হতভাগ্য কাকাকে ভুলিয়া যাইও। ইতি—"

একটী গ্রাম

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বপটী তাহার ত্রিশটী বরষ
তিয়াসা মিটেনি দেখে
শান্ত সজল শ্যামল সুষমা
চক্ষে রয়েছে লেগে।
আমার মুক্ত নিবিড় আঁধার—
এলো কালো কেশ যেন শ্যামা মা'র,
আসিত লক্ষ্মী সম পূর্ণিমা
পারিজাত রেণু মেখে।

অশথের নব পত্রোদ্গম
মনে পড়ে ফাল্গুনে,
গৃহ-কপোতের মঞ্জু কূজন
শ্রান্তি হ'ত না শুনে।
ঝিঁঝিরও শব্দ লাগিত মধুর
ইঙ্গিতে যেন ডাকিত সুদূর,
জোনাকি ফিরিত অথই আঁধারে
আলোকের জাল বুনে।

মুগ্ধ করিত বরষার শোভা,
জলের কলধ্বনি,
রুদ্ধ দুয়ারে ডাকিত আসিয়া
সমীরণ সন্‌সনি।
নিম্নে ছুটিত ছলছল জল,
ঊর্দ্ধে ঘুরিত জলদ চপল,
মেঘলা দিবস হ'লে এনে দিত
হারানো মুক্তা মণি।

ভালবাসিতাম উদার আকাশ,
উদাস মাঠের হাওয়া,
বনবিহগের সাথে তাল রেখে
রাখালের গান গাওয়া।
ভালবাসিতাম চেনা তরুতল,
দীঘির সলিল, কমলের দল,
শুধু অকারণ আনন্দে সেই
অজানার পথ চাওয়া।

সে কি লাবণ্যে ভরিয়া ভুবন
আষাঢ়ে উঠিত মেঘ,
আমার হিয়ার অমৃতে তার
নিতি হ'ত অভিষেক।
পথের দুধারে তরুলতা গায়ে,
স্নেহ যে আমার দিতাম বিছায়ে,
অনিলে ভ্রমর টেনে রেখে যেত
ফুল পরাগের রেখ্।

ক্ষুদ্র বৃহৎ কাজের মাঝারে
আমি যাপিতাম দিন,
কর্ণে আমার দুঃখ পাসরা
কে যেন বাজাতো বীণ্।
মধুর করিত বেদনা আমার,
উৎসবময় নিতি চারিধার,
কার স্নেহ হাসি করিত আমারে
সদা সন্দেহহীন!

কার বরাভয় ব'লে দিত কানে—
আমি মৃত্যুঞ্জয়,
প্রেমামৃতের অধিকারী আমি
নাই নাই মোর ভয়।
অতি সাধারণ, অতি যা সুলভ
কার পরশনে হ'ত দুর্লভ,
শান্তির জল হ'ত আঁখিজল
পরাজয়ে হ'ত জয়।

আমিই সৌধ, আমি প্রাঙ্গণ,
আমি তার শশী রবি,
আমি আলোছায়া, গীতি ও গন্ধ,
মাঠ দিগন্তশোভী।
আমি তার বায়ু, আমি তার জল,
আমিই কুমুদ, আমিই কমল,
আমি তার রূপ, আমি তার প্রাণ—
আমি তার দীন কবি।

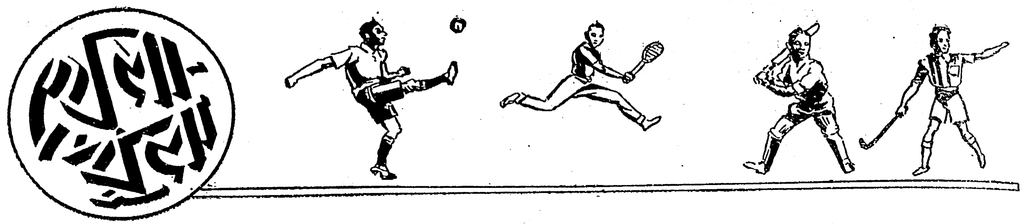

খেলা-ধূলা

ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড—৩৫২ ও ৩৬৬ (৩ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—৪৯৮

সময়াভাবে খেলা ড্র হওয়ায় ইংলণ্ডই রবার পেল।

প্রথম টেষ্টে ইংলণ্ড জয়ী হ'য়েচে ; দ্বিতীয় টেষ্ট হ'য়েচে ড্র।

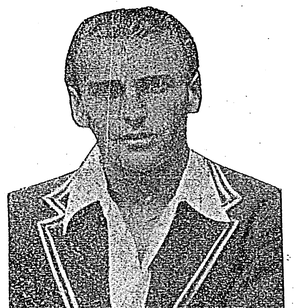

হার্ডষ্টাফ

ইংলণ্ড টসে জিতে ব্যাট ক'রতে নাবলো। উভয় পক্ষেরই উত্তেজনা প্রবল। দর্শক সমাগম হ'য়েচে ছ' হাজার। আকাশের অবস্থা খুব ভাল, উইকেট ব্যাটসমানদের অনুকূলে ; আরম্ভ ভাল হয় নি ; কীটনকে এসেই ফিরে যেতে হ'ল। হাটন ও ওল্ডফিল্ড খেলার গতি ঘোরালে। ৭৩ রানের সময় জনসন হাটনকে নিজের বলে লুফে নিলে। তার খেলায় ৮টা 'চার' ছিলো ; আউট করবার সুযোগ একবারও দেয় নি। লাঞ্চের পর দর্শক সংখ্যা তের হাজারে উঠেছে। ওল্ডফিল্ড ৮০ রান ক'রে কন্সটাণ্টাইনের হাতে বোল্ড হ'য়ে গেলো। তার খেলাতে চার ছিলো ৮টা। হ্যামণ্ডকে লুফলো গ্রাণ্ট ৪৩ রানের মাথায়। হার্ডষ্টাফ মাত্র ছ রানের জন্য সেঞ্চুরী ক'রতে পারলে না, চারের বাড়ি দিয়েছে ১২টা। হার্ডষ্টাফের অফ ড্রাইভ দর্শনীয়। ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হ'ল ৩৫২ রানে। কন্সটাণ্টাইন ৫টা উইকেট পেয়েছে ৭৫ রানে। ওল্ডফিল্ড, হার্ডষ্টাফ ও হ্যামণ্ড আউট হ'য়েচে তার বলে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ব্যাটিং সুরু করে দিনের শেষে এক উইকেটে ২৭ রান তুললে।

কন্সটাণ্টাইন্

দ্বিতীয় দিনে আবহাওয়া খুব চমৎকার। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিখ্যাত ব্যাটসমান হেডলে দুর্ভাগ্যবশতঃ ৬৫ রানের মাথায় রান-আউট হ'য়ে গেলো। তার অফ্ কাট্ ও ড্রাইভ চমৎকার। ৬৫ রান তুলতে লেগেছিল ১৩০ মিনিট, চার ছিলো ৫টা। ভিক্টর ষ্টোলমায়ার মাত্র চার রানের জন্য সেঞ্চুরী ক'রতে পেলে না, সবশুদ্ধ ১৪৫ মিনিট খেলেচে ; চার ছিলো ১১টা। উইকস ১৩৭ রান ক'রে নিকলসের বলে হ্যামণ্ডের হাতে ধরা দিলে ; সে উইকেটের চারদিকে চমৎকার পিটিয়ে খেলেচে। ১৩৭ রান

জর্জ্জ হেডলে

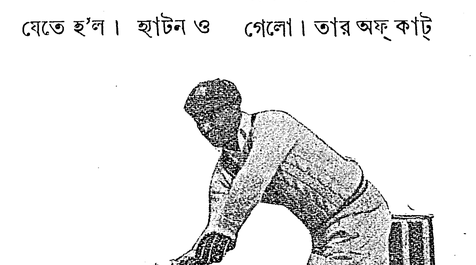

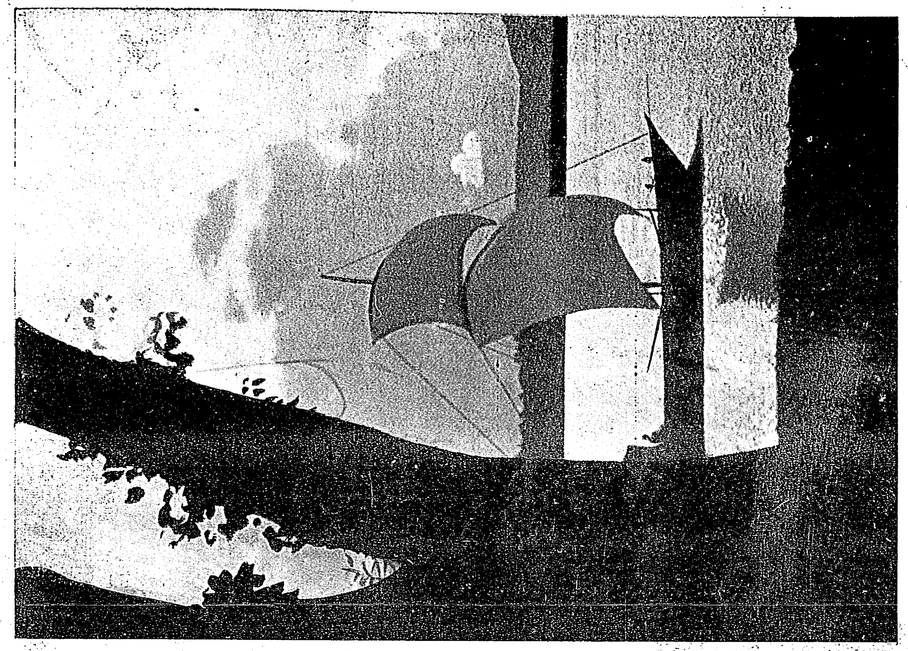

শেষ রশ্মি

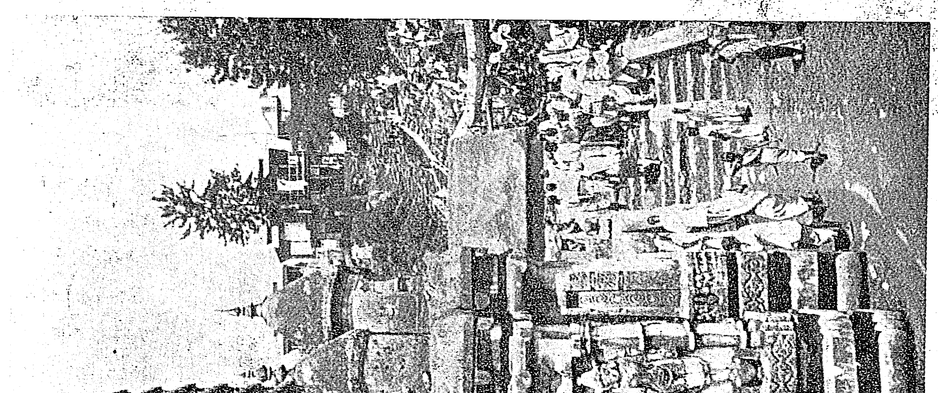

শিল্পী—কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য, গৌহাটি

অম্বুবাচী মেলা—কামাখ্যা

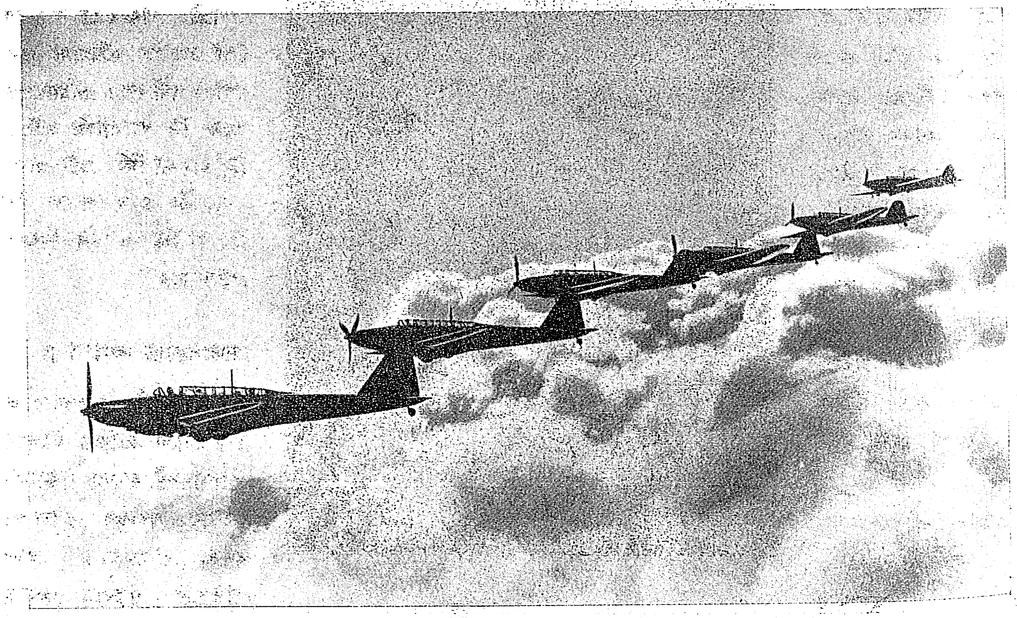

কলিকাতায় বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত এম এস আনে বক্তৃতা করিতেছেন।
বামপার্শ্বে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার উপবিষ্ট ছবি—হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড

এম্পায়ার এয়ার ডে প্রদর্শনীতে আর এফ এর বোমানিক্ষেপক বিমানের ক্রীড়া প্রদর্শন।
বিমানশ্রেণীকে মেঘের উপরে দেখা যাইতেছে

তুলতে সময় তার লেগেছে মাত্র ১৩৫ মিনিট, ছয় ছিলো ১টা, চার ১৮টা। দিনের শেষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৬ উইকেটে রান উঠলো ৩৯৫।

তৃতীয় দিনে দর্শক সমাগম বেশী হয় নি, মাত্র দু' হাজার। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের আগের দিনের রান সংখ্যার ওপর মাত্র ১০৩ রান যোগ হ'য়েচে। কন্সটাণ্টাইন ৭৯ রান ক'রে উডের হাতে আটকে যায়, ১১টা চার ও একটা ছয় ছিলো। শেষ টেষ্টে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে তার সমান কৃতিত্ব। পার্কস্ ১৫৬ রানে পাঁচটা উইকেট পেয়েছে।

হ্যামণ্ড

১৪৬ রান পেছিয়ে ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস সুরু ক'রলো। কীটন আর ওল্ডফিল্ড অল্পে গেল। হ্যামণ্ড হাটনের সঙ্গে যোগ দিয়ে খেলার গতি ঘুরিয়ে দিলে। হাটন ১৬৫ রান ক'রে নট আউট রইলো, হ্যামণ্ড ১৩৮ রান ক'রে জনসনের বলে সীলির হাতে ধরা দিলে। হ্যাটন ও হ্যামণ্ডের সহযোগিতায় তৃতীয় উইকেটে ২৬৪ রান উঠেছে। ১৯২৯ সালে হ্যামণ্ড ও জার্ডিনের রেকর্ড ছিল ২৬২ রান, সে রেকর্ডও এবার ভঙ্গ হ'ল। দিনের শেষে ৩ উইকেটে ইংলণ্ডের রান সংখ্যা উঠলো ৩৬৬। ইংলণ্ড 'রবার' রক্ষা করলে।

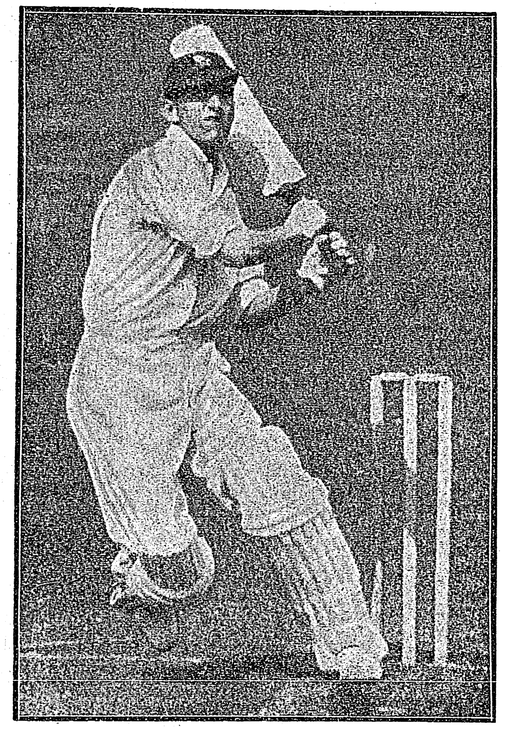

এল হ্যাটন

স্পোর্টস্ ও বর্ত্তমান যুদ্ধ ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে তাঁদের শেষ পাঁচটি খেলা না খেলেই যুদ্ধের জন্য দেশে ফিরে যেতে হয়েছে। ইউরোপের বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য আগামী এম সি সির ভারত-অভিযানও বাতিল হয়েছে। ইংলণ্ডে ফুটবল লীগ খেলাও বন্ধ হয়ে গেছে; ঘোড়দৌড় খেলাও বন্ধ হয়েছে।

কুচবিহার কাপ ঃ

কুচবিহার কাপ ফাইনালে এরিয়ান্স দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান স্পোর্টিং ইউনিয়নকে অতিরিক্ত সময়ে ৩-২ গোলে পরাজিত ক'রে কাপ বিজয়ী হ'য়েচে। এরিয়ান্স এবারে ক্রিকেটেও কুচবিহার কাপ পেয়েছে। কুচবিহার কাপে স্পোর্টিংএর ভাগ্য চিরদিনই খারাপ, তারা সাত বছরের ভেতর পাঁচ বার ফাইনালে ওঠে এবং হারে। এবার তারা ২-১ গোলে জিতছিলো, শেষ মুহূর্ত্তে এরিয়ান্স গোলটি পরিশোধ করে। অতিরিক্ত সময়ে স্পোর্টিং ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে সেই সুযোগে এরিয়ান্স এক গোলে জয়ী হয়। এরিয়ান্সের পক্ষে ডি ব্যানার্জ্জি ২টি ও টি ব্যানার্জ্জি ১টি এবং স্পোর্টিংএর পক্ষে পি ব্যানার্জ্জি ও সি বিশ্বাস গোল করে।

ইয়ঙ্গার কাপ ঃ

ডালহৌসী ক্যালকাটাকে ১-০ গোলে হারিয়ে ইয়ঙ্গার কাপ বিজয়ী হ'য়েচে। ক্যালকাটার পরাজয় দুর্ভাগ্যবশতঃ হ'য়েচে। গোল পরিশোধ করবার অনেক সহজ সুযোগ পেয়েও তারা গোল ক'রতে পারে নি, এমন কি পেনাল্টি পেয়েও গোল হয় নি।

ট্রেডস কাপ ঃ

মোহনবাগানের দ্বিতীয় বিভাগ রবার্ট হাডসনকে ১-০ গোলে পরাজিত ক'রে ট্রেডস কাপ বিজয়ী হ'য়েচে। মোহন বাগানের পক্ষে এন মুখার্জ্জি গোল করে। প্রথম দিনের খেলা ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

গ্রিফিথ শীল্ড ঃ

ফাইনালে মোহনবাগান প্রথম দিন ড্র করার পর দ্বিতীয় দিনে ক্যালকাটাকে ৩-২ গোলে পরাজিত ক'রে গ্রিফিথ শীল্ড বিজয়ী হ'য়েচে। মোহনবাগানের পক্ষে প্রেমলাল ২টি ও ডি সেন ১টি এবং ক্যালকাটার পক্ষে বিয়ার্ড ২টি গোল করেন।

ইলিয়ট শীল্ড ঃ

প্রেসিডেন্সী কলেজ বিদ্যাসাগর কলেজকে ১-০ গোলে পরাজিত ক'রে ইলিয়ট শীল্ড বিজয়ী হয়েচে। প্রেসিডেন্সী কলেজের পক্ষে প্রথম ডিভিসনের খেলোয়াড় আর ভট্টাচার্য্য, আব্বাস, ডি মিত্র, নাসিম খেলেছিল। নাসিম ও ডি মিত্র কতদিন কলেজের হ'য়ে খেলবে! প্রেসিডেন্সীর পক্ষে আব্বাস গোলটি করে। দীর্ঘ নয় বৎসর পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ শীল্ড বিজয়ী হ'বার সৌভাগ্য লাভ করলে।

এপর্য্যন্ত তারা আটবার শীল্ড বিজয়ী হ'য়েছে। এ বৎসরে তারা একটীও গোল খায় নি। বিদ্যাসাগর কলেজ এ পর্য্যন্ত পাঁচবার শীল্ড পেয়েছে এবং বহুবার ফাইনালে উঠেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল খেলা ঃ

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এথেলেটিক, হকি ও ক্রিকেটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহুদিন হ'য়ে আসচে। পাঞ্জাবের কাছে কলিকাতা হকি ও এথেলেটিক্সে মোটেই সুবিধা ক'রতে পারে না। ক্রিকেটে বরং সমান সমান।

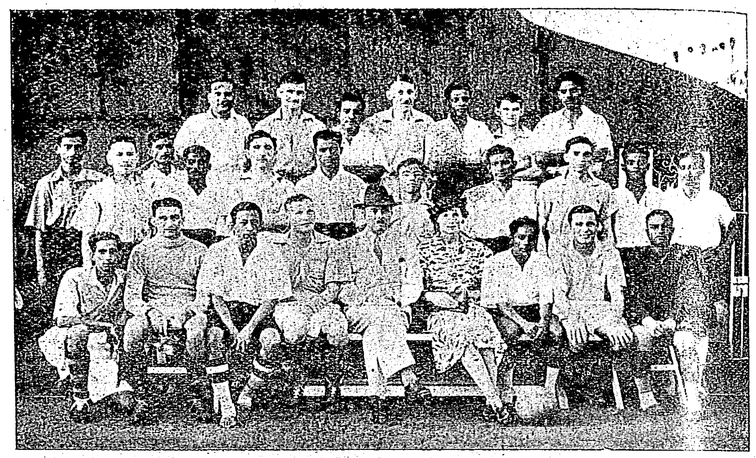

অফিস ইণ্টার-ন্যাসনালের ভারতীয় ও ইউরোপীয় খেলোয়াড় দল ছবি—আনন্দবাজার

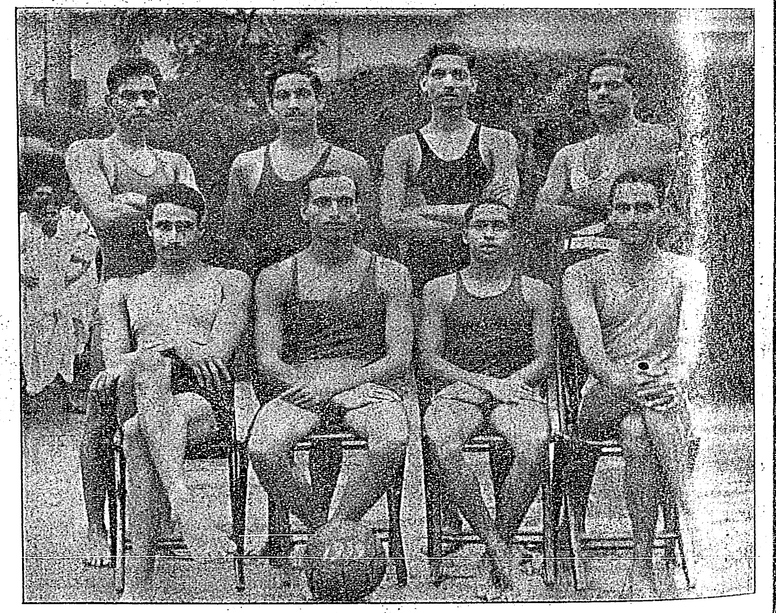

পূর্ণচন্দ্র মেমোরিয়াল কাপ বিজয়ী বৌবাজার দল ছবি—আনন্দবাজার

এবার থেকে ফুটবল প্রতিযোগিতা সুরু হ'লো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নততর খেলা দেখিয়ে ৩-১ গোলে জয় লাভ ক'রেচে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যত খেলোয়াড় আছে তা'তে দুটো প্রায় সমান শক্তিশালী দল গঠন করা যেতে পারে। পাঞ্জাবের গোলকিপার, লেফট্‌ব্যাক ও রাইট ইনের খেলা বেশ ভাল হ'য়েছিল। পাঞ্জাবের গোল রক্ষকের দোষে প্রথম দু'টি গোল হয়? কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে সে বহু অবধারিত গোল রক্ষা করে তার পূর্ব্ব ত্রুটি সংশোধন করে প্রশংসার্জ্জন করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আর ভট্টাচার্য্য, পি চক্রবর্ত্তী, রহমন, সাধু, টি ব্যানার্জ্জি ও সোমানার খেলা ভাল হ'য়েছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ—আর ভট্টাচার্য্য (প্রেসি - ডেন্সী), আর মজুমদার (পোষ্ট গ্রাজুয়েট) ও পি চক্রবর্ত্তী (বঙ্গবাসী); রহমন (বঙ্গবাসী), আর মুখার্জ্জি (রিপন), এইচ সাধু (মেডিক্যাল); এন চ্যাটার্জ্জি (প্রেসিডেন্সী), টি ব্যানার্জ্জি (মেডিক্যাল), এস দে (রিপন), সোমানা (বঙ্গবাসী) ও আব্বাস (প্রেসিডেন্সী, ক্যাপটেন)

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ঃ—পি মজুমদার; রমজান, ফৈজ; করমৎ (ক্যাপটেন), বাজোয়া, খুদাবক্স; ইয়াটিকার, রসিদ, মহম্মদ আলি, হরি ও হাসান।

রেফারী ঃ—হাণ্ডিসাইড।

রাগবী ঃ

বেথেল কাপ ঃ

লাইট হর্স ও স্কটিসের মধ্যে এবার বেথেল কাপের ফাইনাল হয়। কোন পক্ষই পয়েণ্ট লাভ ক'রতে না পারায় খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। অতিরিক্ত সময় খেলার পরও কোন ফলাফল না হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে উভয় পক্ষ ছ'মাস ক'রে কাপটি রাখবে স্থিরীকৃত হয়। টসে জয়ী হয়ে স্কটিস্ প্রথম ছ' মাস কাপটি রাখবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করে। বাঙ্গলার গভর্ণর বাহাদুর পুরস্কার বিতরণ করেন। লাইট হর্স দল গত বৎসর বিজয়ী ছিল।

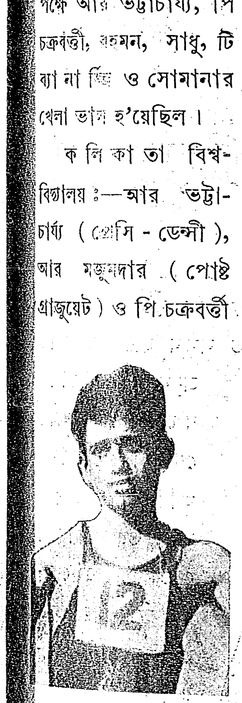

আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের সাত মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা বিজয়ী সুশীলকুমার চ্যাটার্জ্জি ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের ফিল্ড বোর্ড ডাইভিং বিজয়ী অজিতরায়ের ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

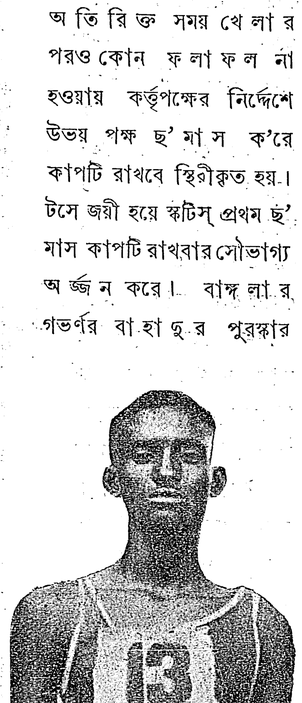

সাত মাইল সন্তরণে দ্বিতীয় মহাদেবচন্দ্র দাস (বাগবাজার তরুণ সঙ্ঘ) ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

কাউণ্টি চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

ইয়র্কসায়ার এবারও কাউণ্টি চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ

কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, বিদ্রোহী ক্লাব ত্রয় আই এফ এ থেকে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে বি এফ এতে যোগদান করলেন। পূর্ব্বদিনে আই এফ একে ঐরূপ পত্র দেওয়াটা কি নিতান্ত হাস্যকর হয় না?

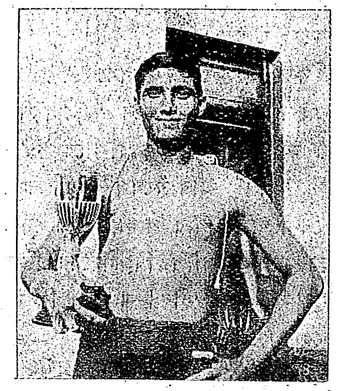

শৈলেন মেমোরিয়াল ক্লাবের ১১০ মিটার বিজয়ী দিলীপকুমার মিত্র
ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

তিনটি ক্লাব আই এফ এর সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের ব্যতিক্রম করে সংবাদপত্রে পত্র প্রকাশ করেন এবং তাঁদের তথাকথিত অভিযোগের প্রতিকার না হ'লে সেইদিনের নির্দ্ধারিত খেলা খেলতে অসম্মত হন। এক দল তাঁদের মাঠের গোলপোষ্ট তুলে নেন, যাতে সেই মাঠে সে দিনের নির্দ্ধারিত খেলাটি ঘটতে না পারে। এটা আই এফ এর নিয়মের ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন। তাঁদের প্রতিনিধিরা ৬ই জুলাই তারিখের সভায় স্বীকার করেন যে তাঁরা আইন নিজেদের হাতে নিয়ে ইচ্ছা করেই পূর্ব্ব প্রস্তাবের বিদ্রোহীতা করেছেন।

কোন পক্ষ না নিয়ে এইটুকু বলা যেতে পারে, তাঁদের প্রতি অবিচার হয়েছে তা' ধরে নিলেও, তাঁরা যে আই এফ এর আইন অমান্য করেছেন ইহা সত্য—তাঁরাও তা' অস্বীকার করেন নি। সেই অভিযোগের বিচারে তাঁদের অধিক (!) (যদি ধরে নেওয়াও হয়) শাস্তি হয়েছে, তবে সেই শাস্তির পরিমাণ কমাতে তাঁদের আপীল করা চলে, কিন্তু পুনরায় বিদ্রোহীতা করা চলে না। মিটমাট করতে হলে তাঁদের ত্রুটী স্বীকার করতেই হবে। তার পরে তাঁদের মতে যা' অবিচার তার প্রতিকারের জন্য নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা।

বিদ্রোহী দলরা বি এফ এ গঠন করেছেন। এ আই এফ এ সার্কুলার পত্রে তাঁদের অধীনস্থ ক্লাব ও এসোসিয়েশনদের ঐ দলে যোগদান করতে নিষেধ করেছেন। অধিকন্তু ব্রাবোর্ণ কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান সম্বন্ধে এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করেছেন,—নবগঠিত বেঙ্গল ফুটবল এসোসিয়েশন এ আই এফ এফ কর্ত্তৃক অনুমোদিত নহে, সুতরাং যে সকল ক্লাব ও দল এ আই এফ এফ এর সদস্য, প্রাদেশিক এসোসিয়েশন সমূহের অনুমোদিত, সেই সকল ক্লাব ও দলকে ব্রাবোর্ণ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে নিষেধ করা যায়।

আর্ম্মি স্পোর্টস এ আই এফ এর সংশ্লিষ্ট। বিদ্রোহী ক্লাবের সঙ্গে সৈনিক দল নর্থদামটনসায়ার রেজিমেণ্ট কেন ম্যাচ খেলেছে, তার কৈফিয়ৎ আর্ম্মি স্পোর্টসের নেওয়া কর্ত্তব্য। ইউনিভার্সিটি দলও বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রাক্‌টিস ম্যাচ খেলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের বিদ্রোহী দলের সঙ্গে সহযোগিতা করা অনুচিত। আই এফ এরও উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিকে গভার্নিং বডিতে অবিলম্বে স্থান দেওয়া।

শোনা যায়, বি এফ এ পরিচালিত ব্রাবোর্ণ কাপ প্রতিযোগিতা ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে কলিকাতায় চলবে। তাতে নাকি বিদেশ থেকে ও ভারতের নানা স্থান থেকে নানা দল যোগদান করেছে। দেখা যাক, সত্যই কতটা ঘটে।

গোলপোষ্ট তুলে নেওয়া সম্বন্ধে সেই ক্লাবের সেক্রেটারী সম্প্রতি সংবাদপত্রে জানিয়েছেন যে, এরিয়ান ক্লাবও তাঁদের দলভুক্ত থাকায় তাঁদের সেই দিনের খেলা উক্ত মাঠে না হবার সম্ভাবনায় তাঁরা গোল সন্নিধানের মাঠের উন্নতির জন্য গোলপোষ্ট তুলেছিলেন এবং যখন কোন দল বা

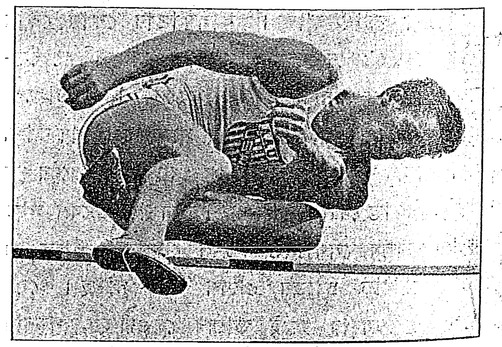

আমেরিকাবাসী লে ষ্টীয়ার্স হোয়াইট সিটিতে হাইজাম্প ক্রীড়ার অনুশীলন করছেন

রেফারী সেদিন ঐ মাঠে উপস্থিত হন নাই, তখন ঐ জন্য তাঁরা দায়ী হবেন কেন? চমৎকার যুক্তি! ঠিক সেই দিনই গোলপোষ্টের কাছের মাঠের অবস্থা এমন খারাপ হয়ে পড়লো যে মেরামতীর বিশেষ প্রয়োজন হয়। এ পর্য্যন্ত ফুটবল মরশুমে গোলপোষ্ট তুলে মাঠ মেরামতী করতে কোন ক্লাবকে কখন দেখা যায় নাই। সেদিনও ঐ মাঠ মেরামতী করতে কেহ দেখে নাই। ক্লাবদের পত্র সংবাদ পত্রে বাহির হবার পরে এবং গোলপোষ্ট নেই জেনেও কোন দলের বা রেফারীর পক্ষে ঐ মাঠে উপস্থিত হওয়া কি সম্ভব? সাধারণে এরূপ অনুমান দিতেও একটু বাধলো না—আশ্চর্য্য! রেফারিং খারাপ হচ্ছে, অতএব খেলবো না। কোন দলের সভ্য রেফারী এসোসিয়েশনে আছেন, অতএব তাঁকে সন্দেহের চক্ষে দেখতে হবে। এই সব মনোবৃত্তি খেলোয়াড় জনোচিত নহে। খেলায় হার-জিতের উপরেও স্পোর্টিং স্পিরিট—তা' যাদের নেই, তাদের খেলা থেকে অবসর নেওয়াই উচিত। ক্যালকাটা ক্লাবের মিষ্টার পুলার রেফারী এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, শীল্ড প্রতিযোগিতায় তিনি বহুবার খেলা পরিচালনা করেছিলেন, ক্যালকাটাও তখন শীল্ড খেলেছে নিশ্চয়। তবে কি তাঁর যোগ্যতার উপর সন্দেহ আরোপ করতে হবে। কোন ক্লাবের উপর আক্রোশের কথা প্রেসিডেণ্ট স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করায় আপত্তি জানান হয়, কিন্তু প্রতি Statementতেই যে সেই মনোভাবই প্রকাশ হচ্ছে।

গত দশ বৎসরে আই এফ এ তিন লক্ষ টাকা চ্যারিটিতে দিয়েছেন। এর উত্তরে মিষ্টার নূরউদ্দিন বলেছেন যে কোন দল কত পরিমাণ টাকা দিয়েছেন, বিশেষতঃ মহমেডান স্পোর্টিং দল কত দিয়েছেন তা' প্রকাশ করলে, বেশী শোভন হতো আই এফ এর পক্ষে।

এই দশ বৎসরের মধ্যে শেষ পাঁচ বৎসর মহমেডানদের অস্তিত্ব হয়েছে। চ্যারিটিতে কোন সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যাধিক্য ছিল তার পরিমাণ টিকিট বিক্রয়ের তালিকায় পাওয়া যায় না; অতএব কোন্ সম্প্রদায়ের লোক বেশী পরিমাণ টাকা দিয়েছে তাও স্থির করা সম্ভব নয়। তালিকায় তাঁর সম্প্রদায়ের লোকের আধিক্য হ'য়ে থাকলেও, অধিক মূল্যের আসনে অন্য সম্প্রদায়দের সংখ্যা অধিকতা দৃষ্ট হয়েছে। পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকের প্রাধান্য চ্যারিটি ম্যাচে মোটেই ছিল না। সম্প্রদায়িতা হিসাবে চ্যারিটির টাকা সংগৃহীত হয় না, বা বিতরিতও হয় না। ইতিপূর্ব্বে মোহনবাগানের খেলায় কি পরিমাণ টাকা সংগৃহীত হয়ে চ্যারিটিতে বিতরিত হয়েছিল—তার ধারণা কি তাঁদের মোটেই নেই? মোহনবাগান কিন্তু কখনও ঐ বিষয় উল্লেখ করে নিজেদের জনসাধারণের চক্ষে খেলো করে নি।

রাজা শীল্ড ঃ

মোহন বাগান ৩-২ গোলে রেঞ্জার্সকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে। গতবৎসর বিজয়ী ছিল রেঞ্জার্স।

ডেভিস কাপ ঃ

এবারের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকাকে ৩-২ ম্যাচে হারিয়ে বিজয়ী হ'য়েচে। আমেরিকা ২৮ বার ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেচে এবং বিজয়ী হ'য়েচে ১৩বার। ১৯২০-১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত সাত বছর পর পর তারা বিজয়ী হ'য়েছিলো। পরের চার বছর তারা ফ্রান্সের কাছে হেরে যায়। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে তারা যথাক্রমে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিজয়ী হ'য়েচে। ডেভিস কাপে আমেরিকার এই রেকর্ড কোন দেশ ভাঙ্গতে পারবে ব'লে মনে হয় না। এবারও আমেরিকাই বিজয়ী হবে ব'লেই সকলের বিশ্বাস ছিলো—প্রথম দুটো ম্যাচে তারা জিতে ছিলো কিন্তু কুইষ্টের কাছে উইম্বলডন বিজয়ী রিগসের আকস্মিক পরাজয়ে আমেরিকার ডেভিস কাপ বিজয়ের সকল আশা নষ্ট হ'ল।

রিগস (আমেরিকা) ৬-৪, ৬-০, ৭-৫ গেমে ব্রোমউইচকে পরাজিত ক'রেচেন।

নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনের টেনিস শিক্ষক রণভির সিং দিল্লীতে তরুণ টেনিস খেলোয়াড়কে শিক্ষা দিচ্ছেন

পার্কার (আমেরিকা) কুইষ্টকে হারিয়েচেন ৬-৩, ২-৬, ৬-৪, ১-৬, ৭-৫ গেমে।

কুইষ্ট (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-১, ৬ ৪, ৩-৬, ৬-৪ গেমে রিগসকে হারিয়েচেন।

ব্রোমউইচ (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-০, ৬-৩, ৬-১ গেমে পার্কারকে হারিয়েচেন।

ব্রোমউইচ ও কুইষ্ট (অষ্ট্রেলিয়া) ৫-৭, ৬-২, ৭-৫, ৬-২ গেমে ক্রামার ও হ্যাণ্টকে (আমেরিকা) পরাজিত ক'রেচেন।

হার্ডকোর্ট টেনিস ঃ

কলিকাতা সাউথ ক্লাবের হার্ডকোর্ট টেনিস ফাইনাল সমাপ্ত হয়েছে।

যুধিষ্ঠির সিং ৬-৩, ২-৬, ৬-২ গেমে খসু সেনকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

পুরুষদের ডবল ফাইনাল বিজয়ী হয়েছেন যুধিষ্ঠির সিং ও সি এল মেটা ৭-৫, ১০-৮ গেমে এল ক্রক এডওয়ার্ডস ও পি এন মূর্ত্তিকে পরাজিত করে।

যুধিষ্ঠির সিং

মিক্সড ডবল বিজয়ী হয়েছেন সি এল মেটা ও মিস হার্ভে জনষ্টন ৬-৩, ৬-২ গেমে পি এন মূর্ত্তি ও মিসেস ম্যাসেকে হারিয়ে।

খসু সেন

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্মালা দেবী প্রণীত গল্প পুস্তক "রক্ত গোলাপ"—১৲

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত মেয়েদের নাটক "আকাশ মল্লিকা"—।৶০

শ্রীঅমলেন্দু সেন প্রণীত সাধারণ জ্ঞানের বই "অনুসন্ধানী"—১৷৷০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "ড্রাগণের দুঃস্বপ্ন"—৷৷৶০

জগত দাস ও সন্তোষকুমার ঘোষ প্রণীত গল্প পুস্তক "ভগ্নাংশ"—১।০

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন প্রণীত ঐতিহাসিক "ইউরোপে মহাসমর"—১৲

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত পরিচয়গ্রন্থ "মানুষ রবীন্দ্রনাথ"—১৷৷০

প্রভাস ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "অসতী কেন হলুম"—২৲

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিহৃদয় বন প্রণীত "বেদের পরিচয়"—৩৲

পাগল গুরুদাস ঠাকুর প্রণীত "গান আরাধনা"—৸০

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী "সুরলোকের সন্ধানে"—১৲

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রাহুগ্রস্ত শশী"—

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—"শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব্ব"—২৲

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত "মিলন"—১৲

মন্মথরায় প্রণীত নাটক "ছোটদের নাটমঞ্চ"—৸০

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "নক্ষত্র পরিচয়"—৷৷০

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন প্রণীত "দর্শন পরিচয়"—২৲

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "আত্মজীবনী"—২৲

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্যাকরণতীর্থ প্রণীত "গল্পে দশাবতার"—৸০

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত ছোটদের উপন্যাস "মহাদুঃসাহসের কাহিনী"—৷৷৶০

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে প্রণীত "উদ্ভট সাগর" তৃতীয় প্রবাহ পঞ্চমাবৃত্তি—১।০

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—রোমাঞ্চ গ্রন্থ "প্রলয়ের আলো"—১।

৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রণীত ছোটদের উপন্যাস "সোনার হরিণ"—১৲

শ্রীভীমচরণ চৌধুরী প্রণীত সম্পাদিত "ভক্তজীবন"—১৷৷০

আশু চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস "স্বামী নেই বাড়ী"—১৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী ২রা কার্ত্তিক হইতে ৺দুর্গাপূজা আরম্ভ। ভারতবর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যা ১৯শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর) প্রকাশিত হইবে। কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপনের নূতন বা পরিবর্ত্তিত কপি ১০ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর) তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। তাহার পর আর কোন বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ‖ শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

প্রেমের স্বর্গ

শিল্পী—শ্রীযুত হেমেন্দ্র মজুমদার